মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ • কলিকাতা

২০৩।৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।

প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৬১।

প্রকাশক : কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ

২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

কলিকাতা-৬।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপদ মুদ্রণ—

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট্

মুদ্রাকর : কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬।

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা।

১

কলম আর চলতে চায় না।

অচল হয়ে আসা কলমটাকে জোর করে চালাতেও, মন-প্রাণ সতেজে বিদ্রোহ করে ওঠে।

কলম রেখে নিজের পেটটাকে দু'বার থাপড়ে দিয়ে পেটটাকে উদ্দেশ্য করেই মানব বলে, কেন বাবা গোল বাধাচ্ছ? নিজের ক্ষতি নিজে করছ? আর ঘণ্টা দু'তিন চুপচাপ থাকলে লেখাটাও শেষ হত, আজ রাতে তোমায় খুসী করার ব্যবস্থাও হত!

নিজের পেটের উপরেই যেন একটু অনুকম্পার হাসি হেসে, মুখ বাঁকিয়ে মানব একটা বিড়ি ধরায়। মস্ত একটা হাই তুলে ধোঁয়া ছাড়ে।

সকালে রবির দোকানে বসে খেয়েছিল দু'খানা টোষ্ট আর দু'কাপ চা। আরও কিছু খাওয়া যেত অনায়াসেই। রবি তাকে ধার দেয় না, আগের পাওনাটা শোধ হয় নি। কিন্তু ক'দিন নগদ পয়সায় চা টোষ্ট খেয়েছে—আজও রবি ধার দিয়েছিল, খেয়ে উঠে দামটা নগদ মিটিয়ে দেবে ভেবে।

আবার বাকী রাখছে শুনে রবি অপমানের সুরে যেভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, আর কিছু বেশী খেলেও সেইভাবেই বলত: আগে না জানিয়ে, ধারে খাবেন না মানুবাবু!

তবু সে আরও কিছু খাওয়ার লোভটা সম্বরণ করেছে—সারাদিন আর কিছু জুটবে কি না, জানা না থাকলেও করেছে।

একবারে বেশী বোঝাই নিয়ে লাভ নেই। খিদে যথাসময়ে তার পাবেই। বেশী খেলে লাভের মধ্যে, শুধু লেখার ধারটা তার একটু ভোঁতা হয়ে যাবে—হয় তো কলম বন্ধই রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

দুপুরে খেয়েছে পুরো চার পয়সার মুড়ি মুড়কি। অলিকে পর্য্যন্ত একটু ভাগ না দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে, একলা খেয়েছে। তেল আছে প্রায় আধ শিশি—আজ দু'দিন চার-বেলা, সে রান্না করে নি।

আলস্য করে নয়। চাল ডাল তরকারী কয়লা কাঠ, কিছুই ঘরে নেই, ও সব কিনে-কেটে রাঁধতে গেলে, একবেলাতেই হাতের পয়সা কটা ফুরিয়ে যেত বলেও বটে—রান্না করার সময়টা লেখাটার পিছনে ঢালতে পারবে বলেও বটে।

অলি টের পেয়ে ঘরে এসে দামী ছেঁড়া তোষকের বিছানাটা ঝেড়ে দিয়েছিল, ময়লা কুটকুটি চাদরটা তুলে নিয়ে বলেছিল, সাবান দাও না, কেচে আনি? বড্ড ময়লা হয়েছে।

অলি জানত, তার সাবানও নেই, সাবান কেনার পয়সাও নেই—তবু বলেছিল।

একমুঠো কিন্তু তাকে সে ভাগ দেয় নি। সে জানত কম করে হলেও খেসারির ডাল আর পুঁই চচ্চড়ি দিয়ে অলি ঘণ্টাখানেক আগে ভাত খেয়েছে।

দীঘল জোরালো দেহের পেটের ক্ষুধার দেবতা, পুরো চার পয়সার মুড়ি মুড়কি ভোগ পেয়ে খুসী হয় নি। বেলা পড়ে আসতে আসতে সতেজে গুর গুর করে ডেকে উঠেছে।

তবু কাজ এগিয়ে চলছিল। উপোসী পেটের তেজী খিদেয় আরও সাফ হয়ে গিয়েছিল মাথা, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কল্পনা।

এতক্ষণে খিদে খতম করেছে কলম চালানো।

পেটে হাত বুলিয়ে যেন আদর করেই মানব বলে, আমার কলম তুমি একেবারে থামাতে পারবে না বাছাধন। এত চেষ্টায় মাথায় ঝিম ঝিম সুরু করিয়েছ, আস্তে আস্তে তুমিই আবার ঝিমিয়ে যাবে। আবার আমি কলম চালাব জোরসে! তু'ঘণ্টা লেখা থামিয়ে নিজের পূজোয়, নিজেই তুমি বাধা বাদ সাধলে।

অনেক বন্ধু আছে মানবের। ঠিক বন্ধু বলতে মানুষ যা বোঝে এবং সমাজ সংসারে, যে মানে মানা হয়।

নিয়মনীতি সেই সনাতন।

যার কাছে মানুষের আবরু দরকার হয় না।

না দেহের, না মনের।

বৌ নেই।

বৌ সে পাবে কোথায়? এই খোলার ঘরের বস্তিতেই দেহী হিসাবে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে পাঁচ ছ'টা। মানব ঘটক পাঠালেও তারা তার কাছে মেয়ে দিতে রাজী হবে না!

ওরা জেনে গিয়েছে। না জেনে ওদের চলে না। ওরা জানে সে ইচ্ছা করলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে যেতে পারে তার মামার বাড়ীতে, দিদির প্রাসাদে কিম্বা তার গণ্ডা তুই কাকা-জ্যাঠা-মামা-মেসোর, দোতলা একতলা পোড়া ইটের পাকা বাড়ীতে।

লাঞ্ছনা দেবে, গঞ্জনা দেবে, ভদ্রভাবে অপমান করবে, বাড়ীর স্কুলে-পড়া ছোট ছেলেটা পর্য্যন্ত—কিন্তু খেতে দেবে মাছ তুধ ভাত।

বাড়ীতে যে আছে সে আপন হোক অতিথি হোক—নিজেরা যা খাবে তাকেও তার সমান ভাগ দেবে, এ নীতি আজও অচল হয় নি।

ওরা জানে না যে তাকে বাড়ীতে রাখতে তার আত্মীয়স্বজনের কত ভয়। তাকে ভয় নয়, তার জন্য ভয়।

কে জানে কখন পুলিশ আসে!

উমাকান্তই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী মেলামেশা করে তার সঙ্গে, খালেকের চেয়ে বেশী।

বন্ধু সে নিশ্চয় নয়, কারণ বয়সে অনেক বড়, গুরুর মত বেশ খানিকটা শ্রদ্ধা আছে—মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভক্তিও বুঝি আছে। সমানে সমানে ছাড়া খাঁটি বন্ধুত্ব হয় না, এতো জানা কথাই। উমাকান্ত অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি একগুঁয়ে পাগল। অধিকার নিয়ে বড় বড় কথা বলবে, কাজে পিছু হটবে। তোমার অধিকার নেই আপনজনের ঘাড় ভেঙ্গে খাবার? খেতে দিক, নয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিক! তা তুমি যাবে না। তোমার মত হাবা দেখিনি আমি আর।

সেই সকালটি চিরদিন স্মরণীয় থাকবে।

ভোরে কাকা এল।

অপরাধীর মত।

নইলে এত কষ্ট করে এত ভোরে কেন আসবে?

বস্তি অবশ্য তার অনেক আগেই জেগে গেছে।

কলের ভোঁ শুনতে হবে তো, আট ঘণ্টার জন্য, ওভার টাইমের জন্য ঘর ছাড়ার আয়োজন করতে হবে তো, খাটতে যেতে হবেই তো!

কাকা এসে প্রথম কথাই বলছিল, বস্তির নাম মাত্র উঠানে, সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে: বড় হবার চেষ্টা করছ, কর। বিপ্লব করছ কর। আমার কিছুই বলার নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের সাতাশ তারিখে আশালতার বিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হলে যেও, ইচ্ছে না হলে যেও না। কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে বুড়ো কাকাকে ঝন্‌ঝাটে ফেলো না।

মানব শুধু শুনেছিল। কথা কয় নি।

সাময়িকভাবে তার কলম থেমে গেছে।

কম্পোজিটর কালাচাঁদের মেয়ে আভি তাকে দেখাতে আসে, বাপের কলম চালাবার নমুনা।

কলম নয়, পেন্সিল।

প্রুফ তোলা একখণ্ড কাগজে লেখা, কয়েক লাইন ছড়া।

ভোরবেলা না কি ঝগড়া বেধেছিল, আস্তির মা আর কালাচাঁদের মধ্যে—ভোর মানে একরকম শেষ রাত্রে।

খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে, প্রদীপ জ্বেলে নিজের মনে চুপচাপ কাগজে আঁচড় কেটে গেছে কাজে যাবার বেলা পর্য্যন্ত!

আস্তি হেসে বলে, বাবাকে একটু লিখতে শেখাও না মানুবাবু? বাবার এমন লেখার সখ!

কাটাকুটির অন্ত নেই, তবে মোটামুটি পড়া যায়। কালাচাঁদের হাতের লেখা, গোটা গোটা :

কান্ত বাবুর গল্প কম্পোজ করিতে করিতে একটি স্থান, কৃষ্ণের বড় ভাল লাগিল। গয়ণা'র জন্য বৌ আব্দার ধরিয়া ঝগড়া করিতেছিল, প্রসন্ন তাহাকে বলিল যে তুমি অসতী, সতীত্বের পরীক্ষায় তুমি ফেল করিয়াছ। শ্রীরামের সঙ্গে বনবাসে গিয়া, সীতা দেবী কি কোন দিন শাড়ী গয়ণা চাহিয়া স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিল!

প্রহ্লাদকে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিল, কান্তবাবু এবার গল্পে খুব দামী কথা লিখিয়াছেন, খুব খাঁটি কথা। কিন্তু কথাটা খোলসা করেন নাই।

যায়গাটা কৃষ্ণ পড়িয়া শোনাইল। তারপর বলিল, সকলেই জানে সীতাদেবীর সতীত্বের পরীক্ষা হইল অগ্নি পরীক্ষা। তাহা সত্য নয়। বসন ভূষণ সব ত্যাগ করিয়া, স্বামীর সহিত তিনি বনে গিয়াছিলেন, কোনদিন কিছু চাহিয়া ঝগড়া অশান্তি

করেন নাই। ইহাই আসল পরীক্ষা। কান্ত বাবু ইহা খোলসা করেন নাই, লোকে বুঝিবে না।

প্রহ্লাদ হাসিয়া বলিল, কান্তবাবু ইহা বলিতে চাহেন নাই, ইহা তোমার মনগড়া কথা। বৌদিদি কাপড় গয়ণা চাহিয়া, ঝগড়া করিয়াছে বুঝি?

মানব জিজ্ঞাসা করে, কালাচাঁদ কদ্দুর পড়েছে জানো?

: হ্যাঁ, জানি বৈকি। বাবা কতবার গল্প শুনিয়েছে। ইস্কুল থেকে বেরোবার পরীক্ষাটা, না? সেটাতে ফেল মেরেছিল। বাবা বলে, ফেল মারবো না? তোর ঠাকুদ্দাদা রোগে ভুগল আট মাস, সব ঝনঝাট আমি পোয়াই নি? খেতে না পাওয়ার অবস্থা—বলতে বলতে বাবার মুখচোখ কিরকম হয়ে যায়, যদি দেখতে মানুবাবু!

: বুঝেছি। তারপর?

: ঠাকুদ্দা কাকে ধরে বাবাকে পরীক্ষা দেওয়ালে। বাবা ফেল মেরে গেল। ঠাকুদ্দা বাবাকে ছাপাখানার কাজ শিখতে ঢুকিয়ে দিলে।

আত্তি সগর্বে বলে, ঠাকুদ্দা ছাপাখানার হেড ছিল, জানো?

ছাপাখানার হেড বলতে ঠিক কি বুঝায় আত্তির ধারণা নেই। কিন্তু মানব জানে ছাপাখানায় যারা হরফ চালে আর সাজায়, তাদেরই হেড ছিল কালাচাঁদের বাবা।

: তোর বাবা যদি সুযোগ সুবিধা পেত আত্তি—

রোগা কিন্তু এত বড় ঢ্যাঙ্গা মেয়ে কালাচাঁদ যে, যার তার কাছে পার না করে ঘরে রেখেছে, এটাও একটা জ্যান্ত প্রমাণ বৈকি যে, সুযোগ সুবিধা পেলে কালাচাঁদ অনেক কিছু করতে পারত!

কালাচাঁদেরও লেখার সখ?

অনেকের হঠাৎ ঝোঁক চাপে—লেখক হব। কিন্তু খেয়াল থাকে না লেখক হতে হলে শিখতে হয়, লিখতে হয়।

লিখতে শিখতে হয়।

লিখতে শেখাটাই ভয়ঙ্কর কষ্টকর ব্যাপার। গোড়ার দিকে আরও বেশী।

মনের গাছে, লেখক হবার ঝোঁকের ফুলটাই ঝরে যায় অনেকের।

অনেকের ঝরে যায় অঙ্কুরে।

অনেকের কচি ফল বোঁটা শুকিয়ে খসে পড়ে।

কয়েকজন ফল ফলায়। ফল ফলিয়েও, ফল পাকানোর ধৈর্য্য আর কষ্ট তাদের সকলের সয় না। সাহিত্যে সফলতা অর্জনের দাম নিতে এদিক ওদিক ছিটকে যায়।

দাম তারা পায়।

টাকার দাম।

তাই দিয়ে তারা, আত্মীয় বন্ধু পাড়ার লোকের কাছে, বিশেষ ব্যক্তি হয়ে থাকে—বিশেষ ব্যক্তিরা তাদের সাহিত্যিক প্রতিভার নিস্ফল পরিণতি পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। বেশ মোটা টাকা দেয় সস্তা সিনেমায় লাগাতে পারলে।

এ'সব তো গোড়ায় খেয়াল ছিল না তারও। কেন তবে ঝোঁকটা তার কেটে যায় না, সাধটা ভোঁতা হয়ে যায় না? কেন সে সহজ পথ বেছে নিতে পারে না লেখক হবার?

লেখা সম্পর্কে কারো সঙ্গে কোন রকম আপোষ করার কথা ভাবলে কেন তার গা ঘিন ঘিন করে, মনে হয় তার চেয়ে মরাও ভাল?

অনায়াসে যেতে পারে ভূপতির আপিসে কিম্বা বাড়ীতে। দু'চার পয়সার মুড়ি চিড়ে খেয়ে দিন কাটাবার অবস্থা যাতে না হয়, বা দু'চার আনা

ট্রাম-বাসের পয়সার অভাব না ঘটে, সে কায়দা না শিখেই সে এই বয়সে লেখক হিসেবে নাম করতে পেরেছে।

একবার গিয়েছিল ভূপতির আপিসে।

কি ভাবে সে তার লেখকত্ব গুণটা কিনতে চায় তারই নিয়মকানুন জানার জন্য।

সব কিছু না জানলে না বুঝলে, কি লেখক হওয়া যায়?

বিষ কি, না জেনে, শুধু অমৃত পান করে কেউ লেখক হয়? বিষ বর্জন করে শুধু অমৃত নিয়ে মেতে থেকে, জগতে আজ পর্য্যন্ত কোন লেখক জগতকে ফাঁকি দিতে পারে নি।

সব জানতে হবে লেখককে। বস্তির ড্রেন থেকে রাজপ্রাসাদের ড্রইং রুম পর্য্যন্ত।

মাঝখানেরও সমস্ত কিছু।

ভূপতি বলেছিল, খেতে পাচ্ছ না? তোমায় তো আগেই বলেছি আমি! কাব্যি রোগ সারিয়ে আমার আপিসে ঢুকে পড়। ভাল পোষ্ট—দেড়শ' টাকা মাইনে।

একুশ বছর বয়েস।

গল্প তার পৌঁছে দিতে হয় না সব মাসিক পত্রে—দুটো সেরা মাসিক পত্র থেকে তার গল্প চাওয়া হয়—গল্প দিলেই দাম!

বইও বেরিয়েছে দুটো। প্রকাশক নিজের খরচে ছাপাবে, তাই খুশী না হয়েও একজনকে নগদ একশো, আর আরেকজনকে দেড়শো টাকায় বই দুটো বিক্রী করেছে।

গল্পের জন্য নগদ নয়—কিন্তু দাম তো! গল্প বেরোবার পর নগদ দাম—দশ টাকা থেকে পনের টাকা।

কী উদারতা সাহিত্যিক কর্ণধারদের মোটা টাকা দিয়ে, মাসিক পত্রের

কর্ণধার করা খ্যাতনামা পুরুষদের ! মহাপুরুষ—তাই ভুলে যায় তাদেরও একদিন অল্প বয়স ছিল, বাপ-দাদা খাতিরের লোক হলেও সাতরাত্রি জেগে লেখা গল্পটার জন্য দশটা টাকা পেয়েছিল—প্রিয়তমাকে একদিনের বেশী সিনেমায় নিতে পারেনি, সাতদিনের দিবারাত্রি খেটে রোজগার করা দশটা টাকায় !

ভেবে চিন্তে মানব তার ঘণিষ্ঠতম সম্পাদক, মহেশের বাড়ী যায়।

মানব বলে, ওবেলা আপিসে গেলে সব টাকাটা আগাম হবে ?

নিশ্বাস ফেলাটা মানব শুনতে পায়।

: সেদিন কি, আছে রে ভাই ?

স্নেহ আর জ্বালা মেশানো অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেদিন যে আর নেই, মানবই যেন সে জন্য দায়ী। সেদিন মানে বছর পাঁচেক আগের কথা —মানব যখন গল্প লেখা স্নুরু করে।

নতুন প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে মহেশ উদারভাবে বলে, যাক্ গে। আমার দুঃখের কথা শুনে তোমার পেট ভরবে না। বাড়ীতে এলে, চা দিলাম না, খাবার দিলাম না—কি করি বল ভাই ? একজোড়া শাড়ীর জন্য ক্ষেপে আছে, এক কাপ চায়ের কথা বলতে গেলেই আরও ক্ষেপে গিয়ে কামড়ে দেবে।

একটু থেমে বলে, সিগ্রেটটা ধরাও ?

: ধরাব !

মহেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। ভিতর থেকে নিশ্চয় শোনা যায়।

দু'কাপ ধোঁয়াটে পানীয় আসে বিনা হুকুমে !

চা দিয়ে চন্দ্রা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, আমি এঁর নতুন গল্পটা পড়েছি

বাবা। ওর গল্পটা যে ভাল তুমি ঠিক ধরেছ। তুমি ছাড়া আর কেউ সাহস করে ছাপাত? ছাই ছাপাত!

চা খায়।

একথা ওকথা বলে, পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে মহেশ বলে, পকেট থেকেই দিলাম ভাই, করি কি! তোমারও তো অচল অবস্থা। বিল পাশ হলেই আমরা মাইনে পাব, তুমিও তোমার বাকী টাকাটা পাবে।

ঘরে শুয়ে বসে সাদা কাগজের বুকে কলমের আঁচড়ে অক্ষর সাজিয়ে যাওয়া, আর প্রেসে সারাদিন শুধু বসে থেকে ছক কাটা ঘরগুলি থেকে অক্ষর আর সাঙ্কেতিক চিহ্ন বেছে বেছে সাজিয়ে যাওয়া।

সোজা, বাঁকা, টানা—নানা রকম হাতের লেখার পাণ্ডুলিপির দিকে চোখ রেখে।

এতগুলি অক্ষর!

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন ইত্যাদি।

ভাবতে হয় না, খুঁজতে হয় না—যন্ত্রের মত হাত গিয়ে টপ্ টপ্ তুলে এনে, সাজিয়ে যায় সীসার অক্ষর।

গোড়ায় কালাচাঁদ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি বাক্যের মানে খানিকটা বুঝবার চেষ্টা করত—

কাজ এগোত না একদম।

তবে ভুল অনেক কম হত।

আজকাল চোখকাণ বুজে যন্ত্রের মত অক্ষর সাজিয়ে সে যা গাঁথে—ফাষ্ট প্রুফের রূপ নিয়ে সস্তা কাগজে ছাপা হয়ে, সেটা ফিরে আসে অসংখ্য সংশোধনে কণ্টকিত হয়ে।

তাকেই আবার মিলিয়ে মিলিয়ে সংশোধন করে আবার নতুন করে অক্ষর সাজাতে হয়।

আগে হাতে লেখা কপি পড়ে মানে বুঝে অক্ষর সাজাবার সময়, এখনকার চেয়ে ফার্স্ট প্রুফে তিনচার ভাগেরও কম ভুল থাকত—বেশী কপি সাবাড় করতে না পারলেও, তার কম্পোজ করা ম্যাটারে দু'বারের বেশী প্রুফ তোলার দরকার হত না।

কিন্তু তাড়াতাড়ি কপি শেষ না করলে তো চলবে না, দৈনিক যত বেশী গেলি প্রুফ তুলে দিতে পারবে কপি খতম করে, তত বেশী সে বিবেচিত হবে কাজের লোক বলে।

চোখ কান বুজে তাই আজ তাকে অক্ষর সাজাতে হয় দ্রুতগতিতে।

পাণ্ডুলিপির শব্দগুলি শুধু দেখবার চেষ্টা করে।

বুঝতে না পারলে, যেমন মনে হয় তেমনি সাজিয়ে যায়।

উমাকান্তের লেখা প্যাঁচালো প্যাঁচালো—এমন সরল মানুষটার, এমন প্যাঁচালো হাতের লেখা!

শিক্ষিত সাহিত্য-রসিক কম্পোজিটার ব'লে তাকেই দেওয়া হয় উমাকান্তের বইয়ের কপি।

মলাটে রাজপুত বীরের ছবি আঁকা, লাইনটানা ছেলেমেয়েদের স্কুলে ব্যবহার্য্য দু'আনা দামের বিষ পঁচিশটা খাতায় কালির আঁচড়ে ভর্তি করা কপি।

উমাকান্তের নিজেরই সংশোধিত ফার্স্ট প্রুফ ফিরে এলে আজও এমন হাসি পায় কালাচাঁদের!

উমাকান্ত লিখেছিল "মহা মহিমামণ্ডিত মানুষ"—অক্ষর সাজিয়ে সে ফার্স্ট প্রুফে ওটাকে দাঁড় করিয়েছিল "মদ মেয়েমানুষ বর্জিত কানাই"!

এ রকম আরও যে কত হাস্যকর ভুল সে করে!

উমাকান্ত প্রেসে আসে।

: কি রকম প্রুফ দিচ্ছেন? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছেন নাকি?

ধনদাস সবিনয়েই জবাব দেয়, যতটা পারছি দিচ্ছি। একটু যদি স্পষ্ট করে লেখেন, একটু যদি কম তাড়াতাড়ি কম জড়িয়ে লেখেন—

সে অমায়িকভাবে হাসে।

: আমিই আপনার লেখা পড়তে পারি না—মুখ্যু কম্পোজিটারদের সাধ্য কি বলুন?

উমাকান্তের রাগত মুখ দেখেও হেসে আবার বলে, একটা কাজ করেন না কেন? একটা লেখা ছাপিয়ে দেবার জন্য কত ছোকরা কত বুড়ো তো আপনাকে জ্বালিয়ে মারছে। ওদের কাউকে দিয়ে লেখাটার একটা ফেয়ার কপি যদি করিয়ে দেন—

উমাকান্ত নিশ্বাস ফেলে।

উমাকান্ত সস্তা একটা সিগার ধরায়।

এক পয়সা দাম।

উমাকান্ত গোটাতিনেক হাই তুলে। বলে, ফেয়ার কপি করতে দিলে ফেরত পাব বইটা? নিজের শালাকে চারশ' পাতার একটা উপন্যাসের ফেয়ার কপি করতে দিয়েছিলাম—বলেছিলাম, অন্ততঃ তোমার দুটো গল্প, দুটো ভাল কাগজে ছাপিয়ে দেব। আজ চার বছর পাত্তা পাচ্ছি না, হারামজাদা শালাটার।

ধনদাস আমোদ বোধ করে বলে, কলেজী ছাত্র—রোজগার করে না। শ্বশুরবাড়ী গিয়েও পাত্তা পান না শালাটার?

: পাই না।

: সে কি কথা? রাত নটা দশটায় একবার গেলেই হয়!

: গিয়েছি না? কড়া নাড়লাম—দু'চারবার কে কে বলার পর

দুয়ার খুলে শালী খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—জামাইবাবু এসেছেন, জামাইবাবু!

: তারপর?

: বৈঠকখানায় শালাটা পড়ছিল, চোখের সামনে দিয়ে তুরুক করে দো'তলায় উঠে গেল। সোজাসুজি তো চোর বলতে পারি না, নিজের বৌয়ের মায়ের পেটের ভাইকে—দোকান থেকে কিনে আনা দামী খাবার মুখে দিতে দিতে শুধোলাম, নন্দকে দেখছি না!

: কোথায় গেছে, আসবে এখুনি।

: দো'তলায় পালিয়ে গেল, দেখলাম যেন?

: কই না তো!

সহধর্মিণী এগিয়ে এলেন। বললেন, দু'দিনের জন্য বাপের বাড়ী এসেছি, ফিরে গিয়ে তোমার হাঁড়ি ঠেলব—বাপের বাড়ী এসেও যদি আমার ভাইকে নিয়ে গোলমাল কর—ভাইয়ের কাছ থেকেই পটাসিয়াম সাইনাইড্ চেয়ে খেয়ে সব জ্বালা জুড়িয়ে দেব বলে রাখছি!

হরদম এরকম কথাবার্তা শুনেও কালাচাঁদের লেখার সাধ জাগে।

মাঝে মাঝে সাধ ঝিমিয়ে যায় মিলিয়ে যায়।

ছোট বড় কত লেখকের কত টুকরো টুকরো লেখা পড়ছে আজ কত কাল ধরে—কেটে কেটে পড়ছে। হরফে, চিহ্নে, ভাগ করে করে পড়ছে। তবু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে গেছে দু'চারটে ভারি মজার লাইন, অদ্ভুত আশ্চর্য্য লাইন, খাপছাড়া উদ্ভট লাইন! কম্পোজ বন্ধ করে তখন পড়বার সময় নয়—কাজের শেষে ঘরে নিয়ে গেছে হাতের লেখা কাগজ ক'টা, আগাগোড়া পড়েছে।

জেগেছে কৌতূহল।

বই ছাপা হবার পর, বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরোবার আগে—ছাপা

ফর্মাগুলি এক সেট কালাচাঁদ ঘরে নিয়ে গেছে, শ্রান্তি ক্লান্তির আক্রমণ ঠেলে তার ডিবরির আকারের ছোট টেবল ল্যাম্পটার আলোয় রাত জেগে পড়ে শেষ করেছে—না কাটা, না সাজানো, ফর্মাগুলি।

কাটার উপায় নেই, বই না হোক—প্যাম্পপ্লেটের আকারে এক একটা ফর্মা যে পড়বে সে উপায় নেই।

যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় ফর্মাগুলি ফেরত দিতে হবে।

ভাঁজ খুলে ঢাউস কাগজটার উল্টো-পাল্টা করে সাজানো নম্বর দেওয়া পৃষ্ঠাগুলি, তাই উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পড়তে হয়।

উল্টো পাল্টা কিন্তু এলোমেলো নয়। নিখুঁত হিসাব করেই কাগজটার তু'পৃষ্ঠায় এমনভাবে সাজানো যে ভাঁজ করলে বই-এর ষোল-খানা পাতা, পর পর সাজানো হয়ে যাবে।

ডিবরির মত ছোট ল্যাম্পটাতেও আলো জ্বলে না সব দিন, তেল থাকে না।

মানবের ঘরে সসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়ায়।

পেটে খাওয়ার পয়সায় টান পড়লেও মানব উজ্জ্বল আলো জ্বালে।

কম আলোতে মানবের দৃষ্টি নাকি ঝাপশা হয়ে যায়।

চশমা দরকার, কেনার পয়সা নেই। আলোটাই তাই সে উজ্জ্বল ক'রে, কয়েক আনার কেরোসিন কিনে।

: এসে বসে পড়ছি—আপনার লেখার অসুবিধা হবে না তো মানু বাবু?

: তুমি চুপ চাপ পড়বে—লেখার অসুবিধা হবে কেন?

মানব হাসে।

বলে, আমার কি সখের লেখা, লোকের প্রাণে সুড়সুড়ি দেবার লেখা? আমি হাটে বাজারে বসে লিখতে পারি। তুমি একটা লোক চুপচাপ বসে পড়বে, তাতেই আমার লেখার ব্যাঘাত হবে!

২

কবে প্রথম জেগেছিল লেখার সাধ! আত্তির মাকে বিয়ে করার আগে না পরে! কিছুই মনে নেই কালাচাঁদের।

সাধটা অনেক দিনের এইটুকুই তার খেয়াল আছে।

সাধটা মনে মনে কয়েক বছর পুষে রাখবার পর, বোধ হয় তার প্রথম চেষ্টা সুরু হয়েছিল লিখবার।

নতুন কেনা দোয়াত কলম দিয়ে উমাকান্তের মত, একটা নতুন কেনা পাতলা খাতার, লাইন টানা পাতায়। সে লেখা আজও সযত্নে তোলা আছে।

নিজে লেখার কথা ভাবা স্বপ্ন, তার কাজ শুধু হরফ সাজানো, উমাকান্তের লেখা কপি কম্পোজ করার সময় যন্ত্রের মত করে যায়।

তা'ছাড়া উপায় নেই।

হাতে লেখা কপির মানে বুঝে অক্ষর সাজাতে গেলেই হয়ে যাবে কম্পোজিটারের দফা রফা।

কাজের সময় চিন্তাশক্তিকে কুণ্ডলীপাকানো যান্ত্রিক ঘুম থেকে একটু জাগালেই, হয়ে যাবে ঘণ্টা হিসাবে খেটে মোট হিসাবের গেলি তুলে দিতে না পারা।

মোট গেলির মোট পরিমাণ সীসার অক্ষরাদি, তাকে সাজিয়ে গেঁথে দিতেই হবে মোট সময়ের মধ্যে—

নইলে জরিমানা, মজুরি আটকানো, বরখাস্ত।

উমাকান্তের কপি ঘরে নিয়ে গিয়ে হরফ কথা বাদ দিয়ে, বিশ্রী বাঁকা হস্তাক্ষরের লেখা কপিগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে, যে প্রাণপণ চেষ্টায় শব্দ ধরে ধরে, কথা ধরে ধরে, এগিয়ে খানিকটা বুঝবে মোট কথাটা কি আছে, কি ভাবে লিখেছে, তারও উপায় নেই।

প্রুফের সঙ্গে গেঁথে ফিরিয়ে দিতে হয় হাতে লেখা কপি। সে কপি আর ফেরত আসে না।

হাতে লেখা কপি সযত্নে ষ্টিল ট্রাঙ্কের দুর্গে তুলে রাখবে—ভবিষ্যতের হিসাব কষে।

কে জানে হয় তো একখানি তার হস্তলিখিত ম্যানাস্ক্রিপ্টের দাম হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা—

কত রকমের লেখক আর কবির যে আবির্ভাব ঘটে ছাপাখানায়!

সখের কবি, সখের বই ছাপতে আসে। মহেশ উপদেশ দিয়ে কালাচাঁদকে প্রস্তুত করে রাখে। কারণ, কবি নিজে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দিতে ভালবাসে, কি ভাবে তার বইটি ছাপা হবে। শুধু প্রুফ দেখে বুঝিয়ে তার স্বস্তি নেই। আলাপ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তালিম দিয়ে মহেশ বলে, যা বলেন মন দিয়ে শুনবে, কাজ বন্ধ রেখে।

কালাচাঁদ আগে তৈরী করা খৈনিটুকু কাগজ থেকেই মুখে ঢেলে জিব দিয়ে নীচের ঠোঁটের ফাঁকে ঠেলে দেয়।

হরফ বেছে, সীসার হরফ সাজানোর হাতে খৈনি তুলে মুখে দিতে সাহস হয় না—কে জানে একটু সীসা ভিতরে গেলে কিভাবে ফেটে বেরোবে ফোড়ায় ফোড়ায়, নয় তো চর্ম-রোগে!

কালাচাঁদ আরেকবার তাকায় মহেশের দিকে।

মহেশ আরেকবার শ্রান্তমুখে মাথা হেলিয়ে তাকে জানায়—কাজ বন্ধ করে আলাপ করবে মানুষটার সঙ্গে, বুঝলে? নইলে বাবু চটবেন!

এ হুকুম নতুন নয়। প্রেসে যারা কাজ যোগায়, পয়সা দেবার কারণ-স্বরূপ হয়, মনের খুঁতখুঁতানি থেকে তারা এসে কাজের ক্ষতি করিয়ে কম্পোজিটারকে খুঁটিনাটি নিয়ে অনাবশ্যক ও অকেজো উপদেশ দিতে চাইলে উপায় কি!

চালাও হুকুম দেওয়াই আছে যে এ ক্ষেত্রে ভদ্রভাবে নম্রভাবে সবিনয়ে কথা বলাটাই কম্পোজিটারের কাজ।

ছাপার ব্যাপারে যত অজ্ঞ হোক, যত হাস্যকর উপদেশ ঝাড়ুক, পাকা কম্পোজিটারের বিদ্যা ফলানো চলবে না। এমনভাবে তাকে প্রকারান্তরে কাজটা করার কথা বলতে হবে যেন অভিমানে ঘা না লাগে।

ভাগ্যে এরকম লেখক কবির সংখ্যা বেশী নয়!

ভাগ্যে তারা অধিকাংশই ছাপার ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে কথা বলেই সন্তুষ্ট থাকে!

নইলে কালাচাঁদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কারণ, খুঁতখুঁতে ওই সব বাবু লেখক কবিদের সঙ্গে কারবার চালাতে হয় তাকেই।

কিন্তু চালু হুকুম আজ আবার এমন বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে জারি করা হল কেন?

বেশ একটু কৌতুহলের সঙ্গেই কালাচাঁদ কবির প্রতীক্ষা করে।

জহর এলে সে সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। চেহারা পোষাক চালচলনে জহর একেবারেই তাদের মত নয়, এতকাল নানা বয়সের নানা ধরণের যে সব কবির এই প্রেসে পদার্পণ ঘটেছে।

নিখুঁত চেহারা, নিখুঁত বেশ, সৌম্য শান্ত ভাব।

পুরু ঘন নীলাভ প্যাডের কাগজে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে যেন হরফের আল্পনা কেটে, ছবির মত হরফ সাজানো ছবি এঁকে।

কি করে টের পায় কে জানে, ধনদাস তার কাঠের ঘুঘলি থেকে বেরিয়ে আসে।

উমাকান্তের কপি ঘরে নিয়ে গিয়ে হরফ কষা বাদ দিয়ে, বিশ্রী বাঁকা হস্তাক্ষরের লেখা কপিগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে, যে প্রাণপণ চেষ্টায় শব্দ ধরে ধরে, কথা ধরে ধরে, এগিয়ে খানিকটা বুঝবে মোট কথাটা কি আছে, কি ভাবে লিখেছে, তারও উপায় নেই।

প্রুফের সঙ্গে গেঁথে ফিরিয়ে দিতে হয় হাতে লেখা কপি। সে কপি আর ফেরত আসে না।

হাতে লেখা কপি সযত্নে ষ্টিল ট্রাঙ্কের দুর্গে তুলে রাখবে—ভবিষ্যতের হিসাব কষে।

কে জানে হয় তো একখানি তার হস্তলিখিত ম্যানাস্ক্রিপ্টের দাম হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা—

কত রকমের লেখক আর কবির যে আবির্ভাব ঘটে ছাপাখানায়!

সখের কবি, সখের বই ছাপতে আসে। মহেশ উপদেশ দিয়ে কালাচাঁদকে প্রস্তুত করে রাখে। কারণ, কবি নিজে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দিতে ভালবাসে, কি ভাবে তার বইটি ছাপা হবে। শুধু প্রুফ দেখে বুঝিয়ে তার স্বস্তি নেই। আলাপ করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তালিম দিয়ে মহেশ বলে, যা বলেন মন দিয়ে শুনবে, কাজ বন্ধ রেখে।

কালাচাঁদ আগে তৈরী করা খৈনিটুকু কাগজ থেকেই মুখে ঢেলে জিব দিয়ে নীচের ঠোটের ফাঁকে ঠেলে দেয়।

হরফ বেছে, সীসার হরফ সাজানোর হাতে খৈনি তুলে মুখে দিতে সাহস হয় না—কে জানে একটু সীসা ভিতরে গেলে কিভাবে ফেটে বেরোবে ফোড়ায় ফোড়ায়, নয় তো চর্ম্ম-রোগে!

কালাচাঁদ আরেকবার তাকায় মহেশের দিকে।

মহেশ আরেকবার শ্রান্তমুখে মাথা হেলিয়ে তাকে জানায়—কাজ বন্ধ করে আলাপ করবে মানুষটার সঙ্গে, বুঝলে? নইলে বাবু চটবেন!

এ হুকুম নতুন নয়। প্রেসে যারা কাজ যোগায়, পয়সা দেবার কারণ-স্বরূপ হয়, মনের খুঁতখুঁতানি থেকে তারা এসে কাজের ক্ষতি করিয়ে কম্পোজিটারকে খুঁটিনাটি নিয়ে অনাবশ্যক ও অকেজো উপদেশ দিতে চাইলে উপায় কি !

ঢালাও হুকুম দেওয়াই আছে যে এ ক্ষেত্রে ভদ্রভাবে নম্রভাবে সবিনয়ে কথা বলাটাই কম্পোজিটারের কাজ।

ছাপার ব্যাপারে যত অজ্ঞ হোক, যত হাস্যকর উপদেশ ঝাড়ুক, পাকা কম্পোজিটারের বিদ্যা ফলানো চলবে না। এমনভাবে তাকে প্রকারান্তরে কাজটা করার কথা বলতে হবে যেন অভিমানে ঘা না লাগে।

ভাগ্যে এরকম লেখক কবির সংখ্যা বেশী নয় !

ভাগ্যে তারা অধিকাংশই ছাপার ব্যাপারে মহেশের সঙ্গে কথা বলেই সন্তুষ্ট থাকে !

নইলে কালাচাঁদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কারণ, খুঁতখুঁতে ওই সব বাবু লেখক কবিদের সঙ্গে কারবার চালাতে হয় তাকেই।

কিন্তু চালু হুকুম আজ আবার এমন বিশেষ ভাবে জোর দিয়ে জারি করা হল কেন ?

বেশ একটু কৌতূহলের সঙ্গেই কালাচাঁদ কবির প্রতীক্ষা করে।

জহর এলে সে সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়। চেহারা পোষাক চালচলনে জহর একেবারেই তাদের মত নয়, এতকাল নানা বয়সের নানা ধরণের যে সব কবির এই প্রেসে পদার্পণ ঘটেছে।

নিখুঁত চেহারা, নিখুঁত বেশ, সৌম্য শান্ত ভাব।

পুরু ঘন নীলাভ প্যাডের কাগজে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে যেন হরফের আয়না কেটে, ছবির মত হরফ সাজানো ছবি এঁকে।

কি করে টের পায় কে জানে, ধনদাস তার কাঠের ঘুপলি থেকে বেরিয়ে আসে।

হাসিমুখে বলে, এলেন তবে সত্যি !

জহর বলে, হ্যাঁ, এলাম। ছোট প্রেসেই ছাপাব বইটা।

: ছোট প্রেস বলছেন? বছরে প্রায় হাজার দু' ফর্মা মেক আপ হয়।

: প্রথম বইটা যে প্রেসে ছাপিয়েছিলাম সেখানে একটা ফর্মাই পঞ্চাশ হাজার থেকে দু'তিন লাখ ছাপে।

ধনদাস জহরকে অপদস্ত করে না। বুঝিয়ে দেবার চেষ্টাও করে না যে ফর্মা কত রকমের হয় এবং বাংলা গল্প কবিতার ফর্মা পঞ্চাশ হাজার ছাপার কল্পনা পাগলেও করে না !

সে হেসে বলে, চাইলে আপনার বইটা পঞ্চাশ হাজার ছাপতে কি অরাজী আছি ! আপনি নিজেই বললেন দেড় ফর্মার বই, দেড় হাজার ছাপবেন। পঞ্চাশ হাজার ছাপুন না, দেখুন, কি রকম সস্তা হয়ে গেছে ছাপা খরচ !

লেখক গ্রাহকদের বসার জন্য মহেশের টেবিল-ঘেরা চেয়ারগুলির মধ্যে সব চেয়ে ভাঙা, সব চেয়ে জোড়াতালি দেওয়া চেয়ারটাতে ধনদাস বসেছিল। বসেই টের পেয়েছিল চেয়ারের অবস্থাটা।

কত সতর্ক হয়ে কত সাবধানে নিজের প্রেসের ছাপার কাজের এবং নিজের কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরের চেয়ারটাতে সে যে বসেছে সকলেই সেটা টের পায়।

এ রকম চেয়ার যে তার ছাপাখানায় থাকে সেজন্য সে কাউকে দোষী করতে পারবে না, কারণ নতুন চেয়ারের কথা তাকে বার বার বলা হয়েছে। কাল হয়ত ব্যবস্থা হবে।

জোড়াতালি ব্যবস্থা। তার বেশী কিছু নয়।

জহরের মুখের ভাব দেখে ধনদাস হাল্কা হাসি হাসে। বলে, এ সব হল ব্যবসার কথা, প্রচারের কথা। আপনি হলেন কবি মানুষ, এ সব নিয়ে

আপনার মাথা ঘামিয়ে কি দরকার মশায়? কবিতা লিখবেন, অর্ডার দেবেন, যেমন বলবেন তেমনি ছাপিয়ে দেব। আমাদের কাজটাই তো তাই, আপনাদের প্রচার সহজ করা।

বলেই সে ডাকে, কালাচাঁদ!

কালাচাঁদ হরফ সাজানো ফেলে ধীরে ধীরে উঠে এসে নীরবে দাঁড়ায়, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়ে রাখে।

ধনদাস বলে, কপিটা ওর হাতে দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবেন যান। দেখবেন, যেমন কপি দিয়েছেন তেমনি প্রুফ গিয়েছে। একটু এদিক ওদিক পাবেন না।

সিল্কের ফিতায় জড়ানো কবিতা লেখা দামী নীলাভ কাগজগুলি কালাচাঁদের হাতে দিয়ে জহর প্রায় ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, যেমন দিয়েছি ঠিক সেই রকম পারবে তো সাজাতে?

: আগে দেখি!

সন্তর্পণে কালাচাঁদ জহরের হাতে লেখা কবিতার স্লিপগুলি এক এক পাতা করে উল্টে যায়—কবিতাগুলি না পড়ে এবং না বুঝেই হিসাব করে যায়, কি ভাবে ছাপানো সম্ভব, এই ছবি করে করে এঁকে লেখা হরফে রচিত দেড় ফর্মা দু' ফর্মার মত কবিতার বইটা!

প্রায় দশ মিনিট সময় লাগায়। সবাই অধীর হয়ে ফেটে পড়তে চেয়েও অগত্যা চুপ করে থাকে।

শেষ পাতা উল্টে সে মাথা নেড়ে বলে, টাইপে এ রকম হবে না, ব্লক করতে হবে।

ধনদাস জহরকে বলে, সে আমরাই সব করে দেব, ভাববেন না। তবে কিনা খরচটা—

কাজ বন্ধ করে কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হলেও মানব রাগে না, বিরক্তিও বোধ করে না।

জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাকি গল্প উপন্যাস কম্পোজ করার ঝোঁক বেশী? অন্য বই ধরলে কাজ সুবিধে হয় না?

কালাচাঁদ প্রায় সলাজ হাসি হেসে বলে, কেমন একটা বদ অভ্যেস জন্মে গেছে। ওসব বই নীরস খটমট লাগে, তেমন হাত চলে না।

: এখন কি চালাচ্ছ?

কালাচাঁদ বেশ রসিয়েই জহরের কবিতার বইয়ের গল্প শোনায়, বলে, ছেলেখেলার লেখা কবিতা—একটা লাইনের মানে বোঝা দায়!

মানব বলে, মানুষের নিজের লেখা সন্তানের মত দামী।

: তাই তো দেখলাম। কোন পাতায় হেডিং দেওয়ার পর কতটা ফাঁক যাবে, কোন লাইন ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলবে—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! আদ্ধেকের বেশী ব্লক হবে।

: বাদ দাও। বাবুকে সিরিয়াস্ কোন কাজ দিতে বলো।

: কী করে বাদ দেব? স্পেশাল ডিউটি। কর্তা বলেছেন, একটা কমা সেমিকোলন এদিক ওদিক হলে, একটা হ্রস্বই দীর্ঘই গোলমাল হলে আমাকে বিদায় করে দেবেন।

: সাহিত্য কম্পোজ করার ঝোঁক চাপার মুস্কিলটা দেখলে তো? যারা প্রাণ দিয়ে লেখে, বাজে সখের লেখা নিয়ে তাদের যে কি ঝামেলা! ঠিক মেথরের মত জঞ্জাল সাফ করতে করতে লেখা চালিয়ে যেতে হয়। যে লেখাটা নিয়ে তোমার স্পেশাল ডিউটি, এগুলিই সব চেয়ে বিশ্রী জঞ্জাল।

: লেখার সখটা খারাপ নাকি মানু বাবু? সখ না হলে এত কষ্ট করে সবাই আপনারা লেখেন কেন? কেউ তো বলেনি যে লিখতে হবেই! অন্য কাজ করলে হয়।

: স্বাধীনতার জন্য দেশের কতলোক প্রাণ দিয়েছে, কত লোক জেল

খেটেছে জানো তো? কী দরকার পড়ে তাদের জেল খাটায়, প্রাণ দেবার? অন্য কাজ করে নিজে বেঁচে বাপের নাম বজায় রেখে গেলেই হত!

কথাগুলির তাৎপর্য অনুভব করে কিন্তু স্পষ্ট মানে ঠিক ধরতে পারে না বলে কালচাঁদ চুপ করে চেয়ে থাকে।

মানব হেসে বলে, ধরো আমি একজন সত্যিকারের লেখক। আমি কি সখের জন্য লিখি? অমি লিখি প্রাণের তাগিদে। না লিখে উপায় নেই বলে লিখি। কত লোকের কত সখ তো মেটে না। লেখাটা সখের ব্যাপার হলে কেউ এত কষ্টও করত না, জগতে সাহিত্য বলে কিছু সৃষ্টিও হত না।

কালাচাঁদ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে চুপচাপ ভাবে।

তারপর গভীর হতাশার স্বরে বলে, মুখ্যু হওয়া কী অভিশাপ মানুবাবু—অল্প একটু বিদ্যের স্বাদ পাওয়া! সখের এত রাবিশ লেখা ছাপা হচ্ছে—

: শুধু সখের লেখা নয় কালাচাঁদ, লেখার বাজারে মুদীদোকানী মালের মত লেখাও ঢের ছাপা হচ্ছে পয়সার জন্য।

: মনে হয়, কিছু জানি না, কিছুই বুঝি না, বৃথাই মোদের জন্ম।

: তোমাদের জন্ম বৃথা হয়ে থাকলে, আমাদের লেখাও বৃথা হয়েছে কালাচাঁদ। মুখ্যু তোমাদের জন্ম বৃথা ধরে নিয়ে, পণ্ডিত আমরা যারা লিখতে চাই, তাদের জন্মও বৃথা'হয়ে যায়।

: বটে নাকি?

: তবে কি? তোমাদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতার জন্য জেলখাটা প্রাণ দেওয়া পর্য্যন্ত বাতিল হয়ে গেছে। তোমাদের বাদ দিয়ে লেখক হবার ফ্যাসনও গেছে শেষ হয়ে। তোমরা দেশের সাধারণ মানুষ, বেশীর ভাগ মানুষ, তোমরাই তো আসল দেশ।

আত্তির তীক্ষ্ণ গলা শোনা যায়, মা বলছে, কাজে যাবে না বাবা?

মানবের সস্তা পুরাণো টাইমপিসটার বিবর্ণ ডায়েলের দিকে এক নজর তাকিয়েই কালাচাঁদ যেন আঁতকে ওঠে!

: হায় সব্বোনাশ! এমনিতে লেট হবে, সরোজবাবু ওদিকে এসে বসে থাকবে। কর্তা আজ তাড়াবেই আমাকে।

মানব তাকে অভয় দিয়ে বলে, ঘড়িটা বিশ মিনিট ফাষ্ট চলছে—ভয় পেয়ো না। সূর্য্য কোথায় দেখে বেলা আঁচ করে আত্তি রোজ তোমায় যেমন তাগিদ দেয়—আজও তাই দিয়েছে। তুমি এ'ঘরে আছো, শুনতে পাবে কি পাবে না ভেবে গলাটা আকাশে চড়িয়ে দিয়েছে।

: মিনিট দশেক আরও তবে বসে যাই?

: অনায়াসে। আত্তি তিনবার তাগিদ দিলে তবে তো রোজ তুমি নাইতে যাও? আত্তি ঠিক আরও দু'বার চেঁচাবে।

কালাচাঁদ আনমনে বলে, ভারি চালাক চতুর হয়েছে মেয়েটা। যার তার হাতে দিতে মন চায় না। তবে না দিয়ে উপায় নেই আর। বয়েসের আন্দাজে বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে।

মানব টের পায় আত্তির কথা কালাচাঁদ আনমনে বলেছে, সে বলতে চায় অন্য কথা। মানব নীরবে প্রতীক্ষা করে।

খানিক উসখুস করে কালাচাঁদ কাঁচুমাচু করে বলে, অল্প লেখাপড়া শেখা কেউ যদি চেষ্টা করে, আপনাদের মত লিখতে পারবে?

: নাঃ।

একটা নিশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ।

: ব্যাপারটা বুঝে চেষ্টা করলে তুমি কিন্তু লিখতে পার ভাই, পেটে তোমার যতই কম বিদ্যা থাক।

কালাচাঁদ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে।

: বড় বড় বিদ্বান লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে কিন্তু

পারবে না, চেষ্টা করতে গেলে দু'এক বছরে টি, বি, জন্মে যাবে, দু'চার আট মাসে মরবে।

: তবে— ?

কালাচাঁদের উৎসুক চোখে উৎসাহ যেন জ্বল জ্বল করে !

: তবে, তোমার চেয়েও যারা মুখ্যু, তুমি যেটুকু জানো তার হাজার অংশও যারা জানে না বোঝে না, তাদের জন্য যদি লেখো—তবে কম বিদ্যা নিয়েও লিখতে পারবে।

মানব হঠাৎ হেসে ওঠে।

: নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য যারা লেখে তুমি মাথা ঘামিয়ে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা ভাবছ নাকি ?—

থাতস্থ হয়ে কালাচাঁদও হেসে বলে, মুখ্যু বলে কি আমি অমন মুখ্যু মানুবাবু !

মানব একটু সর্দ্দির ভাব টের পেয়েছিল—গা ম্যাজ ম্যাজ করার ভাবটাও।

উপবাসে উপকার হবারই কথা।

কিন্তু এক দিনেই দাঁড়িয়েছিল নিদারুণ সদ্দিকাসিতে। নাক বন্ধ, মগজটা পর্য্যন্ত যেন সদ্দিতে টস্‌টস্‌ করছে। চোখ মেলে চাইতে গেলে চোখ টনটন করে। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে হাঁপধরা টুসটুসে ফুসফুসটা নেতিয়ে ঝিমিয়ে পড়তে চায়।

কোন্ ফাঁকে আভি এক মগ চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে সে টেরও পায় নি।

আদার রস মেশানো গরম চা।

যেচে আদা-চা দিতে আসার আগে জড়ানো শাড়ীটা যথাসম্ভব ঢিল করেছে আভি। শ্রান্তিতে মুখচোখ যেন প্রতিবাদের ছবির মত হয়েছে।

অস্থিনের মতই মুখ—দেহটা খেটে খেটে সারা হয়ে গেলে যেমন মুখ হয়। লুকিয়ে চুপিচুপি আদা-চা এনে দিয়েছে কিন্তু চোখ মুখে তার এতটুকু ভাবান্তর নেই।

তার সর্দ্দি হয়েছে এটা জানতে হয়, আদা-চা করে আনতে হয়, উপায় কি!

সে যেন গ্রাহ্যও করে না এই হিসাব যে, মানবের নিদারুন সর্দ্দিকাশি হয়েছে এ সংবাদ জান'তেও কেউ তাকে বলেনি, সংবাদ জেনে আদা-চা তৈরী করে এনে দিতেও কেউ তাকে বলে নি!

আস্তি প্রায় আদেশের স্বরে বলে, ধীরে ধীরে গরম গরম চুমুক চুমুক খান। বেশী খাবেন না একেবারে, জিভ পুড়ে যাবে, লাভ হবে নাকো। ধীরে ধীরে খান—একটু একটু চুমুক দিয়ে গরম সইয়ে খান।

মানব এক হাতে চায়ের মগটা নেয়, অন্য হাতে আস্তির হাত ধরে।

মগটা নামিয়ে রেখে আস্তিকে সে বুকে টেনে নেয়।

আস্তি নড়ে না, সাড়াও দেয় না, প্রতিবাদও জানায় না। কাঠ হয়ে থাকে।

মানবও কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক নিস্কম্প হয়ে থেকে আস্তিকে ছেড়ে দিয়ে চায়ের মগটা তুলে নিয়ে চৌকীতে বসে।

আস্তি নীরবে বেরিয়ে যায়।

মানব ভাবে কেন পারলাম না?

মায়া করে বলেই কি? মায়া কাটিয়ে যতই নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয়ে উঠতে সাধ হোক না কেন, মায়া তাকে চরমে উঠতে দেয় না!

ভীতা ব্যথিতার নীরব প্রতিবাদ তাকে কাবু করে দেয়! কী করে পারা যাবে এদের সঙ্গে!

যারা এত নরম, অথচ এমন কঠিন !

সারাদিন ছটফট করে মানব সিদ্ধান্তে পৌছায়, আত্তির কাছে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

হোক বস্তিবাসী গরীব কম্পোজিটারের মেয়ে। অসভ্যতা করার জন্ত তার ক্ষমাপ্রার্থনা ওর পাওনা হয়েছে।

প্রায় তখন সন্ধ্যা।

আত্তির মা রাত্রি সাড়ে তিনটে নাগাদ উনান ধরিয়ে রেঁধে ফেলে দুবেলার রান্না—পচা চাল, পচা আটা, ঘাসপাতা যা কিছু জোটে দুবেলার মত। নইলে একবেলাই খায়।

মানব ভেবেছিল, আত্তির কাছে ব্যাপার শুনে সবাই রেগে টং হয়ে আছে, মুখ সকলের অন্ধকার দেখবে।

সে ফিরলেই আত্তির মা ছেঁড়া ময়লা শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়িয়ে তাকে গাল দিতে আর শাপ মন্দ করতে সুরু করবে।

আত্তি রোয়াকে বসে আটা চালছিল। তার মানে ওবেলা দু'বেলার রান্না হয় নি, আটা যোগাড় করে এ বেলার জন্ত রুটি পাকানো হচ্ছে।

আত্তি একগাল হেসে নীরব অভ্যর্থনা জানায়।

কী ঝকঝকে তকতকে দাঁতগুলি তার !

হেসে কিন্তু আত্তি আড়ালে পালায় !

লাবণ্যহীন চর্ব্বিবিহীন কী আঁটো সাটো গড়ন ! কতবার দেখেছে তবু আজ যেন আবার প্রথম চোখে পড়ল।

কাল হাত ধরে বুকে টানার সময়ও খেয়াল ছিল না। ভাল খেতে না পেয়েও তার দেহটা এত সুন্দর কি করে হল ?

শুধু দেহ সুন্দর নয়, কি করে এত পরিষ্কার হল তার মন ?

আত্তির মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তাড়াতাড়ি চটের টুকরোটা পেতে তাকে বসতে দেয়।

আসন হিসাবেই ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল ছেঁড়া চটের টুকরোটা।

অপরাধীর মত সে বসতেই আত্তির মা বলে, এত বোকা হাবা হয়েছে মেয়েটা! নষ্ট হারামজাদিদের মত। আপনজন একটু বেশী আদর করলেই দফা নিকেশ। মানুষের আদর চেনে না। চিনবেই বা কি করে? বাপের সাথে তো দেখা সাক্ষাত দু'চার মিনিটের—

বলতে বলতে সে হাঁকে, আত্তি! মুখপুড়ী!

আত্তি এলে বলে, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর মুখ্যু মেয়ে!

মানব হাসি মুখে বলে, আদর করছিলাম বুঝতে পার নি কেন বল দিকি আমায়?

: অমন আদর ভাল লাগে না। আল্‌তো আদর সবাই করতে চায়।

৩

উমাকান্ত ভোরে ওঠে।

লিখতে গিয়েই দেখা গেল, কলমটা চরম ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। কাগজে একটা আঁচড় কাটতে রাজী নয়।

পেনটার পেটে জবরদস্তি কালি ভরে, নিবটাকে জবরদস্তি ঠিকঠাক করে সৃষ্টির প্রেরণায় গদ গদ আনন্দের প্রসব বেদনাকে চরমে ফাঁপিয়ে তুলে লেখার তাগিদে লিখতে গিয়ে দেখা গেল, কলমের কালি ভরা মোটা পেট আর দামী ধাতু দিয়ে গড়া নিবের সূক্ষ্ম মুখের মধ্যে ঘটে গিয়েছে সাংঘাতিক এক বিরোধ আর অসহযোগিতা!

কলম মাথা খুঁড়ে মরতে চাইছে সাদা কাগজের প্রশস্ত বুকে, ওই কাগজের বুকে ঘুরে ঘুরে শোষিত হয়ে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলতে চাইছে নিবের সূক্ষ্ম মাথা, কিন্তু পেটের আর মাথার অসহযোগিতায় একটা আঁচড় টানা যাচ্ছে না!

নূতন একটা কলম কিনতেই হবে।

সস্তায় বেশ ভালরকম একটা কলম। গল্প লিখতে যে কলম সহায় হবে, বাধা হবে না।

পুতুল শুনে আকাশ থেকে পড়ে!

: লেখা হয়নি গল্পটা? টাকা দিয়ে নিয়ে যায়নি লেখাটা? টাকা দিয়ে যাবে না আজকালের মধ্যে? খোকনটা তবে মরবে ঠিক করেছ তো?

: আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

: দায় নিয়েছ তুমি, দোষ দেব কাকে?

: সব দায় আমার? তোমার কোন দায় নেই?

: আমার দায় তো আমি পালন করছিই। রাঁধছি, বাড়ছি, খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি, জামাকাপড় কাচ্ছি, বার্লি করছি, ওষুধ খাওয়াচ্ছি, গরম জল করে সেঁক দিচ্ছি, ঘায়ে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছি, তোমার আদরের কুকুরটাকে পর্যন্ত খেতে দিচ্ছি—

পুতুল কেঁদে ফেলে।

কেঁদে ফেলে নি দেখাবার জন্য হেঁচে কেসে আঁচলে মুখ মুছবার ছলে একটু আড়ালে সরে যায়।

পরস্পরের সংঘাতে প্রেম সৃষ্টি করার মজায় মজে থাকা যায় না পাঁচ মিনিটের বেশী।

লেখার ব্যবস্থা করতেই হবে—ভাবতে হবে কি ব্যবস্থা করা যায়! উমাকান্ত বসে বসে ভাবে।

ওদিকে ছেলেমেয়ে কটা আর্ত চীৎকারে জগৎ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

তার কলম ভাঙার রাগে তার সঙ্গে ঝগড়া করে পুতুল ওদের কোন্ অজুহাতে পিটিয়ে দিয়েছে কে জানে!

পুতুল আবার আসে।

গায়ে তার অলঙ্কার বলতে প্রায় নেই।

কানের ফুটোটা কানপাশার ভারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল বলে সেটাও পুতুল বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছিল। সেই কানপাশা সামনে ধরে তেজের সঙ্গে বলে, যাও, বিক্রী করে কিনে নিয়ে এসো দামী একটা কলম। লেখো তোমার গল্প। সোমবার রেশন না আনলে হাঁড়ি চড়বে না একথাটা দয়া করে মনে রেখো।

: উনানে হাঁড়ি চড়াবার জন্য আমি গল্প লিখি নাকি ?

: হাঁড়িই যদি না চলবে তবে মিছে কলম চালানো কেন ?

: হাজার হাজার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না বলে, ওদের নিয়ে গল্প লিখব বলে।

: কী হয় ওদের নিয়ে গল্প না লিখলে ? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে ওদের নিয়ে গল্প লেখার জন্য ? নিজের ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, যাদের হাঁড়ি চড়ে না তাদের নিয়ে গল্প লেখার সখ!

উমাকান্ত আর তর্ক করে না। পুতুলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দেড় কাপ চা খায়।

কী চরমে যে উঠে গেছে পুতুলের চা খাওয়ার নেশা!

তার লেখার নেশার সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চালাতে চাইছে চা খাওয়ার নেশাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে!

পুতুলের ভাঙাচোরা দেহে আসন্ন মাতৃত্বের ভাব দেখতে দেখতে, তার মুখের লাবণ্য-হীনতার বিদ্রোহ দেখতে দেখতে উমাকান্ত আত্মজ্ঞানের আরেক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

পুতুলকে ভেঙে ভেঙে দমিয়ে দমিয়ে কাহিল করা যাবে। প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার নিজের মনের মত পছন্দ মত নতুন করে গড়ে নেওয়া যাবে না!

কারণ, পুতুলও নিজের কায়দায় তাকে খেলিয়ে রাগিয়ে ভুলিয়ে মন যুগিয়ে হেসে কেঁদে রাগ অভিমান করে, তাকে নিজের মনের মত পছন্দ মত করে নেবার লড়াই চালাচ্ছে।

লড়াই সে শুধু একাই করে না।

পুতুলও লড়াই করতে জানে।

আবেগের সুরে উমাকান্ত বলে, থাক্‌গে। ওসব ব্যাপার তুমি বুঝবে না। কাল সকালে লেখাটা নগদ মজুরি দিয়ে নিতে আসবে। কলমটা বিগড়ে না গেলে আজ রাতের মধ্যেই লেখাটা রেডি করে ফেলতে পারতাম।

পুতুল রান্নাঘরে ফিরে যায়। জামা গায়ে দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উমাকান্ত গভীর আপশোষের সুরে বলে, নতুন কলম দিয়ে কেমন লেখা বেরোবে কে জানে!

চটপট, বিস্বাদ সাদা গরম বিশ্রী আটার লেচিগুলি, বেলতে বেলতে মুখ না তুলেই পুতুল বলে, বাঃ, বেশ! বিলাতী কলম বিগড়োলেই লেখক মশায়ের দফা শেষ। কত বড় লেখক, বিলাতী কলম দিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজে লিখে লিখে কলম পিষে পিষে, কাগজ-কলমে দেশের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছিলেন। কলমটা বিগড়ে গিয়ে মুস্কিলে পড়েছেন।

: কলম ছাড়া লেখা যায় নাকি—শুধু হাতে?

: কেন দোয়াত কলমে লেখা যায় না? পেন্সিলে লেখা ফোটে না? কলম ভেঙেছে, বাড়ীতে দোয়াত কলম নেই, পেন্সিল নেই?—ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে না?

লেচি বেলা শেষ করে কচ্‌কচ্‌ করে কুমড়োর ফালিটা কাটতে কাটতে পুতুল কথাগুলি বলে। ছেলেমেয়ে খেয়ে দেয়ে স্কুলে যাবে—দশটায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফিরে আসবে বিকাল সাড়ে চারটায়।

ডাল তরকারি ছেঁচকি খেতে না দিলে, মাছ পাতে না পাওয়ার অভিমানকে বেত লাঠির শাসনে কাবু না করলে, ওদের কি সামলানো যায় ?

কলম কিনে বাড়ী ফিরতেই ছেলেমেয়ের এলোমেলো অস্থির কলরবে বিভ্রান্ত উমাকান্ত কয়েক মুহূর্ত নড়তে পারে না।

তারপর—চোখ থেকে প্রাণ থেকে জীবনান্তকর শ্রমের শ্রান্তি কোঁচার খুটে মুছে ফেলতে ফেলতে, মানব-দায় ঘাড়ে নেওয়ার স্বরে বলে, কি রে ? কি হয়েছে ?

: মা যে মরে যাচ্ছে বাবা !

ছেলে মেয়ের আর্তনাদ, শ্রান্তি-ক্লান্তির জের টানা বন্ধ করে দেয়।

উমাকান্ত প্রায় একটা লাফ দিয়ে পৌছায়, রান্নাঘরে কয়েকটা চট বিছানো শয্যায় শায়িত পুতুলের কাছে।

উনান জ্বলছে।

হাঁড়িতে ডগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে সহজে ফোটা খাওয়ার বিরোধী, রেশনের পচা দামী চাল—ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে পুতুলের চট-ফট দিয়ে তৈরী শয্যায় একটা নতুন সদ্যোজাত মানুষ !

পুতুল বলে হাসপাতালে পাঠাতে গেলে তুমি বিকল হবে জানি তো ! ঘরেই তাই চালিয়ে দিলাম। ভাত ফুটতে দেরী আছে, কী বিশ্রী চাল কী বলব তোমায় ! বুনোর মাকে ডেকে নিয়ে এসো। উনানে কুঁচো কয়লা

দিয়ে যেতে বলবে—যেন না নেভে। সারা রাত সেঁক দেবে, পাঁচটা টাকা কবুল করো।

পুতুল গা এলিয়ে দেয়। ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে সদ্যোজাত রক্তমাখা বাচ্চাটা।

পুতুল যেন জীবনকে জন্ম দেবার দাসীত্বপনার রাগে দুঃখে অভিমানে মরতে চেয়ে সন্তানের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে তার চোখের সামনে জ্ঞান হারিয়েছে।

উমাকান্ত দ্বিধা করে না। জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উমাকান্ত খন্তি দিয়ে উনানের তলা খুঁচিয়ে আঁচ বাড়িয়ে, উনানে আরো কয়লা দেয়। কেটলি ভরে জল ফুটতে দিয়ে উমাকান্ত তার সবটুকু অনভিজ্ঞতা নিয়েই ডাক্তার আর ধাত্রীর কাজে লেগে যায়।

ডাক্তার নেই! ধাই নেই। অন্য সমস্ত দায় ভুলে না গিয়েও তার ছেলের, ছেলেটার মার, প্রাণ বাঁচাতে তাকেই ডাক্তার আর ধাত্রী না হয়ে উপায় কি!

এইটুকু একটা বাচ্চা বিয়োতে কত রক্ত ঢেলেছে পুতুল!

তারপর অবশ্য যেতেই হবে ডাক্তার আর ধাই-এর খোঁজে—অথবা পুতুলকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

টাকা চাই, টাকা!

পুতুলকে বাঁচাতে টাকা যোগাড় করতেই হবে।

প্রেসের মালিক ধনদাস বসে, কোণের দিকে কাঠের ঘেরা কুঠরিটাতে। প্রেসের খোলা হলের মধ্যে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার নিয়ে মহেশের দপ্তর।

এইখানে বসে সে 'রস সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনাও করে, প্রেসের কাজ দেখাশোনাও করে।

লেখকদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কম্পোজিটরদের সঙ্গে কাজের কথা, আর ছাপার কাজ করিয়ে যারা পয়সা দেবে তাদের বা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন চালানো,—সব সে একসাথে চালিয়ে যায়।

কোন কাজেই এতটুকু রোমাঞ্চ নেই।

মানব ও খালেক, মহেশের জন্য অপেক্ষা করছিল, শুকনো মুখে উমাকান্ত এসে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

একটি কথা বলে না! যেন চেনেই না মানব ও খালেককে!

তারাও চুপ করে থাকে। কে জানে কোন জ্বালায় জ্বলছে উমাকান্তের প্রাণটা!

পদে পদে উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা টের পাওয়া যায়।

যখন তখন সে সতেজে বলে, কেন? এ জাতে কী এমন অপরাধ সে করেছে যে আত্ম-বিনাশের প্রায়শ্চিত্ত বরণ করতে হবে?

লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে মানুষের মতই সে বেছে নিয়েছে তার কর্মজীবনের লাইন!

কেন সেজন্য মানুষ এমন অন্যায় দারিদ্র্যের বোঝা তার উপর এমন ভাবে ঠেকাবে?

লেখকের এত সম্মান দেশ বিদেশে। লেখক হতে চাওয়ার জন্যই তার হল এমন দশা।

লেখক হতে হলে কি সমাজ ছাড়তে হয়? সমাজের কাছে নিষ্প্রয়োজনীয় জীব হতে হয়?

যে দেশে দু'চারজন লেখক ছাড়া কারো দিবারাত্রি খেটেও পেট ভরে না, সে দেশের মানুষ কোন লজ্জায় লেখকদের সম্মান দেখায়?

ছাপাখানায় বসে নিজের বইটার প্রুফ দেখতে দেখতে মুখ তুলে প্রায়ই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ওটাই অসল কথা। লিখে পয়সা জোটে না।

দিনরাত মেতে থাকতে হবে, পেট চলবে না। কলকাতায় ভিক্ষে করে বেশী রোজগার হয়। তবু লোকে ভাবে নামের জন্য টাকার জন্য আমরা লিখি। একবার ভাবে না যে তাই যদি হবে, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র বড়লোক রবীন্দ্রনাথ লিখতে গেলেন কেন? টাকার তো তাদের অভাব ছিল না!

কথাগুলি মোটেই অসাধারণ নয়, কিন্তু প্রাণের ফুটন্ত জ্বালা যেন উপচে উপচে পড়ে কথাগুলিকে আশ্রয় করে। সম্প্রতি দিন দিন বেড়ে চলেছিল তার কথার ঝাঁঝ, অবুঝের মত হয়ে উঠছিল তার নালিশ—উমাকান্তের মত লেখকের মুখে মোটেই যা মানায় না।

অন্যেরা ব্যাপার জানে না, বুঝতে পারে না। লেখক-সুলভ পাগলামি মনে করে। কিন্তু মানবের তো ভাল করেই জানা ছিল—তার পুতুলদির ব্যাপার এবং উমাকান্তের অবস্থা।

সে তাই গভীর উদ্বেগ অনুভব করে। কিন্তু সহানুভূতি জানাবার উপায় নেই। উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা বেড়ে যাবে, সে রেগে উঠবে।

যে কথা চলছে সেই কথা বল, তর্ক কর, খোঁচা দাও—দয়া সমবেদনা জানিও না!

মানব তাই হেসে বলে, লোকে এত সম্মান দিয়েছে, তবুও লোককে দোষ দিচ্ছেন? কিছু লোক লেখকদের ছোট ভাবতে পারে—সাধারণ লোকে তা ভাবে না। রাগ করে লাভ কি বলুন, কত লেখক টাকার জন্য কত কি যা তা লিখছে, নিজেকে বিক্রী করছে। ওরা যাদের পা চাটে তারা তো ধরে নেবেই লেখকরা মানুষ নয়।

সীসার হরফ বাছতে বাছতে সাজাতে সাজাতেই কালাচাঁদ মন দিয়ে তাদের কথা শোনে।

উমাকান্ত আরও চটে গিয়ে বলে, কারো পা চাটার দরকার হবে কেন লেখকের? এ অবস্থায় কেন মানুষ লিখবে?

সবই উমাকান্ত জানে এবং বোঝে। মানব তাই হাসে না। প্রাণের জ্বালায় সেই জানা কথাটা সে যে ভুলে গেছে এটুকু শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়।

বলে, মানুষকে কিছু বলার নাছোড়বান্দা তাগিদ থাকলে না লিখে উপায় থাকে না, তাই মানুষ লেখে।

: তুমি আমি পেটে না খেয়ে লিখি কেন?

: পেটে খাওয়ার চেয়ে লেখার তাগিদ আমাদের জোরাল বলে!

: সখের লেখায় কিসের তাগিদ!

: একই তাগিদ—দশজনকে কিছু শোনাব। আসল লেখার তাগিদটা প্রাণের, সখের লেখার তাগিদটা হয় সখের।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে ধনদাস হয়তো একবার বাইরে আসে—নিছক একটু ভদ্রতা করতে। মানব ও উমাকান্তের সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিন্তু সোজাসুজি অন্য কোন কারবার নেই।

সব কিছু মহেশের মারফতে চলে।

: কেমন আছেন উমাবাবু, মানুবাবু, খালেক সায়েব?

তিন জনে একটু হেসে তার ভদ্রতার জবাব দেয়।

ধনদাস শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। কাজে এতটুকু শিথিলতা ঘটলে সে ধরবেই!

বিশেষভাবে সে কালাচাঁদের দিকে তাকায়। কাজ কামাই করে সে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল কিনা এই জিজ্ঞাসা চোখে নিয়ে যে তাকায়, সেটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না মানব আর খালেকের। ধনদাস কি ভাবে সেই জানে, মুখে আচমকা হাসি এনে খালেককে খাতিরের সুরে জিজ্ঞাসা করে, বইটা নিজেই ছাপছেন ভাই?

এই প্রেসে খালেকের একটি কবিতার বই ছাপা হচ্ছে। পাইকায় তিন ফর্মা সাড়ে তিন ফর্মা হবে। সস্তা কাগজ,—ধনদাসের ধারণা কোন কাগজ ব্যবসায়ীর গুদামে চোখের আড়ালে পড়ে গিয়ে কিছু কাগজ

পচে যাবার উপক্রম করেছিল, সন্ধান পেয়ে ড্যাম চিপ দরে কাগজ বাগিয়ে খালেক কবিতার বই ছাপাবার সখ মেটাচ্ছে!

প্রেসের পাওনা আদায় করা সম্পর্কে খটকা ছিল। মহেশ নিজে দায়িক হয়ে আশ্বাস না দিলে, হয় তো কাজটা নিতে সে রাজীই হত না।

একুশ শ' বই ছাপছে। পুরানো রঙ ধরা সস্তা কাগজ, মলাটও হবে কাগজের, একটা দু'রঙের ব্লকের ছোঁয়াচ পর্য্যন্ত থাকবে না সে মলাটে, শুধু বড় হরফে ছাপা হবে বইএর নাম, কবির নাম সাধারণ ছোট হরফে—এই বই ছাপছে একুশ শ!

টাকা আদায়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে মহেশ বলেছিল, কনসেসন রেট দিতে হবে, নইলে কাজটা পাব না।

: না পেলাম?

: আলগা টাইপে চালিয়ে দেওয়া যাবে কাজটা। বুনো আর দীনু আধবেলা খাটছে। স্কুল বই-এর সিজন আসছে—অন্য প্রেস ওদের দু'জনকে বাগিয়ে নেবে কিন্তু।

ধনদাস উদারভাবে বলেছিল, দিন তবে ওই রেটটাই। তিন চার ফর্মার ব্যাপার তো, কি আর এমন এসে যায়।

প্রথম ফর্মা ছাপা হওয়া মাত্র খালেক সে ফর্মার টাকা জমা দিয়েছিল,—সবটা নয়। দু'টাকা হাতে রেখে দিয়েছিল। তবু এটা অভাবনীয় ব্যাপার। বই শেষ না করে এক ফর্মা ছাপিয়েই নগদ টাকা!

এই জন্যই ধনদাস তাকে একটু খাতির জানাতে এসেছে সন্দেহ কি! এভাবে যে পাওনা মেটায় তাকে সে বড়ই পছন্দ করে।

খালেক বলে, কেউ ছাপাবে না, কি করি। একজন পাবলিশার পেলাম, শুধু কাগজের দামটা দেবে। বই বিক্রী হয়ে কাগজের দামটা শোধ হবার পর লাভের একটা অংশ আমায় দেবে।

ছাপার যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজে মুখগুঁজে কর্মরত অন্য সব হরফ-শিল্পীদের কথা ভুলে গিয়ে ধনদাস হো হো করে সশব্দে হেসে ওঠে।

তার হাসির ধমকে চমকে যায় ছাপাখানা।

কিন্তু থেমে যায় না।

হরফ সাজানোর কাজ সকলে করে যায় মাথা গুঁজে।

ধনদাস হাসতে হাসতে বলে, কাগজের দাম দেবে নাকি? আমি ভাবছিলাম, কাগজ বুঝি আপনি কিনে দিয়েছেন, গুদাম পচা কাগজ সস্তায় বাগিয়েছেন। তাই তো বলি, কবিতার বই ছাপানোর জন্য এমন রদ্দি কাগজ! অন্য কারো ঘাড়ে চাপাবার উপায় ছিল না। এ কাগজ পয়সা দিয়ে কেউ কিনত না। ছেলেমানুষ নতুন কবি আপনার ঘাড়ে কাগজটা চাপিয়েছে।

খালেকও হেসে বলে, আজ্ঞে না। আমরা একালের কবি, বয়স কম বলেই অত ছেলেমানুষ ভাববেন না। আপনার মত বুড়োদের চেয়ে আমরা ঢের বেশী পেকে গেছি। কাগজ চেপেছে পাবলিশারের ঘাড়ে, আমার নয়। দোকানে বসেছিলাম, কাগজওলার লোক বলছিল যে এরকম কিছু রদ্দি কাগজ আছে, যদি কোন কাজে লাগান যায়। দাম একটা ধরে দিলেই হবে। আমিও সুযোগ বুঝে কবিতার বইটা ছাপানোর ব্যবস্থা ক'রে নিলাম।

: আর সব খরচ তো আপনার?

: আমার বৈকি! তবে নগদ, শুধু ছাপার খরচ। বাকী সব বই থেকে উঠে আসবে। কাগজ দেখে লোকে নিন্দা করবে পাবলিশারের, আমার কবিতার নিন্দা তো করবে না!

এমন তেজ আর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তরুণ কবি কথাগুলি বলে যে, ধনদাসের সশব্দে হাসবার আর সাধ্য থাকে না।

গায়ের জোরে মুখে একটু হাসি ফোটায়।

পিঠ চাপড়ানো স্বরে বলে, নাম করুন, বাজারে আগে নাম করুন, কষে ঢাক পেটান। নাম হলে বই ছাপানোর জন্য সাধাসাধি করবে।

খানিক পরে উমাকান্ত আসে।

পুতুল হাসপাতালে গেছে।

সেরে উঠে ফিরে আসবে। কোন রকমে কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে চালিয়ে যাওয়া।

আজ হাসপাতালে খবর নিতে গিয়ে পুতুলের অবস্থা এবং চিকিৎসার বিবরণ একজন রোগা কালো নার্সের কাছে শুনে, উমাকান্তের মনে হয়েছিল, এবার তার ক্ষেপে গিয়ে ভীষণ রকম কিছু একটা আবোল তাবোল পাগলামি করে, পুলিসের গুলিতে মরে গিয়ে শান্তি পাওয়া দরকার।

: কোন্ ডাক্তার দেখছেন ?

সাদা উর্দি পরা নার্স কবিতা, সাদা টুপি আঁটা মাথাটা উঁচু করে রেখেই বলেছিল, ডাক্তার দাস একজামিন করেছিলেন, তারপর ডাক্তার কেউ ছাখেন নি। উঁচু ক্লাসের দু'জন ছাত্রী দেখছিল, আজ তারা রিপোর্ট দিয়েছে যে ডাক্তারকে ইন্টারভেন করতেই হবে। ডাক্তার দাস এলেই যাতে সকলের আগে ওঁকে ছাখেন, আমি সে ব্যবস্থা করে দেব।

কবিতা হঠাৎ মাথা তুলে বলেছিল, আমাদের কাউকে দোষ দেবেন না। পেসেণ্ট আসে বন্যার মত। আমরা ক'জন ডাক্তার ক'জন নার্স কি করে সামলাবো ?

উমাকান্ত তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, ডাক্তার নার্স আপনারা সোজাসুজি সে কথা বলেন না কেন যে দায় নিতে পারবেন না ? মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করেন কেন ?

আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেরিয়ে, মরিয়া হয়ে উমাকান্ত ধনদাসের প্রেসে এসেছে শেষ চেষ্টা করার জন্য।

মহেশ বলে, আমায় তো বড় মুস্কিলে ফেললে তুমি! বিকালে দেবে বলে প্রুফ নিয়ে গেলে, নিয়ে এলে তিনদিন পরে!

উমাকান্ত বলে, কি করি বলুন? বৌটা ছিল পোয়াতি—হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেল। হাসপাতালে নিতে নিতে রক্ত ঝরে গেল বালতিখানেক। এখনো যায়-যায় অবস্থা।

: হয়েছিল কি?

: কিছু না। উচিত ছিল দিনরাত শুয়ে থাকা, সকালে বিকালে সাবধানে ধীরে ধীরে শুধু একটু হেঁটে বেড়ানো—বাসন মাজা ঘর মোছা হাঁড়ি ঠেলা, ছেলেমেয়ের ঠেলা—সব বন্ধ রাখা উচিত ছিল। উচিত কাজ না করার, উচিত ঠেলা সামলাচ্ছে।

: ধনদাসবাবু তো এসব কথা শুনবে না ভাই!

: না শুনলে না শুনবে, করব কি! ছেলেমেয়ের মা'টাকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না? বলেছি বলেই প্রুফ নিয়ে ছুটে আস্‌ব—বৌটা ওদিকে মরুক বাঁচুক? সিকি টাকাও দেয় নি—আরও সিকি ভাগ দেবে দেবে করে আজ কদিন ঘোরাচ্ছে।

: কেন যে ওরকম করে—

: করুক। আমি চেষ্টায় আছি। একটা পাবলিশার পেলেই এই বইটা যা পাই নিয়ে কপিরাইট বেচে দেব। তারপর যা হয় হবে দেখা যাবে—নয় জেল খাটব দু'চার মাস।

পরের ফর্মার প্রুফটা এখানে বসেই তাড়াতাড়ি দেখে দিতে দিতে সে কথা কয়—খেয়াল করে যে, ধনদাস ঠিক দু'তিন মিনিটের মধ্যে মহেশকে কি বলতে এসে—অর্থাৎ বলতে আসার ভাণ করে—তাকে দেখে যেন আশ্চর্য্য হয়ে—অর্থাৎ আশ্চর্য্য হবার ভাণ করে বলে, আপনার বাড়ীতে না বিপদ শুনলাম!

প্রুফশিট থেকে মাথা না তুলেই উমাকান্ত বলে, খুব বিপদ।

ব্যাপার বুঝতে দেরী হয় না। সকলেরই জানা আছে কাঠের ফ্রেমের কুঠারিটার কাছাকাছি বাইরের এই টেবিলে বসে মহেশ যার সঙ্গে যে কথা বলে ধনদাস নিজের কামরায় বসে সব শুনতে পায়।

: তবু নিজে প্রুফ দেখে দিতে এসেছেন? আপনারা সত্যি কাজের মানুষ! অসুখ বিসুখ মরা বাঁচার জন্য দু'চার দিন সময় নেওয়া যায়। দায়ে কি ফাঁকি দেওয়া যায় মশাই!

: বিপদে আপদে পাওনা টাকা না পেলে যে বিপদ ঠেকানো যায় না, সেটা কি ভেবেছেন মশাই!

ধনদাস আহত ভাবে একটু রাগের সঙ্গেই বলে, টাকাটা চেয়েছিলেন, চেক তৈরী করে রেখেছি—চট করে এসে নিয়ে যেতে তো পারতেন? আজ দোষী করছেন আমায়! নাঃ, আপনারা লেখকেরা বড় বেশী কাছা-খোলা মানুষ। সামান্য বিপদে আপদে এমন মাথা গুলিয়ে যায় আপনাদের!

উমাকান্ত নীরবে প্রুফ দেখে যায়।

: যাক গে। চেকে কাজ নেই। প্রুফটা দেখে যাবার সময় সব পাওনাটাই নগদ নিয়ে যাবেন। বিপদে আপদে এটুকু না করলে চলবে কেন!

নগদ টাকা!

রসসাহিত্যে তিন মাস ধরে ছ'সাত পাতা করে করে প্রকাশিত, ধারা-বাহিক উপন্যাসটার জন্য, পনের টাকা হিসাবে মোট মজুরি পঁয়তাল্লিশ টাকা!

মানব আর খালেকের গল্প কবিতায় থাকে কড়া রকমের বিদ্রোহের ঝাঁঝ। রসসাহিত্যের মত কাগজে যে ও রকম লেখার ঠাঁই হতে পারে না, সেটা তারা নিজেরাই জানে।

ও ধরণের লেখা দিয়ে মহেশকে তারা বিব্রতও করে না।

সামাজিক ব্যাপার নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপভরা লেখা হলে, দুঃখ-দুর্দ্দশার শুধু ছবিটুকু সামনে ধরে দিলেই সার্থক হয় এমন ধরণের লেখা হলে মহেশ আপত্তি করে না, ধনদাসও আপত্তি করে না।

এসবও বিদ্রোহের রচনা। ধনদাস কিন্তু সেটা ধরতে পারে না একে-বারেই! অথবা বিদ্রোহী লেখক কবিদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার আর কোন উপায় নেই বলে অগত্যা এটুকু সে মেনে নিয়েছে?

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তো হাসির ব্যাপার, ওতে দোষ নেই—স্বয়ং ভগবানকে নিয়েও তো হাসি-তামাসা করা হয়।

সংসারে দুঃখ-দুর্দ্দশা আছে, তার বর্ণনাতেও দোষের কিছু নেই—সে জন্য দায়ী কে, সেটা বিশ্রীরকম ভাবে না বলা থাকলেই হল!

এ রকম লেখা লিখলে দোষ হয় না—নীতি হিসাবে এটা মানব আর খালেক মেনে নিতে পারে নি। মহেশের বয়স, অভিজ্ঞতা স্নেহ আর সদিচ্ছাকে শুধু তারা স্বীকৃতি দিয়েছে।

মহেশ বলে, লেখার এটম বোমা বানাতে কে তোমাদের বারণ করেছে? ' বানাও, ছড়াও, চাহিদা বাড়াও। লোকে যদি বলে য়ে ওরকম লেখা না থাকলে আমরা কাগজ ছোঁব না, ওরকম না হলে বই কিনব না—ধনদাস জোড় হাতে লেখা ভিক্ষে চাইবে। তোমরা চাও, নীতিকথা শুনিয়ে ওকে গলিয়ে দেবে। পয়সা ছাড়া ওর কোন নীতি আছে? ওর রুচি নীতি আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে লাভটা কি? ওকে যারা পয়সা দেয়, তাদের রুচি নীতি আদর্শ বদলে দাও—পাঠকপাঠিকার দিকে তাকাও। পয়সা দিয়ে তারা যদি এমন গরম লেখা কিনতে চায়, যে কম্পোজ করতে সীসার হরফ গলে যাবে—

খালেক বলে, কিন্তু অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে লেখক নরম হয়ে যাবে না? সুবিধাবাদী হয়ে যাবে না?

মহেশ বলে, সেটা লেখক বুঝবে। অবস্থা তো লেখকের মনের ফাঁকা

সাধকে খাতির করবে না। অবস্থা ভাল নয়, অবস্থা একেবারে উল্টে পাল্টে না দিলে চলবে না—এসব হল আলাদা কথা। অন্য রকম অবস্থা হওয়া উচিত বলেই যে অবস্থা আছে, সেটা নেই বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন ?

মানব বলে, বাস্তবকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না জানি। অবস্থাটা কি, ঠিকভাবে না জেনে অবস্থা বদলাবার ব্যবস্থা করা যায় না,—তাও জানি। কিন্তু খারাপ জেনেও একটা অবস্থাকে স্বীকার করা কি উচিত ?

মহেশ একটু হেসে বলে, সোজা কথাটা তোমরা কিছুতেই ধরতে পারছ না। স্বীকার করা মানে তোমরা বুঝছ যা কিছু যেমন আছে মেনে নিয়ে স্রোতে ভেসে যাওয়া। চোখ কান বুজে নিরীহ গোবেচারীর মত মানিয়ে চলার কথা কি আমি বলছি ? যেমন ধরো, তোমার খুব সর্দি কাসি হয়েছে, একটু জ্বরও বোধ হয় এসেছে। তোমার যে অসুখ হয়েছে এইটুকু শুধু আমি তোমাকে মানতে বলছি। অসুখটা উড়িয়ে দিলে চলবে না— সর্দি জ্বরে টাইফয়েডের ইন্‌জেকসন নিলেও চলবে না। উমাকান্ত সব বোঝে, বুঝেও রেগে জ্বলে পুড়ে মরছে। তাতে লাভ কি ?

মানব এবার একটু হাসে।—না, এটা মানতে পারলাম না। গা পুড়বে তবু জ্বালাটা হাসিমুখে উড়িয়ে দেব ? জ্বলুনি ছাড়া অবস্থা পাল্টে দেবার রোখ চাপবে কোথা থেকে ?

এই আলোচনার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতই উমাকান্ত এসে দাঁড়ায়।

তার হাতে একতাড়া লেখা কাগজ।

পুতুল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরেছে, দু'দিন আগে রস সাহিত্যের পরের সংখ্যার জন্য উমাকান্ত লেখাও দিয়ে গিয়েছে। কে জানে আবার কি বিপদ ঘটল তার !

: ব্যাপার কি ? পুতুলদি কেমন আছে ?

: ভাল নয়। বড় বিপদে পড়েছি। সামলে উঠছিল, কিভাবে আবার বিগড়ে গেল ধরতে পারছি না।

তার মুখে নতুন বিপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে তিনজনের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।

হরফ সাজানো বন্ধ রেখে নিজের যায়গায় বসে কালাচাঁদও সব শোনে।

ভাবে, বিপদই বটে—টাকা না থাকার বিপদ। নইলে এ আর কি এমন বিপদ দাঁড়াত!

টাকার সন্ধানেই উমাকান্ত বেরিয়েছে, সমাপ্তপ্রায় উপন্যাসটার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে।

ধনদাস যদি উপন্যাসটা নিয়ে কিছু টাকা দেয়!

মহেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইসারা করে, উমাকান্ত বিহ্বলের মত চেয়ে থাকে।

ইসারায় কাছে ডেকে মহেশ তার কাণে কাণে বলে, বিপদের কথাটা সব ফাঁস করবেন না, এখুনি টাকা না হলেই নয় এটা যেন টের না পায়। যদি অবশ্য আপনার না কথাগুলি শুনে থাকে—বোধ হয় শুনেছে। মোট কথা, নরম হবেন না। এখানে না হলে অন্য যায়গায় চেষ্টা করবেন।

উমাকান্ত মুখ বাঁকায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মুখের ভাব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে করতে সে ধীরে ধীরে ধনদাসের কাঠের ঘেরা আপিসটুকুর ভিতরে যায়। সকলে নীরবে প্রতীক্ষা করে থাকে।

ধনদাস অমায়িকভাবে বলে, আসুন আসুন, বসুন! অনেকদিন বাদে এলেন মনে হচ্ছে। অবিশ্যি যদি এসে মহেশবাবুর সাথে কথা কয়ে চলে গিয়ে থাকেন—

উমাকান্ত স্বস্তি বোধ করে।

ধনদাস তা হ'লে তার বিপদের বিবরণ শোনে নি! গলা সে তেমন

চড়ায় নি, আরেকটু জোরে না বললে ধনদাস বোধ হয় বাইরের কথা শুনতে পায় না।

: একটা নতুন বই এনেছিলাম।

: উপন্যাস? বেশ, বেশ। শেষ করেছেন?

: সামান্য বাকী—ফর্মা দেড়েক।

ধনদাস নীরবে বারকয়েক মাথা দুলিয়ে বলে, যতটা লিখেছেন তাতে কত ফর্মা হবে?

: দশ ফর্মার মত হবে।

: বার ফর্মার মত দাঁড়াবে তাহলে? একেবারে শেষ করে আনলেই পারতেন! দেড় ফর্মা দু'ফর্মা লিখতে আপনার আর কতক্ষণ? পাকা হাত, কলম ধরে বসলেই হল।

ভিতরের উদ্বেগ প্রাণপণে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে করতে কোনরকমে উমাকান্ত মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটিয়ে বলে, তা কি ঠিক আছে কিছু! লেখা এসে গেলে দু'তিন দিনে হয়ে যায়, না হলে পনের দিনও লেগে যেতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে ধীর ভাবে বলে, আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।

ধনদাস হেসে বলে, টাকার দরকার কার নেই বলুন? কিন্তু আপনার পাবলিশারের কাছে না গিয়ে আমার কাছে এলেন?

এর জবাবে আসল কথা খুলে বলা যায় না। তার বই-এর আসল প্রকাশক দু'জন, দু'জনের সঙ্গেই অত্যন্ত কড়াকড়ি বন্দোবস্ত এবং নিজেই সেটা সে গড়ে তুলেছে। লিখিত চুক্তির এতটুকু এদিক ওদিক হলে, হিসাব বা পাওনা টাকা দিতে একদিন দেরী হলে, ঝগড়া আর রাগারাগি করে দু'জনের সঙ্গেই গড়ে তুলেছে একেবারে চাঁচাছোলা শুধু ব্যবসাগত সম্পর্ক।

এ তো জানা কথাই যে, সুবিধা নিলে প্রকাশক অন্য ভাবে সেটা

আদায় করে নেবেই। লাভের ন্যায্য বখরা আদায় করার জোর তার থাকবে না।

প্রকাশক দু'জনকে মুখের ওপর কতবার যে একথা শুনিয়ে অন্য সকলের চেয়ে লাভের ভাগ বেশী আদায় করেছে।

আজ অসমাপ্ত বইটা নিয়ে গিয়ে ওদের কাছে টাকা দাবী করার উপায় তার নেই।

মান অপমানের কথা তুলে আজ গিয়ে হাত পাতলে হয় তো টাকা দেবে না, হয় তো অনেক টালবাহনা করে বিশ পঁচিশটা টাকা দেবে।

উমাকান্ত বলে, পাবলিশারের সঙ্গে একটু চটাচটি চলছে। তা ছাড়া, আপনি একটা বই-এর কথা বলেছিলেন, তাই ভাবলাম—

এবার মুখ একটু গম্ভীর করে ধনদাস বলে, জানেন তো আমি ঠিক পাবলিশার নই, সুযোগ সুবিধামত দু'একখানা বই ছাপিয়ে বার করি। প্রেসের কি আর সেদিন আছে মশাই—বাজার বড় খারাপ। কাজ গেছে কমে—কাজ করিয়ে লোকে টাকা দিতে চায় না। কাজ কম থাকলে দু'একজন কম্পোজিটর বসে থাকবে—একটা বই ধরিয়ে দিলাম।

ধনদাস মাথা নাড়ে। বলে, বই বেচে কিছু হয় না—লোক বসে থাকবে, ওই লোকসানটা ঠেকানো। তা চুক্তিটুক্তি কি রকম হবে?

: আপনি একটা অফার দিন?

: কপিরাইট দেবেন তো?

উমাকান্ত চমকে ওঠে।

ইতিমধ্যে কোন ফাঁকে ড্রয়ার খুলে এক তাড়া দশ টাকার নোট ধনদাস টেবিলের উপরে রেখেছিল সে টের পায় নি। এবার নজর পড়ায় টাকার তাড়াটার দিকে চেয়ে সে ব্যাকুল ভাবে বলে, না-না, কপিরাইট দিতে পারব না!

: এই তো মুস্কিল করলেন। এত খরচ করে একটা বই ছেপে বার

করব—হয় তো কাগজের খরচটাই উঠবে না। কপিরাইট পেলে তবু একটা স্বান্তনা থাকে, লোকসান যাক, বইটা নিজের রইল। আশা থাকে, দু'একখানা করে বেচে বেচে হয় তো পাঁচ দশ বছরে খরচটা উঠে আসতে পারে। পাঁচ দশ বছর পরে আপনার আরও নাম হলে বইটা কাটবে, দু'পয়সা লাভও হবে। কপিরাইট ছাড়া বই ছাপা—

মুখে একটা আপশোষের আওয়াজ করে ধনদাস।

তার সামনে টেবিলে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—ওদিকে ধনদাসের সামনে এক তাড়া নোট! ওই নোট, কয়েকটা পেলে পুতুলকে বাঁচানো যাবে। সাদা কাগজের বুকে রাত জেগে দেহ ক্ষয় করে আঁকা হরফের কলঙ্কগুলি থেকে চোখ তুলে ধনদাসের মুখের দিকে চেয়ে মরিয়ার মত উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে, কপিরাইট দিলে কত দেবেন?

ধনদাস এক মুহূর্ত ভেবে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, না, আপনি আমার কাগজের বাঁধা লেখক, আপনাকে ঠকাব না। ছোট বইয়ে আমি পঞ্চাশ দিই, বড় বইয়ে পঁচাত্তর থেকে একশো। আজ পর্য্যন্ত কাউকে এর চেয়ে বেশী দিই নি, কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনার এই বইটার জন্য দেড়শো দেব।

দেড়শো টাকায় একটা আড়াই টাকা তিন টাকা দামের বইএর কপিরাইট!

মাথা ঘুরে যায় উমাকান্তের।

: এডিসন রাইট নিলে কত দেবেন?

: বললাম তো আপনাকে, এডিসন রাইট নিয়ে এই বাজারে বই ছেপে কি করব?

উমাকান্ত একটু ভাবে, মিনিট দেড়েক। এত খেটে লেখা বইটা দেড়শ' টাকায় ছেড়ে দিলে হয় তো এ যাত্রা বাঁচানো যাবে পুতুলকে কিন্তু ভবিষ্যতে সে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কী অবলম্বন করে বাঁচবে?

দু'এক ঘণ্টায় কি এসে যাবে ?

পুতুলের রক্তপাত হয় তো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। পাড়ার দু'জন পাঁচ আর সাত সন্তানের জননী এবং চার বছরের এক ছেলের একজন যুবতী মা, যেচে এসে ভার নিয়েছে, ওরা কি আর দু'চার ঘণ্টা সামলে রাখতে পারবে না পুতুলের প্রাণটা ?

দেড়শো টাকায় বইটার কপিরাইট বেচে দেওয়ার চেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে, পুতুলের সঙ্গে তার নিজেরও মরে যাওয়া অনেক ভাল।

উমাকান্ত নীরবে পাণ্ডুলিপির তাড়া হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে ধনদাস এক্বার কাসে।

: কাগজের পুরানো লেখক, বন্ধু মানুষ—যাক গে, পুরো দুশোই নিয়ে যান। বাকীটা কিন্তু তাড়াতাড়ি লিখে দেবেন।

উমাকান্ত পাকা চালবাজ ছ্যাঁচরা ব্যবসায়ীর মত হেসে বলে, একটু ভেবে চিন্তে দেখি ? চায়ের দোকানে বসে দু'এক কাপ চা খেয়ে মনটা স্থির করে আসি ?

: এখানেই বসুন না, চা আনিয়ে দিচ্ছি—যত কাপ ইচ্ছা খান, যত ইচ্ছা ভাবুন !

: নাঃ, নিজে নিজে একটু ভেবেই আসি আমি। আপনি আছেন তো ?

তার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হাই তুলে উদাস ভাবে ধনদাস বলে, তিনটে পর্য্যন্ত আছি। তিনটের পর একবার বাইরে যেতে হবে, কখন ফিরব ঠিক নেই।

: আমি তিনটের মধ্যেই ফিরব।

মহেশের টেবিলের কথাবার্তা যেমন নীচু চাপা গলায় কানে কানে না চললেই, কাঠের পার্টিশনের ওপাশে ধনদাসের কানে পৌঁছয়, তেমনি কাঠের পার্টিশানের ভিতরে ধনদাসের সঙ্গে অন্যলোকের কথাও স্বাভাবিক

গলার আওয়াজে হলে, মহেশের খোলা টেবিল ঘিরে বসা মানুষগুলোর কাণে পৌছয়।

একটু তফাতে সাজানো হরফের বাক্সের সামনে টুলে বসা কালাচাঁদের কাণেও খানিক খানিক যায়।

পাণ্ডুলিপি হাতে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনায়, বিকৃত মুখ নিয়ে উমাকান্ত টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াইতেই মানব নীচু গলায় বলে, আমরা সব শুনেছি—কপিরাইট দেবেন না।

উমাকান্তের নীচু গলাতে চরম হতাপার স্বর ফোটে।

: তোমার পুতলদি' মরবে? কপিরাইটের মায়ায় ছেলেমেয়ের মা'টাকে মরতে দেব? দু'এক যায়গায় চেষ্টা করে দেখি, নইলে ফিরে এসে বেচে দিতেই হবে কপি রাইট।

মানব বলে, তিনটের আগে কিন্তু আসবেন না। আমরাও বেরোচ্ছি চেষ্টা করে দেখতে।

তার সঙ্গেই মানব আর খালেক বাইরে যায়। রাস্তায় নেমে খালেক বলে, ব্যাকুল হবেন না। তিনটে কেন, পাঁচটা পর্য্যন্ত আপনার জন্য ধন্না দিয়ে বসে থাকবে। কোথাও সুবিধা না হলে ঘড়ির কাঁটা ধরে তিনটের সময় আসবেন। তার আগেই আমরা ফিরে আসব।

উমাকান্ত বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়ে ভাবে, কী ইয়ার্কি এরা জুড়েছে তার সঙ্গে? তার এমন বিপদের সময়? কথা না কয়ে বড় রাস্তায় পৌছে সে চলতি ট্রামে উঠে পড়ে।

খালেক ওঠে পরের বাসে। মানব একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নেয়, কিভাবে টাকার চেষ্টা করবে।

চেষ্টা করা যায় দু'ভাবে। আত্মীয়বন্ধুর কাছে গিয়ে। তার প্রকাশকটির কাছে গিয়ে।

প্রকাশকের কাছে গিয়ে বোধ হয় লাভ নেই।

তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে বৈকি!

প্রকাশক তার একজন—ছোটখাট দোকান, পুঁজি কম। তবু সাহস করে নতুন লেখক তার দু'খানা বই ছেপেছে এক বছরের মধ্যে—ধীরে সুস্থে তৃতীয় বইখানা ছাপছে।

বয়সও বেশী নয় তার প্রকাশক হেমাঙ্গের।

প্রুফ দেখছিল, মুখ তুলে বলে, আসুন, বসুন! আজ তো কথা ছিল না আসার!

: একটা দরকারে এসেছি। খুব সিরিয়াস ব্যাপার—মন দিয়ে শুনুন।

উমাকান্তের বিপদের কথা সংক্ষেপে জানিয়ে মানব বলে, উপন্যাসটা নিয়ে নিন না? এ সুযোগ ছাড়বেন না। রয়ালটির ব্যাপারে উনি খুব কড়া—বিপদটা সামলে নিন, ওসব আমি ঠিক করে দেব। রেট কম হবে, অল্প অল্প করে সুবিধামত পাওনাটা দিলেই চলবে।

হেমাঙ্গ চড়া পাওয়ারের চশমা খুলে চোখ মুছতে মুছতে বলে, সে তো বুঝলাম—এখুনি কত টাকা চাই?

: গোটা পঞ্চাশেক দিয়ে দিন। কাল পরশু শ'খানেক যোগাড় করে দিলেই হবে। পারলে দ্বিধা করবেন না, একজন লেখক এরকম বিপাকে পড়েছেন—

: ওই তো বিপদ। নতুন লেখক আপনাদের না ধরে বড়দের নিয়ে কারবার করলে, ড্রয়ার খুলে সব টাকাই ঝপ করে ফেলে দিতে পারতাম। পনের বিশ টাকা আছে কিনা সন্দেহ।

: তাই দিন—আমার হিসাবে।

হেমাঙ্গের কাছ থেকে পনেরটা টাকা যোগাড় করে সহরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর কাছে ছুটোছুটি করতে

করতে ঘড়ির কাঁটা ছ'টো বাজার দিকে এগিয়ে যায়—যোগাড় হয় আর দশটা টাকা!

এরা সবাই সাধারণ অবস্থার আত্মীয়বন্ধু—তার অবস্থাও ওদের ভাল করেই জানা আছে। তাকে টাকা ধার দেওয়া মানেই টাকা জলে ফেলে দেওয়া।

অপমানে কাণ ঝাঁ ঝাঁ করেছে মানবের—তবু দু'জন যে মুখ ভার করে পাঁচটা করে টাকা দিয়েছে সে টাকা হাত পেতে নিয়েছে।

আরও টাকা চাই। পুতুলদিকে 'বাঁচাতে হবেই। জীবনে কোনদিন, যে দু'জন বড়লোক আপনজনের বাড়ীর চৌকাট পার হবে না স্থির করেছিল, তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই। মানব ভাবে, উপায় যখন নেই, মাথা হেঁট করে বুক ঠুকে কাকার দুয়ারেই গিয়ে দাঁড়ানো যাক।

কাকার বাড়ী গিয়ে মানব শোনে তারা সপরিবারে কাদের বাড়ী বেড়াতে গেছে, ফিরতে সন্ধ্যা উৎরে যাবে। বাড়ী খালি নয় তাই বলে। ঝি চাকর রাঁধুনীরা আছে—আর আছে আশ্রিতা মনার মা এবং বিধবা সরমা।

রান্নাবান্না ভাঁড়ারের ভারটা মনার মার উপর। মনার মা আদর করে বসতে বলে।

একটি সন্দেশ দিয়ে খাতির জানিয়ে বলে, বাড়ীতে এসে না খেয়ে ফিরে গেছেন শুনলে বড় মা রাগ করবেন।

মানব ভাবে, এমনিই হয় বটে! এমন আবহাওয়াই এই বাড়ীর যে আশ্রিত মানুষেরও মন যায় কুঁকড়ে, তারের আলমারির তাক ভরা খাবার থাকলেও তার কাকার জিনিষ, প্রাণ ধরে তাকে একটির বেশী দিতে পারে না!

মনার মার সহজ হিসাবটা সে বোঝে। একটি সন্দেশ খাইয়ে তাকে বিদেয় করলে কিছু খাবার নিজের ছেলেটাকে খাওয়াতে পারবে। খাবার কাকীমার গোনা গাঁথা, কাকীমা বাড়ী ফিরলে মনার মা বলতে পারবে, মানব এসেছিল বলে খাবার খরচ হয়েছে।

সে হেসে বলে, কি খাব? কিছুই তো খেতে দিলে না। একটা সন্দেশ লোকে খায় নাকি?

মনার মাকে কথা বলার সময় না দিয়ে সরমা তাড়াতাড়ি প্লেটে সাজিয়ে এনে দেয় কয়েকরকম খাবার।

মনার মাকে ধমক দিয়ে বলে, তোমার বাছা কাণ্ডজ্ঞান নেই—বুঝেও কিছু বুঝবে না। বাবুর ভাইপো এয়েছেন—একটা সন্দেশ দিয়ে আপ্যায়িত করছো!

: তুই মাগী বড় বাড়াবাড়ি জুড়েছিস্। খেদাতে হবে।

: তুই খেদাবি মোকে? ধন্যি ধন্যি করব সেইদিন তোকে!

নিজের গালে সশব্দে চড় মেরে সরমা বিকৃত অস্বাভাবিক আওয়াজে হেসে ওঠে!

সম্পর্কের হিসাব ধরলে এরা তারও ঝি-রাঁধুনী। এক ধমকে এদের ঠাণ্ডা করে দেবার অধিকার তার আছে।

কিন্তু কিসের জোরে সে খাটাবে তার অধিকার?

তাকে আদর আপ্যায়ন করার অধিকার এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যে আপনজনেরা বেড়াতে গেছে, তাদের কাছে তার যে কতখানি কদর কিছুই তো এদের অজানা নয়!

ধমক কি দেওয়া যায় এদের? মানব শুধু বলে, না গো না, আমি কিছু খাব না।

সরমা থমকে যায়। মনার মা ভড়কে যায়।

: খাবেন না? কিছু খাবেন না? বড় মা শুনলে যে—

মানব মিথ্যা কথা বলে, পেটে যায়গা নেই। এইমাত্র হোটেলে ভোজ খেয়ে এলাম।

সরমা আর মনার মা, দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বাঁচা গেল। তাদের কেউ দোষী করতে পারবে না।

বাকী থাকে দিদি।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভগ্নীপতি ইন্দ্রজিৎ কোনদিন তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না!

মাধবীর বিয়ের সময় সে ছিল কলেজের নীচের ক্লাশের ছাত্র, তখন থেকেই তার উপর ইন্দ্রজিতের অন্ধ বিদ্বেষ।

মাঝে মাঝে দু'চার দিন দিদির বাড়ী বেড়াতে যেত।

ইন্দ্রজিৎ চশমার ফাঁকে আক্রোশভরা চোখে তার দিকে তাকাত, আর তার দিকে তাকিয়েই তাকাত মাধবীর দিকে। সে দৃষ্টির মানে খুব সোজা—কেন যে তোমার বখাটে বেয়াদপ ভাইটা না ডাকলেও আমার বাড়ীতে আমাকে জ্বালাতে আসে!

অত্যন্ত নীতিবাগীশ, নীরস এবং কর্তৃত্বপ্রিয় মানুষ। সে চায় যে সকলে তাকে মেনে চলুক, ভয় করুক—একটু ভক্তিও করুক। শালা-ভগ্নীপতির সম্পর্ক হলেও মানব যে তার সঙ্গে ইয়ার্কি দেবে, তার হুকুম গ্রাহ্য করবে না—এটা সে একেবারেই বরদাস্ত করতে পারত না।

আজকাল তো কথাই নেই—মানব এখন তার কাছে আত্মীয়-বিতাড়িত লোফার মাত্র!

ইন্দ্রজিৎ বেতনে ও অন্যান্য প্রকাশ্য দুর্নীতিহীন পে-বিল সই করে মাইনে আদায় করে হাজার দুই টাকা।

এক পাই ঘুষ নেয় না।

অনেক রকম সুযোগ সুবিধা থাকলেও জীবনে কখনো আলগা পয়সা রোজগারের কথা ভাবতেও পারে নি।

ঘুষ নেওয়ার জন্য একবার দু'জন অধীনস্থ অফিসারের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল। শাস্তিটা অবশ্য পরে দাঁড়িয়েছিল সামান্য ব্যাপারে, মৌখিক একটা বোঝাপড়ায় যে, তিন বছর ওদের-প্রোমোশন বন্ধ থাকবে।

বাধ্য হয়ে এই নাম মাত্র শাস্তি দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হওয়ায় রাগের যে জ্বালা হয়েছিল, ইন্দ্রজিতের সারা জীবনে সেটা বোধ হয় জুড়োবে না!

ইন্দ্রজিৎ দাবী করেছিল যে ওদের জেলে দেওয়া হোক।

ওরা গিয়ে ধন্না দিয়েছিল ইন্দ্রজিতের ভারিক্কি রীতিনীতি ও সম্ভ্রান্ত জীবন যাপনের কলকাঠি ছিল যে কর্তাব্যাক্তিটি, তার কাছে।

কর্তাব্যাক্তিটি যেচে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল ইন্দ্রজিতের বাড়ীতে—এক কাপ চা খেতে। ইন্দ্রজিৎও বুঝেছিল ব্যাপারটা সহজ নয়। সেও বাড়ীতে মহাসমারোহে আয়োজন করেছিল কর্তাব্যাক্তিটির সম্বর্দ্ধনার।

মানবকে হুকুম দিয়েছিল, দশ টাকার ফুল কিনে আনো দিকি হক মার্কেট থেকে।

: আমি পারব না: ভদ্রলোক আপনার চাকরীর হর্তাকর্তা হতে পারেন, আমার কে? মানুষ পূজার ফুল আনা আমার দ্বারা হবে না!

ধৈর্য্য হারিয়ে গর্জন করে উঠেছিল ইন্দ্রজিৎ, ভুলে গিয়েছিল যে মানব দু'দিনের জন্য বোনের বাড়ী বেড়াতে এসেছে—তাদের আপ্যায়ণটাই তার প্রাপ্য—ধমক নয়!

মানবও গর্জে উঠেছিল, কী বল্লেন? এখুনি আমি চলে যাচ্ছি আপনার বাড়ী থেকে।

আত্মীয়স্বজনের কাছে মানবের কদর তখন ফুরিয়ে যায় নি। আত্মীয়-

বাহিনীর সঙ্গে তখনও সে এক সামাজিক সূত্রে গাঁথা। ইন্দ্রজিৎ, শালাকে তাড়িয়ে দিয়েছে! কী সর্ব্বনাশ, সবাই বলবে কি?

মাধবী হাল ধরে স্বামীকে কড়া সুরে ধমক দিয়ে বলেছিল, কি পাগলামি করছ ছেলেমানুষের সঙ্গে? ফুল আনাবার আর লোক নেই?

অনেক বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিল মানবের রাগ।

ইন্দ্রজিৎ পছন্দ না করুক, ভাই বাড়ীতে এলে আগে মাধবীর বড় আনন্দ হ'ত। মানব, কাকার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর, সে বাড়ীতে গেলে মাধবীও খুসী হতে সাহস পায় না।

শুধু তাদের মানে না তা নয়, কোথায় থাকে কি করে, কিছুই জানায় না দু'চার মাস।

হঠাৎ একদিন এসে বলে, আমায় কিছু টাকা দাও।

এমনভাবে বলে, যেন মহাজন খাতকের কাছে বাকী সুদ দাবী করছে। বড়লোকের বৌ, বড় বোন, তার কাছে দরকারের সময় টাকা চাইবার অধিকার তার আছে—এ অধিকার না মানতে চাও, দিদিত্বের অধিকারে ইস্তফা দাও, চুকিয়ে দাও সম্পর্ক!

এই নিয়েই কয়েকবার বেশ খানিকটা ঠোকাঠুকি হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ আর মাধবীর মধ্যে।

শেষবার লেগেছিল তারই সামনে।

ইন্দ্রজিৎ মন্তব্য করেছিল, তোমার লোফার ভাইকে দেওয়ার জন্য আমি এত খেটে টাকা রোজগার করি না!

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল মাধবীর।

রেগে বলেছিল, তোমার কত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কতভাবে সাহায্য চাইতে আসে হিসেব রাখো? কতজন কতভাবে কত সাহায্য আদায় করে নিয়ে গেছে হিসেব রাখো? আমার ভাইটা বিগড়ে গেছে সত্যি, তবু আমার ভাই তো! বিগড়ে যাক আর যাই হোক, ন'মাসে ছ'মাসে বিশ

পঁচিশটা টাকা চায়। তুমি মাইনে পাও দু'হাজার টাকা। আমার ভাইকে আমি পঁচিশটা টাকা দেব—তোমার তাতে আপত্তি কেন?

: বললাম তো আপত্তি কেন! লোফারদের দেওয়ার জন্য আমি খেটে পয়সা রোজগার করি না।

মানবকে বিশেষ বিচলিত মনে হয় নি।

সে একটু ব্যঙ্গের সুরেই বলেছিল, একটা ভুল করছেন আপনি, আপনাদের মত নীতিবাগীশ লোকেরা এরকম সোজা কথা গুলিয়ে ফেলেন। আমি আপনার কাছে আসি না, আসি আমার দিদির কাছে। আপনার টাকায় দিদির অধিকার আছে—দিদি আমায় নিজের টাকা দেয়—আপনার টাকা দেয় না।

একটু হেসে আবার বলেছিল, আপনি ছোটলোক। স্ত্রীর কাছে তার ভাই এলে তাকে অপমান করা, যে স্ত্রীকেই অপমান করা—এটুকু জ্ঞানও আপনার নেই। আপনার অপমান আমি গায়ে মাখব না।

ইন্দ্রজিৎ কট্‌মট্‌ করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

মানব হাসিমুখেই মাধবীকে বলেছিল, তুই কি বলিস্‌ দিদি? আর আসব না তো?

মাধবী চুপ করে ছিল।

তারপর আর আসে নি মানব। মাধবীর কাছে ছোট ভাই-এর অধিকারের দাবী চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছে। দেখাকরার জন্য মাধবী দু'বার চিঠি লিখেছে, মানব জবাবও দেয় নি।

কিন্তু এসব কথা ভাবলে কি চলবে আজ? না, নিজের মান অপমানের প্রশ্ন আজ বড় করা যাবে না।

মানব ভাগ্য মানে না। কিন্তু ইন্দ্রজিতের বাড়ীর সামনে খান পনের মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মনে হয়, যারা ভাগ্য মানে

আর অনিয়ম মেনে চলে, তারা যেন এতগুলি মোটরের নীরব হর্ণ আর নীরব ইঞ্জিনের ভাষায় স্পষ্ট ঘোষণা করছে—দিদির বাড়ী হোক, গেট পার হোয়ো না! দিদিকে না জানিয়ে আজকের দিনে এ সময় তোমার আসা উচিত হয় নি। দিদি রেগে যাবে।

খান পনের নতুন পুরানো প্রাইভেটগাড়ী তো শুধু নয়, ট্যাক্সিও কত অতিথি পৌছে দিয়েছে ঠিক নেই।

ট্রামে বাসে চেপে বুদ্ধির কারবারী নরনারীও নিশ্চয় এসেছে কয়েকজন।

মোটর চেপে এসেছে যে জ্ঞানী·বিজ্ঞানী তাদের সঙ্গে, সমান ভাবের চেয়ে বরং বেশী তেজের সঙ্গে সূক্ষ্ম বিষয়ে তর্ক করার অধিকার আছে ট্রাম বাসে চেপে আসা জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের।

তর্কের স্থূল বিষয়ে তাদের হার মেনে নেওয়াটাই নিয়ম।

সূক্ষ্ম বিষয়ে সতেজে তর্ক করে স্থূল বিষয়ে হার মেনে নেওয়াটা তারাও যেন সুখের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, মেনে নেয়।

এ রকম কত আসরে মানব অংশ নিয়েছে, মজা দেখেছে, মজা করেছে!

দিদি রেগে টং হয়ে যেত তার ব্যবহারে।

এই বেশে এই চেহারা নিয়ে আজ এসময় সমাগত মার্জিত ভদ্র অতিথিদের মধ্যে তাকে হাজির হতে দেখে মাধবীর মূর্চ্ছা যাওয়া আশ্চর্য্য নয়!

কিন্তু এসব চিন্তার অবসর কই? প্রতিটি মূহূর্ত পুতুলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মরণের দিকে—শুধু টাকা থাকলেই যে-মরণকে অনায়াসে ঠেকানো যায়!

আর দ্বিধা না করে মানব ভিতরে যায়। যেখানে চোখ ঝলসানো বেশ আর পরিবেশের মধ্যে নারী ও পুরুষমানুষগুলিকে চেনাই যাচ্ছে না মানুষ বলে!

ইন্দ্রজিৎ কথা বলছিল অদ্ভুত রকমের, ভেলভেটের মত দেখতে এবং নিমন্ত্রিত প্রায় সকলেরই অজানা বস্তু দিয়ে তৈরী, স্যুট পরা বিদেশী মানুষটার সঙ্গে। তার দিকে একনজর তাকিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্রজিৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

একটু যে চোখের ইসারা করবে তাকে সে সুযোগও মাধবী পায় না।

এই বেশে এই ভাবে তার ভাই যে আজ এখানে হাজির হয়েছে, এ দুর্ঘটনা সে সামলে নেবে,—ইন্দ্রজিতের ভাবনা নেই—চোখের ইসারায় এটুকু জানিয়ে দেবার সুযোগও ইন্দ্রজিৎ তাকে দেয় না।

মানবকে এভাবে এসে দাঁড়াতে দেখে সে যে কি রকম আঁতকে উঠেছিল তাও ইন্দ্রজিতের চোখে পড়ে নি।

তিন চারদিন চোটপাট চলবেই। মারধোর করবে না, কিন্তু কথা আর ব্যবহারের ধারালো অস্ত্রে তার হৃদয়-মন কুচি কুচি করে কাটবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য এ চিন্তাও মনে উঁকি দিয়ে যায় মাধবীর যে চাকর দরোয়ান ডেকে চোর বলে ধরিয়ে দেবে মানবকে!

মারতে মারতে আধমরা করে ওরা যাতে তাকে থানায় গিয়ে জমা দিয়ে আসতে পারে সে ব্যবস্থা করবে!

ইন্দ্রজিৎ খুসী হবে। বেশী রকম খুসী হবে। আজ রাত্রেই হয় তো তাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে বার হবে রোমাঞ্চকর আনন্দের কোন কেন্দ্রে, হয় তো কিনে দেবে নতুন রকম শাড়ীটা কিম্বা গয়নাটা!

কিন্তু পারা যায় কি? নিজের ভাইকে স্বামীর দরোয়ান চাকর দিয়ে মেরে আধমরা করিয়ে দিয়ে থানায় পাঠাতে? ইন্দ্রজিতের আগামী কয়েকদিনের মাজিত কিন্তু মারাত্মক আক্রমণ ঠেকাবার জন্য, তাকে খুসী করার জন্য?

মাধবী তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলে,

তুমি এমন দিনে এলে? আর তুমি দিন পেলে না আসবার? তুমি জানো না ওঁর আজ জন্মদিন?

মানব হেসে বলে, কি করে জানব? নেমন্তন্ন করেছ? শ'খানেক লোক এসেছে, এরা সবাইতো বন্ধুবান্ধব আত্মীয় নয়? বাইরের কত লোক নেমন্তন্ন পেল—আমি ভাই হয়ে বঞ্চিত হলাম। আমি সব জানি। গরীবের মেয়ে বড় লোকের টাকার স্বাদ পেয়েছ—জুতো মারা পর্য্যন্ত তুমি সয়ে যাচ্ছ। জুতো সইতে হয় বলেই তো ভাইকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি কথা কইতে হয়।

: কি করব বল? ও যে বোঝে না।

: বোঝালেই বোঝে।

: বোঝে না তুই নিজেই তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিস্ ওনাকে। একটু যদি ভাল কাপড় জামা পরে আসতিস্, দাড়িটা কামিয়ে আসতিস্, কাছে গিয়ে নম্র ভাবে মিষ্টি করে কথা বলতে পারতিস্—

হঠাৎ যেন অন্ধকারে আশার আলো দেখতে পেয়ে আকস্মিক উত্তেজনায় মাধবীর হাত পা কাঁপতে থাকে।

: তাই কর না তুই? চ' তোকে খুব দামী স্যুট পরিয়ে দিচ্ছি। স্যুটটা পরে চুলটা একটু আঁচড়ে এসে সকলের সঙ্গে মেশ না তুই? আগে শুধু ওনার কাছে গিয়ে খুব নম্রভাবে মিষ্টি করে বলবি—

পুতুলদি ওদিকে পলে পলে মরছে। নিজের দিদি এদিকে জুড়েছে বায়না। মানব ভূমিকা করে না।

সোজাসুজি বলে, আমায় কিছু টাকা দে দিদি।

টাকা? ভাইকে টাকা দিয়েছে জানলেই তো ইন্দ্রজিৎ আরও রেগে আগুন হয়ে যাবে। তার পাঁচশো টাকার শাড়ীতে, দেড় হাজার টাকার গয়নাতে ইন্দ্রজিতের শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে দেরী করার আপত্তি—ভাইকে বিশ পঁচিশটা টাকা দিলেই ইন্দ্রজিৎ ক্ষেপে যায়।

মানব আবার বলে, আমায় শ'খানেক টাকা দিতেই হবে।

মাধবী মিষ্টি স্বরে বলে, আমার হাতে পাঁচ দশ টাকার বেশী থাকে না জানিস্ তো? কি জন্য চাইছি জানালে উনি অবশ্য টাকা দেন।

: কিছু একটা বানিয়ে বলে চেয়ে আনো।

: বিশ্বাস করবে? অত হাবা নাকি! তুই এলি ওমনি আমার অন্য ব্যাপারে টাকার দরকার পড়ল? চেয়ে রেখে দেব—ক'দিন বাদে এসে নিয়ে যাস্।

: আমার এখুনি দরকার। যা আছে তাই দিয়ে দাও। আমার নিজের জন্য নয়। ওই যে লেখক আছেন উমাকান্তবাবু?—ওঁর স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মরে যাচ্ছে!

: মরে যাচ্ছে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাধবী পনেরটা টাকা এনে দেয়। এক গাছি সোনার চুড়ি তার হাতে দিয়ে বলে, টাকা আর নেই—এটা বেচে দিবি যা।

প্রায় চারটের সময় উমাকান্ত প্রেসে ফিরতেই মহেশ বলে, দেরী করলেন কেন এত? মানব খালেকেরা কিছু টাকা যোগাড় করে এনে আপনার জন্য তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করল—তারপর আপনার বাড়ীর দিকে ছুটে গেছে।

উমাকান্তের মুখে কালি পড়ে গেছে, চোখ রাঙা।

সূর্য্যের কিরণ রাত্রিকে নাশ করেছিল ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

এখনো সূর্য্য অস্ত যায় নি।

ক'দিন আগের কথা! তার সন্তানকে জন্ম দিতে পুতুল যেদিন সকালে রক্তপাত সুরু করেছিল! পুতুলের সঙ্গে ঝগড়া করে যেদিন সে গিয়েছিল বাজার আর রেশন আনতে, বাড়ী ফিরে নিজের চেষ্টাতেই

বন্ধ করেছিল পুতুলের রক্তপাত, আর মনে মনে হাজার বার আপশোষ করেছিল যে, রেশন না আনলে অন্ততঃ ডাক্তার ডাকার পয়সাটা হাতে থাকত !

হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে পুতুল আবার বেসামাল হবার পর ক'ঘণ্টাই বা কেটেছে ? ক'ঘণ্টার মধ্যে এরকম হয়ে যেতে পারে একটা সুস্থ লোকের চেহারা !

রক্তবর্ণ চোখ মেলে উমাকান্ত মহেশের দিকে তাকায়।

ক্ষয়ে যাওয়া ফেলনা হরফের সীসা গলিয়ে তৈরী করা কাগজ-চাপাটা তুলে, মহেশের মাথাটা ফাটিয়ে দেখার ঝোঁক সামলাতে এমন মনের জোর খাটাতে হয় তার !

কথা না বলে সে ধনদাসের কাঠের কুঠরিতে যায়।

পাণ্ডুলিপিটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, ছ'শো টাকাই দিন !

ধনদাস গম্ভীর মুখে বলে, দেখুন, ভেবেচিন্তে দেখলাম, ছ'শো পারব না। দেড়শো নিয়ে যদি পারেন তো দিয়ে যান—নইলে কাজ নেই।

: তাই দিন।

তৈরী ছিল টাইপ করা ষ্ট্যাম্প-মারা চুক্তি পত্র।

ধনদাস জানত সে ফিরে আসবে !

পনেরটি দশ টাকার নোট গুণে দেয় ধনদাস।

নোটগুলি হাতে পেয়েই উমাকান্ত পকেটে পুরতে যাচ্ছে দেখে বলে, না না, গুণে নিন—টাকা পয়সার ব্যাপারে ছেলেমানুষী করবেন না !

দেড়শো টাকা পকেটে নিয়ে ঘরে যখন সে ফেরে, শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশে আড়ালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাড়ীর সামনের সিঁড়িতে দেড় বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মানব, আর তিন বছরের ছেলেটাকে পাশে নিয়ে খালেক বসে ছিল।

ভেতরে একটা ঘরে আট বৎরের মেয়েটা যেন কান্নার সুরে সুরে গান গাইছে।

সবই বুঝতে পারে।

তবু উমাকান্ত যেন জীবন-মরণের ব্যাপারটাকেই ঋষির মত উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, মরে গেছে, না? ভালই হয়েছ—মরে বেঁচেছে।

মানবের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল কি ঝরে পড়ল, তার কোলে শোয়ানো পুতুলের গর্ভে জন্মানো তার বাচ্চাটার গায়ে?

খালেক কি চোখ মুছল ছেঁড়া সার্টটার হাতায়? পুতুলের মরণে ওদের চোখে জল এল, তার চোখটা শুধুই জ্বালা করছে কেন?

চোখ মুছে খালেক ক্ষোভের সুরে বলে, কিছুতে বাঁচাতে পারা গেল না।

মানব বলে, আপনার ভরসায় না থেকেই ডাক্তার আনলাম—ইস্! আর দুঘণ্টা আগে যদি ডাক্তার আনা যেত! ডাক্তারবাবু যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

মানব জোরে শ্বাস টানে। বলে, ফাঁসি হওয়া উচিত আমার। আমিই আপনাকে ধনদাসের টাকাটা নিতে বারণ করলাম। টাকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এলে—

উমাকান্ত হাঁফ টানার মত কয়েকবার নিশ্বাস নেয়, একটা অদ্ভুত বিকৃত আওয়াজে বলে, তোমার কোন দোষ নেই। আমি নিজেই তো অন্য চেষ্টা করতে বেরোলাম।

উমাকান্ত চোখ বোজে।

হঠাৎ সে যেন পাথরের মূর্তি হয়ে যায়, তারপর কাটা গাছের মত হঠাৎ আছড়ে পড়ে যায়।

সিঁড়ির কোণায় লেগে কেটে গিয়ে, মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বার হয়।

কে জানে ফুটো হয়েছে না একেবারে ফেটে গেছে তার মাথার খুলিটা !

মানব গলা চড়িয়ে ডাক দিতেই একজন পক্ককেশা বিধবা এবং একজন প্রৌঢ় বয়সী সধবা তাড়াতাড়ি বাইরে আসে।

মানব বলে, বাচ্চা তুটোকে সামলান। তোর রুমালটা দে তো খালেক !

রুমালটা ভাঁজ করে উমাকান্তের মাথার ক্ষতয় বসিয়ে, পরণের কাপড়ের আঁচল থেকে ব্যাণ্ডেজের মত ফালি ছিঁড়ে, মাথায় আনাড়ির মত পেঁচিয়ে মানব বলে, এম্বুলেন্স ডেকে এনে ব্যবস্থা করতে করতে পুতুলদির মত ফিনিস্ হয়ে যাবে। আয় খালেক, ধরাধরি করে ডাক্তার দাসের ডিস্পেন্সারীতে নিয়ে যাই।

ডাক্তার দাসের পক্ককেশী বিধবা মা চেঁচিয়ে বলে, তোদের ডাক্তার দাস যে সাতদিন জ্বরে শয্যাগত রে !

মানব বলে, কম্পাউণ্ডার সলিলবাবু আছেন তো ডিস্পেন্সারীতে ? শুধু রক্তপাত ঠেকানো—উনি সেটা পারবেন। তারপর দেখা যাবে।

এদিকে ধনদাস মহেশকে কামরায় ডেকে পাঠায়।

এটা সে করে কদাচিৎ।

কিছু জানতে চাইলে, কোন বিষয়ে নির্দ্দেশ অর্থাৎ হুকুম দিতে চাইলে, নিজেই সে মহেশের কাছে যায়।

উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রেসের এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখে বেরিয়ে যেন, খেয়ালের বশেই মহেশের টেবিলে একটা হাত রেখে দাঁড়ায়।

সে এসে দাড়ালে মহেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না, বলে প্রথম প্রথম তার রাগ হত ! কিন্তু ফাঁকা রাগের ধার সে ধারে না।

মানুষটা বিদ্বান বুদ্ধিমান সাহিত্য-রসিক, সাধারণ মাইনে করা কর্মচারীর মত মনিব সামনে এলে উঠে দাঁড়িয়ে সমমান দেখানো তার জানাও নেই, ধাতেও নেই। মনিব হলেও এটুকু বুঝতে হবে বৈকি, মানতে হবে বৈকি!

মহেশ এসে বসলে ধনদাস বলে, উমাবাবুর কাণে কাণে আপনি কি বলছিলেন?

মহেশ আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এই কুঠুরির আড়ালে থেকে ধনদাস শুধু তাদের কথাবর্তাই শোনে না, আড়াল থেকে লুকিয়ে কে কি করছে না করছে তা জানবার ব্যবস্থাও তার আছে!

মুখ কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায় মহেশের।

: আমার ব্যক্তিগত কথা। গোপনীয় কথা।

ধনদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, উমাবাবুর কাণে কাণে কি বলেছেন শুনবার জন্য আপনাকে ঠিক ডাকি নি। আপনার নিজের ব্যাপার কার কাণে কি বলবেন না বলবেন, তা দিয়ে আমার দরকার কি? আপনি গুণী লোক, আপনার কদর আমি জানি, কোন রকম অপমানজনক ব্যবহার কোনদিন পেয়েছেন আমার কাছে?

তারপর সে অমায়িকভাবে একটু হাসে।—তবে কি জানেন, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি—আমার এখানে কাজ করলে আমার স্বার্থটা সব সময় দেখতে হবে। আপনি তা জানেন, তবু একবার জানিয়ে রাখলাম। এ বিষয়ে আমি খুব কড়া।

এর নাম ফার্ষ্ট ওয়ার্ণিং!

মহেশ সায় দিয়ে বলে, সে তো বটেই, এ কোন দোষের কথা নয়। যার চাকরী করব তার স্বার্থহানি ঘটাব, এটা কে বরদাস্ত করবে?

: অনেকে এই সোজা কথাটা বোঝেন না কিনা, সেটাই বড় আপশোষের কথা হয়ে দাঁড়ায়। কালাচাঁদ কাজ ভালই করছে, না?

: ওর সাথে পাল্লা দেবার মত কেউ নেই আপনার প্রেসে। তবে মানুষটা একটু খেয়ালী ধরণের। পাঁচ দশ মিনিট, হয় তো চুপচাপ বসেই রইল কাজ বন্ধ করে। আমি কিছু বলি না—বলে লাভ হয় না। হাত যখন লাগায়—আধঘণ্টা সুবিধে দিয়েও—মধু ভূষণ এদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়।

৪

হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে মহেশের কোমরে চোট লেগেছে ভীষণ।

বাপরে! মারে!—বলে কাতরেও উঠেছে কয়েকবার।

তারপর খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে যেন জগতের সবরকম গভীরতম শোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অদ্ভুত রকম করুণ কণ্ঠে বলে: হায়রে কপাল! সরকারী রেশন, পয়সা দিয়ে চুরি করতে যাব—নিজের ভাঙ্গা ঘরের পচা চৌকাটে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙ্গলাম!

মলয়া ছুটে এলো। তাকে জড়িয়ে ধরে তুলবার চেষ্টাটা, তার ভাঙ্গা কোমরে ব্যথা না দিয়ে কিভাবে করবে ঠাহর পাচ্ছিল না—আছাড় খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তার ইয়ার্কি দেওয়ার কথা শুনে রেগে গিয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠে, রসিকতাটা নয় পাঁচ মিনিট পরেই সুরু করতে? নিজের ভাঙ্গা কোমর নিয়েও তুমি ইয়াকি দিয়ে রসিকতা করতে পার—ধন্য তুমি! সত্যি কি ভেঙ্গেছে কোমরটা? না, এমনি চোট লেগেছে?

: বেশ মানুষ তুমি—দিব্যি আছ! সরকারী রেশন আনতে যেতে, হোঁচট খেয়ে আছাড় খেলে কারো মাথা আস্ত থাকে? বিধবা যদি না হতে চাও তো চটপট ডাক্তার ডাকাও!

: কী আবোল তাবোল কথা বলছ ? কোমরে চোট লেগেছে বললে, আবার বলছ মাথায় চোট লেগেছে !

: কোমরে চোট লাগার ব্যাথাটা কোথায় ল্যাগে গো ? কোমরে ব্যাথা লাগে, চোট পায় মাথাটা। কোমরের ব্যথা বোধ আছে নাকি ? একটু রসিয়ে বললাম ভাঙ্গা কোমরের ব্যথায় মাথাটা ফেটে যাচ্ছে—মোটে বুঝলে না তুমি রসিকতাটা !

: তোমার রসিকতা বুঝবার সাধ্য আমার নেই। আছাড় খেয়ে কোমর ভাঙার ব্যথা নিয়ে যে রসিকতা চালাতে পারে—তার রসিকতা বুঝবার মত মাথা বিধাতা আমায় দেয় নি !—

বুড়ো বয়সে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট লাগলে দিন তিনেক আপিস কামাই করা যায়।

কাঁদাকাটা করে চিঠি পাঠিয়ে নিরুপায়তা জানিয়ে আরও দু'দিন ব্যথিত কোমরটাকে বিশ্রাম দেওয়া যায়।

তারপরেই আসে ভদ্রতাপূর্ণ চরম পত্র ! জমাদারের বদলে কালাচাঁদের হাতে পাঠানো হয়।

পত্রের মর্মকথা এই : মহেশের কোমর ভেঙ্গে গেছে জেনে, দু'এক মাসের মধ্যে মহেশ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না জেনে, ধনদাস বড়ই দুঃখিত হয়েছে। সে আশা করে শীঘ্রই মহেশ সেরে উঠবে। কিন্তু রস-সাহিত্য কাগজটা তো বার করতে হবে নির্দ্দিষ্ট দিনে ? দু'তিন মাস ছুটি নিয়ে মহেশ কোমরের ব্যথা সারাতে চাইলে, কি ধনদাস আপত্তি করবে, আজ দশ বছরের বেশী মহেশ তার হয়ে কাজ করছে ! মহেশ তো অনায়াসেই জানিয়ে দিতে পারে যে অন্য কাউকে দিয়ে এক সংখ্যা কি দু'সংখ্যা 'রস-সাহিত্য' বার করা হোক, তারপর মহেশ সুস্থ হয়ে গিয়ে দায় নেবে।

মহেশ বিছানায় শুয়ে জবাব লেখে, কোমরের ব্যথা অনেক কম।

একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, তাই দেরী হবে। আজকেই মহেশ প্রেসে যাবে।

মলয়া একেবারে যেন নেতিয়ে গিয়ে বলে, পারবে যেতে? উঠেই তো দাঁড়াতে পারছ না!

: আজ কি আর সত্যি সত্যি যাব রে পাগলি? ওটা হল জানিয়ে দেবার কায়দা যে ঠিক সময়ে গিয়ে কাগজ আমি ঠিক বার করে দেব।

মলয়া ঝংকার দিয়ে বলে, সবার সাথেই তোমার রসিকতা।

কাতরানি থেমেছে কিন্তু মুখ দেখেই টের পাওয়া যায় যে মহেশের কোমরের ব্যথা বেশ জোরালো।

তবু সে রসিকতা করে জবাব দেয়, রস যে আমার বেশী গো—রস নিয়েই মজে আছি। নইলে রস-সাহিত্যের সম্পাদক হয়ে এতকাল চালাতে পারতাম?

: যেমন কাগজ তোমার রস-সাহিত্য তেমনি তুমি সম্পাদক!

ভালমন্দ সব রকম কথায় ঝংকার দিয়ে উঠুক, উঠতে বসতে কলহ করুক, ছোট বড় সব ব্যাপার মহেশের হাল্কা রসিকতায় উড়িয়ে দেবার কায়দার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব সময় সব ব্যাপারে সব কথায় খ্যাঁচ খ্যাঁচ করার কায়দায় লড়াই চালাক—মলয়া উদয়াস্ত খাটে।

উদয় থেকে শুরু করে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পরেও খাটে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত।

কারণে তো খাটেই, অকারণেও খাটে।

যে কাজ সংক্ষেপে সারা যায় সেই কাজ সবিস্তারে করা তার স্বভাব, হাতে কাজ না থাকলে তার হাঁপ ধরে যায়। মেয়েরা কোন কাজে সাহায্য করতে এলে সে ঝংকার দিয়ে ওঠে, ফাঁকা দরদ দেখিয়ে আমার ব্যাপারে তোরা মাথা গলাবি না বলে দিচ্ছি!

আহত মহেশের সেবাও করে মরিয়া হয়ে। সংসারের কাজ

কমিয়ে বাকী সময় সে অবিরাম তার কোমরে সেঁক আর মালিশ চালিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি মহেশকে সারিয়ে তুলে আপিসে গিয়ে কাজ করে মাস-মাইনে আনার মত জোরদার করে তুলতে সে যেন কোমর বেঁধেছে—প্রাণ দিয়ে সে সামলাবে স্বামী আর সংসারকে।

মেয়েদের সংসারের কোন কাজে নাক গলাতেও দেয় না, মেয়েদের দিকে ফিরে তাকাবার সময়ও মলয়া পায় না।

দুই মেয়ে, চন্দ্রা এবং মন্দ্রা।

মন্দ্র থেকে মন্দ্রা—চন্দ্রাই জোর করে নিজের নামে মিলিয়ে নাম রেখেছিল আদরের বোনটির।

মহেশ বলেছিল, মন্দ্র কথাটার মানে জানিস্ না খুকু? মেঘের গম্ভীর ধ্বনি, মৃদঙ্গ। অভিধান না মানিস্ সেজন্য নয়—সরু গলায় এমন চেঁচিয়ে কাঁদে, এমন খিল খিল করে হাসে, ওর তুই মন্দ্রা নাম রাখলি?

: আমার নামের সঙ্গে মিলেছে, একটা মানে আন্দাজ করা যায়, তাই ঢের। তুমি বল না লাগসই অন্য একটা নাম?

মহেশ দু'একটা নাম বলেছিল কিন্তু চন্দ্রার পছন্দ হয়নি! চন্দ্রার পর আর মেয়ে জন্মাবে না, আর নামকরণ করতে হবে না, এ রকম আশা থাকলেও কোন ভরসা অবশ্য ছিল না। মেয়ে দিয়েই যখন শুরু হয়েছে, একগণ্ডা দেড়গণ্ডা মেয়ের আশঙ্কাই তার ছিল। কিন্তু নাম রাখা নিয়ে মহেশ কখনো মাথা ঘামায় নি।

চন্দ্রা চলন্তিকার পাতা উল্টে এলে মহেশ বলেছিল, তোর নাম কিন্তু চন্দ্রা নয়—চন্দ্রাবতী। মন্দ্রাবতী বড্ড বেখাপ্পা হবে।

: চন্দ্রাবতী নয়, আমার নাম চন্দ্রা। তুমি নাম রেখেছ, বাতিল করব না একেবারে। বতী টতী লাগিয়ে কি দরকার? চন্দ্রা বললেই লোকে বুঝবে আমি মেয়ে।

তারপর হাসিমুখে বলেছিল, কি নামটাই ঠাকুর্দ্দা রেখে গেছেন তোমার, বলিহারি যাই। আগে নয় মহেশ বলতে মহাদেব বোঝাত,—শরৎবাবু মহেশ গল্প লিখবার পর কি মানে মনে আসে বল তো সবার? ঠাকুর্দ্দার ওপর এমন রাগ হয় আমার!

মহেশও হাসিমুখে বলেছিল, বুঝেছি। ক্লাসের মেয়ে খোঁচা দিয়েছে, না? আজকালের মধ্যেই দিয়েছে নিশ্চয়! মহেশ-গল্পটা পড়ান হচ্ছে বুঝি? কার গায়ে জ্বালা ছিল, এই সুযোগে ঝাল ঝেড়েছে!

চন্দ্রা খুসী হয়ে বলেছিল তুমি কি করে বুঝলে বাবা? একেবারে ঠিক ধরেছ ব্যাপারটা! ঝরণা তো আমায় দু'চোখে দেখতে পারে না—কে জানে আমি ওর কি ক্ষতি করেছি! ক্লাসে গল্পটা পড়ান হচ্ছে, উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, মহেশ কথাটা মানে বুঝিয়ে দিন। মহেশ মানে তো মহাদেব, একটা ষাঁড়ের এ নাম রাখা হল কেন? চন্দ্রার বাবার নামও আবার মহেশবাবু। ক্লাশের সব মেয়ে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল বাবা!

মহেশ কড়া সুর করে বলেছিল, তুমি মিছে কথা বলছ—ক্লাশের সব মেয়ে হাসে নি, হাসতে পারে না। সকলের সঙ্গে তো ছেলেমানুষি ঝগড়া হয় নি তোমার! কিছু মেয়ে হেসেছিল, কিছু মেয়ে ঝরণার অসভ্যতায় ভীষণ চটে গিয়েছিল।

: ঠিক বলেছ! রাধার খুব ভাব ছিল ঝরণার সঙ্গে, আমার সঙ্গে মিশতই না। ক্লাশ শেষ হলে, যাচ্ছেতাই বলে ঝরণার সঙ্গে ঝগড়া করলে,—আড়ি হয়ে গেল দু'জনার।

একটু থেমে চন্দ্রা বিস্ময় আর কৌতূহলের সঙ্গে বলেছিল, কিন্তু তুমি কি করে ঠিক ঠিক সব জানলে ঘরে বসে?

: সম্পাদককে সব জানতে হয়।

চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পাকা চুল তুলে দিতে দিতে চন্দ্রা বলেছিল, তাই বুঝি চুল পেকে যাচ্ছে ?

মহেশ কয়েকদিন প্রেসে না যাবার ফলে একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। ভাগ্যচক্র নয়, কোমরে চোট না লেগে কোন অসুখ হয়ে বা অন্য কারণে মহেশ কাজে হাজিরা দিতে কামাই করলেও যোগাযোগটা ঘটত।

ঘটনার সঙ্গে গাঁথা হয়ে হয়েই ঘটনা ঘটে থাকে।

সখের কবি ও লেখক জহরের কবিতার বইটি বার হয়েছে। মহেশকে একখানা বই উপহার দিতে দু'দিন প্রেসে গিয়ে তার দেখা না পাওয়ায় সে তার বাড়ীতেই আসে।

মহেশের সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল কিন্তু রস-সাহিত্যের আপিসেই মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হত, মহেশের বাড়ীতে তার এই প্রথম পদার্পণ।

চন্দ্রার সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং তাকে তার অদ্ভুতরকম ভাল লেগে যায়।

একেবারে যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রেমের সূত্রপাত ঘটা।

একটা দিন বোধ হয় কোন রকমে ধৈর্য ধরে থাকে। পরদিন ব্যথিত কোমরটা নিয়ে কোন রকমে প্রেসে হাজিরা দিতে গিয়ে মহেশ তাকে তারই প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখতে পায়।

বিশেষ কোন ভূমিকা না করেই জহর বলে, আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে ভাল করে মিশতে চাই। আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?

মহেশ বলে, আমার আপত্তি হবে কেন ? আমার তো পর্দানশিন বোকা মেয়ে নয়।

জহর উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, অনেক মেয়ের সঙ্গে চেনা আছে, আপনার

মেয়ের মত একজনেরি মধ্যে এমন প্রাণশক্তির সঙ্গে এমন গভীর ভাব আর কারো মধ্যে দেখি নি।

মহেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, আমার কোন্ মেয়েটার কথা বলছ? চন্দ্রা তো খুব ধীর শান্ত মেয়ে—ভাবুক বলা যেতে পারে, খুব সেনজিটিভ্, ওর মধ্যে তুমি প্রাণশক্তি দেখতে পেলে? সত্যিকারের জীবন্ত বলতে গেলে ছোটটাকে বলতে হয়—সব সময় অস্থির চঞ্চল।

জহর হেসে বলে, আমি চন্দ্রার কথাই বলছি। আপনারা ভুল হিসাব ধরেন—খুব দুরন্ত আর অস্থির হলেই কি বেশী জীবন্ত হয়? রোগা ছেলেমেয়েরাই বেশী দুষ্টু হয় ত্যাখেন না? প্রাণশক্তি আছে বলেই আপনার বড় মেয়ে এত সেনজিটিভ অথচ শান্ত।

মহেশ বলে, তাই নাকি! প্রাণ-চঞ্চল কথাটার মানে তোমরা কবিরা তবে এই বোঝ?

জহর একেবারে উঠে-পড়ে লাগে।

তার যেন সবুর সইবে না, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চন্দ্রার হৃদয়-মন জয় করতে হবে।

তার বাড়াবাড়িতে সকলে হাসাহাসি করে, বলাবলি করে যে কবি লেখকেরা সত্যিই পাগলের জাত!

চন্দ্রা লজ্জা পেয়ে দিন পনের পরেই জহরকে বলে, কি আরম্ভ করেছেন? আপনার কোন বুদ্ধি বিবেচনা নেই।

জহর বলে, আমার মতলব কিন্তু ভাল। তোমার জন্য ছেলে খোঁজা হচ্ছিল, সে হিসাবে আমি একেবারে বাজে নই। বাড়ীর অবস্থা ভাল, চাকরীটাও মন্দ করছি না। কবি হলেও স্বভাব কেউ মন্দ বলতে পারবে না।

অন্য দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা বলে, আমার পিছনে না লেগে বাবাকে বললেই হয়।

: তোমার বাবাকে জানিয়েই তোমার পেছনে লেগেছি।

চন্দ্রা মুখ ফেরায় না, গলা চড়ায় না, মৃদুস্বরে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে, আপনি তো ভীষণ মানুষ! ছেলের অভিভাবক হোক আর ছেলে নিজেই হোক, একদিন কি বড়জোর দু'দিন মেয়েকে দেখে শুনে পরীক্ষা করতে এসে পছন্দ নয়তো অপছন্দ করে যায়। আপনি আজ পনের দিন ধরে রোজ এসে মেয়ে পছন্দ করছেন!

খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকে জহর। সামনে রাখা দু'নম্বর চায়ের কাপ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জুড়িয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ সে বলে, আমি কি তবে ভুল করলাম?

: কি করে বলব?

: নাঃ, আমি ভুল করি নি। তুমিই আমায় ভুল বুঝেছ। পছন্দ তোমায় আমি প্রথম দিনেই করেছিলাম—শুধু পছন্দ করা নয়, ভালবেসেছিলাম।

এবার মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে চন্দ্রা একটু হেসে বলে, তাই বুঝি দিনের পর দিন যাচাই করে চলা? আমায় নিয়ে দশজনের হাসাহাসির ব্যবস্থা করা?

জহর আবেগের স্বরে বলে, বললাম না তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। তোমায় পছন্দ করি নি—ভালবেসেছি। এতদিন কোন মেয়েকে চাই নি, বাকী জীবনে তুমি ছাড়া কোন মেয়েকে চাইতে পারব না। কিন্তু আমরা কবি মানুষ, আমরা ভালবাসার ব্যাপার জানি—

: কোন মেয়েকে ভাল না বেসেই—? এবার বুঝলাম ভালবাসা নিয়ে কবিরা কি রকম আন্দাজী কারবার চালান!

খোঁচা খেয়েও জহর যেন খুব খুসী হয়ে ওঠে।

: নাঃ, তা নয়। অল্প বয়সে দু'একটা মেয়ের সঙ্গে ছেলেমানুষী ভালবাসা নিয়ে পাগলামি করেছি বৈকি! বেশী না বুঝে থাকি, এটুকু বুঝে গিয়েছি যে একপক্ষে ভালবাসা হয় না। তোমায় যদি শুধু পছন্দ করতাম, তোমার পিছনে লাগতাম না। তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তার ব্যবস্থা করে তোমায় পাবার ব্যবস্থা করতাম। ভালবেসে ফেললাম বলেই মুস্কিল হয়েছে। একপক্ষে ভালবাসা হয় না, তোমার মধ্যে একটু ভালবাসা না জাগিয়ে—অন্ততঃ তুমি আমাকে পছন্দ কর কিনা জেনে—

চন্দ্রা মুচ্‌কে হাসে।

: ভালবাসার প্রমাণ মেয়েরা কি করে দেবে জানি না। পছন্দ করার প্রমাণ কিন্তু যথেষ্ট দিয়েছি। নইলে এত জ্বালাতন বরদাস্ত করতাম? এত পাগলামি সইতাম? সবাই হাসাহাসি করছে দেখেও এতদিন চুপ করে থাকতাম?

: শুধু সহ্য করা?

: আমি কচি খুকী নই। আমিও দু'তিন বছর কবিতা লিখেছি, বাবা এখানে ওখানে কয়েকটা ছাপিয়েও দিয়েছেন। আপনি তো তবু নিজের পয়সায় নিজের কবিতার বইটা বার করলেন, আমার কবিতাগুলি মাসিকের ছেঁড়া কাগজে মুদী দোকানে মশলা প্যাক করছে।

: তুমি কবিতাও লিখেছ জানতাম না।

: কবিতা লেখা বুঝি তোমাদেরি একচেটিয়া?

জহর যেন পরম খুসী হয়ে হাসে, টেবিলে সজোরে এক চাপড় মেরে জুড়িয়ে যাওয়া চায়ের কাপের অর্দ্ধেকটাই উছলে ফেলে দেয়।

: এবার বুঝে গেছি। তোমরাও স্বাধীনতা চাও! আমাদের এতকালের এমন ছাঁকা ভালবাসাও তাই মানা চলছে না। সত্যি কথাই—আমরা আজও সত্যি তোমাদের ভালবাসার দাম কষছি কতখানি তোমরা সতী সাবিত্রী হতে পারবে তারই ওজনে।

আরেক কাপ চা আসে। এনে দেয় মন্ত্রা, মুখখানা হাস্যকর রকম গম্ভীর করে আসে। জহর তার গাল টিপে দিয়ে বলে, গাল ফোলা কেন?

মন্ত্রা বলে, আমিও কিন্তু কচি খুকী নই। গাল টেপা জমা রইল, একদিন উস্থল করব।

: করবেই তো, সুদে আসলে করবে। ও গালটাও টিপে দিই, ঋণ বাড়ুক।

মন্ত্রা চলে গেলে, জহর বলে, তোমার কবিতাগুলির কপি ঠিক আছে?

: আছে না? আরও গোটা ত্রিশেক কবিতা লেখা আছে। ছাপাতে ভাল লাগে নি বলে ছাপাই নি।

: গয়না না দিয়ে, আমার বইটার চেয়েও ভাল করে তোমার কবিতার বইটা ছাপিয়ে বিয়ের রাতে উপহার দিলে, খুশী হবে তো?

: খুশী হব না? কিন্তু তুমি পারবে কিনা কে জানে! হীরা জহরতের গয়নায় আমায় মুড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল একজন, বাবা সামলে নিল। টাইফয়েডে আমি মর মর বলে কাটাল মাসখানেক, টাইফয়েড থেকে সেরে উঠে আমার মাথা বিগড়ে গেছে বলে আমাকে বোম্বাই-এ জেঠার কাছে চেঞ্জে পাঠিয়েছে বলে আরও ক'মাস ঠেকিয়ে রাখল। টাকায় সুবিধা হবে না টের পেয়ে তারপর বাঁদরটা হাল ছাড়ল।

জহর বলে, জেঠা মানে তো রাজীববাবু?

চন্দ্রা বলে, নামেই জেঠা। বাবা সত্যি সত্যি কয়েক মাসের জন্য পাঠাতে চেয়েছিল। আমিই গেলাম না। ওরকম বড়লোক জ্যাঠার বাড়ী ঝি হিসাবে ছাড়া যেতে পারি? জ্যাঠা কোনদিন মানবে ভাইঝি বলে? বাবাকে এতটুকু সাহায্য করবে না, শুধু চাইবে পায়ে এসে প্রণাম কর।

কাজে যাবার সময় মহেশ এসে একটু দাঁড়ায়,—খানিকটা বাঁকা হয়ে।

আছাড় খেয়ে শুধু চোট লাগার ব্যথা এতদিন থাকার কথা নয়। অন্য কোন গোলমাল ঘটেছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো দেহটাতে।

চন্দ্রা বলে, না গেলে হয় না? কামাই কর না দু'একদিন!

জহর বলে, কাগজ তো বেরিয়ে গেছে?

মহেশ বলে, আমার কি শুধু কাগজ বার করার কাজ হে? প্রেসের কাজও দেখতে হয়। বোস তোমরা—আমি চল্‌লাম।

জহর বলে, ফেরার সময় প্রেসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।

খানিক পরেই একগাদা বই-খাতা হাতে মন্দ্রা এসে দাঁড়াল।

বলে, বাবা বেরিয়ে গেলেন, আমিও স্কুলে চললাম, বোকা দিদিটাকে কে পাহারা দেবে?

জহর হেসে বলে, আমি পাহারা দেব। সারা জীবন পাহারা দেবার চাকরী দিতে তোমার দিদি রাজী হয়েছে, মন্দ্রা!

মন্দ্রাও হেসে বলে, আহা মরি, কী বিনয়! দিদির আবার রাজী অরাজী!

কেউ অবশ্য ভাবে নি এভাবে এমন আচম্‌কা চন্দ্রার এত ভাল বিয়ে হয়ে যাবে—যদিও ব্যাপারটা মোটেই অভাবনীয় নয়। এরকম ভালবাসার বিয়ে সংসারে হরদম হচ্ছে।

জহরের তাড়াহুড়ো করাটাও এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। কোন মেয়েকে ভালবেসে ফেললে তাড়াতাড়ি তাকে পাওয়ার ঝোঁকটা কবি লেখক ছাড়াও অনেকেরই দেখা যায়!

তবু তাদের জানা চেনা বেশীর ভাগ মানুষেরাই কিনা কোন কোন ভাবে সাহিত্য জগতের সঙ্গে জড়িত, লিখতে এবং চিন্তা করতে প্রেমের

মাধ্যমটাকে বুদ্ধি দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও বিচার বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত—অনেকেরই তাই, তাদের ভালবাসার বিয়েটা অসাধারণ মনে হয়।

প্রথম পরিচয়ে প্রেম হওয়া নয়—ওটা যে অতি সাধারণ ব্যাপার যুগ যুগ ধরে ওটা অসংখ্য বার বাস্তব জীবনেও ঘটেছে—কবি লেখকেরা হরফ সাজিয়ে সেটা অসংখ্য বার প্রমাণও করে গেছে।

কিন্তু জহরের মত একজন সুমার্জিত কবি লেখকের পক্ষে ভালবাসাটা গড়ে উঠতে না দিয়ে, পাকতে না দিয়ে, মিলনের ছেদ টানাটা খাপছাড়া লাগে অনেকের কাছে।

মহেশের আয়োজন সামান্য কিন্তু বিয়েতে সমারোহ হয় প্রচুর। বহু লোকের সঙ্গে মহেশের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা—তাদের সকলকে সেকেলে লুচি-পোলাও মাছ-মাংসের ভোজ খাওয়াবার সাধ্য তার নেই। না করলে নয় বলেই বাছা বাছা আত্মীয় কুটুম্ব বরযাত্রী কিছু লোককে ওরকম ভোজ খাইয়ে চেনা মানুষদের সে চা, বিস্কুট, চানাচুরের আসরে নিমন্ত্রণ করে।

ভোজ খেতে এসে আত্মীয় কুটুমেরা চন্দ্রাকে উপহার দেয় সোণা রূপার সিঁদুর কৌটা থেকে প্রসাধনী সামগ্রী, শাড়ী বা হাল্কা গয়না—চায়ের আসরে নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই বই এর উপহার বৃষ্টি করে।

একটা আলমারি ভরে গিয়ে বেশী হবে—এত বই!

এমন জমাট বাঁধে চা-খাবারের প্রীতি-সম্মেলনের আসর যে, মনে হয় চন্দ্রার বিয়ে উপলক্ষে বুঝি একটা বড়রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলেছে।

প্রাণ খোলা হাসি তামাশা আলাপ আলোচনা গান বাজনা ও সংক্ষিপ্ত সরস বক্তৃতায়, প্রাণের রসে জম-জমাট হয়ে ওঠে সে আসর।

কতকাল পরে যে মলয়ার মুখে হাসি দেখা গিয়েছে!

তার কলহ আর মহেশের হাল্কা রসিকতার সম্পর্ক যেন বদলে গিয়েছে চন্দ্রার বিয়ে ঠিক হবার দিন থেকে।

সর্বদা দু'জনে মিলে মিশে পরামর্শ আর বিচার বিবেচনা।

: হৃদয়বাবু জহরের জ্যাঠা না কাকা গো? জ্যাঠাই হবে বোধ হয়। দাবীদাওয়ার এই লম্বা ফর্দ্দ পাঠিয়েছে। শুধু গয়নাই চেয়েছে হাজার তিনেক টাকার।

: সে জন্যে ভেবো না। তুমি রস-সাহিত্য নিয়ে ভাবে মেতে থাকো।— ওসব আমি হিসেব করেছি। জহরকে পরিস্কার বলেছি গয়না কাণে হাতে গলায় পাঁচশো টাকার বেশী দিতে পারব না।

মলয়া লজ্জিতভাবে হাসে।

: কী অদ্ভুত ছেলে জানো? আমার কথা শুনে একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বললে, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করছি মা— গয়নাগাটি দেনাপাওনার ব্যাপার বুঝবে অন্যেরা। আপনারা যা দেবার দেবেন, আমিও আপনাদের হয়ে হাজার টাকার শাড়ী গয়নার ব্যবস্থা করে মুখ রক্ষা করব। আমি রেগে উঠতে কি বলেছিল জানো? রাগবেন না, ওটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে। আমি কি আজকের কথা বলছি? আজ তো আমি পরের ছেলে, একমাস পরে যখন জামাই হব, তোমায় মা বলে ডেকে তোমার পক্ষ হয়ে তোমার মেয়েকে দিলে তো আর দোষ থাকবে না!

মহেশ যেন একটু চিন্তিত ভাবেই বলে, সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধি বড় কম ছেলেটার। সব সময় ভাবের বশে চলে।

মলয়া হেসে বলে, ওতে কি আসে যায়। বুদ্ধি তো আছে—সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধিও নিজে থেকেই গজাবে।

: সে তো গজাবে কিন্তু কি ভাবে গজাবে সেইটা তো ভাবনার কথা।

: বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিয়ের ওই বিশেষ আসরটিকে সব চেয়ে বেশী সরগরম করে রাখে, মানব আর অপর্ণা।

মানবের চেয়ে বয়স কিছু বেশীই হবে, বিয়ে হয়েছে। চন্দ্রা যে স্কুলে পড়ত এবং মন্দ্রা এখন যে স্কুলে পড়ে, সেই স্কুলের শিক্ষিকা।

লেখিকা হিসাবে তাকে আবিষ্কার করার গৌরব চন্দ্রা দাবী করে থাকে। ক্লাসে একদিন অপর্ণা ছোট একটি খাতা ফেলে গিয়েছিল, সেই খাতায় ছিল মেয়েদের জন্য তার লেখা ছোট একটি প্রবন্ধ।

লেখাটি পড়ে চন্দ্রা খাতাটি হাতে নিয়ে, অপর্ণার কাছে গিয়ে বলেছিল, এ লেখা আপনাকে ফেরত দিচ্ছি না অপর্ণাদি। ভারি সুন্দর হয়েছে লেখাটা—বাবার কাগজে ছাপিয়ে দেব।

অপর্ণা সহজে রাজী হয় নি। লেখা তো ছাপা হবেই না, মাঝখান থেকে মহেশ ভাববে যে সোজাসুজি নিজে চেষ্টা না করে ছাত্রীকে দিয়ে বাজে লেখা ছাপিয়ে নেবার চেষ্টা করছে!

: মিছামিছি কেন লজ্জা দেবে চন্দ্রা?

: আপনার আবার লজ্জা কি?

চন্দ্রা এক রকম জোর করে লেখাটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে মহেশকে পড়তে দিয়েছিল। তারপর অনেক লেখা বেরিয়েছে অপর্ণার, বই বেরিয়েছে, নাম হয়েছে।

মাঝে মাঝে চন্দ্রা সগর্বে বলত, আমার জন্য আপনি লিখতে শিখলেন অপর্ণাদি!

অপর্ণা বলত, নাঃ, তোমার বাবার জন্য। প্রথম লেখাটা ছেপেছিলেন বলেই তো আরও লেখার উৎসাহ পেলাম!

: প্রথম লেখাটা কে এনে দিয়েছিল বাবাকে? কে জোর করে বলেছিল লেখাটা ছাপতেই হবে? বললেই হল বাবার জন্য!

অপর্ণা হেসে বলত, বাজে লেখা হলে তুমি ধরেছো বলেই বুঝি উনি ছাপতেন?

: বাজে লেখা হলে আনতাম নাকি? লেখাটা ক্লাশে ফেলে

গিয়েছিলেন, আমি পড়ে দেখলাম সুন্দর লেখা—নইলে কে জানত আপনি লিখতে পারেন? আমি আপনাকে আবিষ্কার করেছি।

অপর্ণা হেসে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, বই যদি ছাপি তোমার নামে উৎসর্গ করব।

প্রথম বইখানায় সত্যই সে চন্দ্রার কাছে ঋণ স্বীকার করে চন্দ্রার নামে বইটি উৎসর্গ করেছে।

গল্প উপন্যাসের চেয়ে মেয়েদের জন্য লেখা অপর্ণার ঘরোয়া প্রবন্ধগুলির আদর হয়েছে বেশী।

মনস্তত্ত্ব এবং যৌন-বিজ্ঞান ঘটিত ব্যাপার পর্যন্ত, সে সরল সহজভাবে অল্প কথায় বুঝিয়ে দিতে পারে।

ধনদাসের কাগজে তার লেখা ছাপানো নিয়ে মাঝে মাঝে একটু অসুবিধায় পড়তে হয় মহেশকে।

যৌন বিষয়েও এমন অনেক কথা সে সোজাসুজি লিখে বসে যে একটু অদল বদল না করে ছাপানো যায় না।

অপর্ণা বলে, দোষ কি? সোজা স্পষ্ট বলাই তো ভাল! এসব বিজ্ঞানের কথা রেখে ঢেকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে গেলেই বরং নোংরা হয়ে যায়।

মহেশ বলে, কোন্ কাগজে লেখা যাচ্ছে সেটা হিসাব করে দেখতে হবে তো!

মানবও তাকে সমর্থন করে। বলে, নিশ্চয়ই! সোজা স্পষ্ট কথা শোনাটা আগে না শিখিয়ে হঠাৎ বলতে গেলে মানুষ চম্‌কে যাবে না, ভড়কে যাবে না? সাধারণ ঘরের মেয়েরা দরকার হলে সোজাসুজি অনেক কথা বলাবলি করে—আপনার চেয়েও বরং মোটা করে বলে। কিন্তু তাদের বলার একটা ধরণ আছে। আপনার লেখার ধরণটা একেবারে অন্য রকম

বলে তাদের কাছে নোংরা ঠেকবে—আপনি অনেক মার্জিতভাবে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বললেও লাগবে।

অপর্ণার সঙ্গে কথায় কথায় মানবের তর্ক বাধে—কোন বিষয়েই দু'জনের মতের যেন মিল নেই!

আসলে কিন্তু তা নয়।

অনেক মূল বিষয়ে মতের তাদের তফাত থাকে না—তারা তর্ক করে আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে।

অপর্ণা তর্ক করুক—তার লেখার কোন কোন যায়গা দরকার মত সংশোধন করার অনুমতি মহেশকে দেওয়া আছে।

আজও মানব আর অপর্ণা তর্ক জুড়ে দেয়—বিয়ের প্রীতি-সম্মেলনের আসরে মানানসই হবে এমনি ভাবেই অবশ্য জুড়ে দেয়। বিষয়টাও হয় লাগসই—প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা!

অপর্ণা জহরকে বলছিল, কাজটা ভাল করলেন না। কবি লেখকরা প্রেমে পড়বে, একবার ছেড়ে দশবার পড়বে, কিন্তু ভালবেসে বিয়ে করা তো তাদের উচিত নয়!

কথাটা লুফে নিয়ে মানব হাসিমুখে বলে, সে কি কথা! আপনি যে একেবারে উল্টো গাইছেন! শুধু কবি লেখকদেরই বরং দশবার প্রেমে পড়ে দশটা বিয়ে করার স্পেশাল অধিকার থাকা উচিত—প্রত্যেকটা বৌকে পুষবার জন্য স্পেশাল পেন্‌সনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রেম ছাড়া বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ে ছাড়া প্রেমের মানে হয়?

সকলে হাসে।

অপর্ণাও হেসে বলে, বোঝা গেল একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। একবার প্রেমেও পড়েন নি, একবার বিয়ে করার মজাও টের পান নি—আইন করে আপনাকে লিখতে না দেওয়া উচিত! প্রেম আর বিয়েতে যে,

তেল আর জলের মত খাপ খায় না, দুটো একেবারে বিপরীত ব্যাপার, এটুকু না জেনেই কলম ধরেছেন!

প্রৌঢ় লেখক অনিমেষ মন্তব্য করেন, ঠিক কথা! নইলে ওর লেখা অমন কড়া হয়—গল্প উপন্যাস দিয়ে বিপ্লবের চেষ্টা চালায়!

চন্দ্রার বান্ধবী সন্ধ্যা বলে, আমরা প্রতিবাদ করছি—ওঁর লেখায় সত্যিকারের বাস্তব প্রেমের অনেক গন্ধ আছে। আপনাদের ফেণানো প্রেমের গল্পের চেয়ে ওঁর প্রেম ঢের বেশী জোরালো। চুপ করে গেলে চলবে না মানুবাবু, অপর্ণাদির কথার জবাব দিতে হবে! আমরা শুনতে চাই।

মানব হাসিমুখে চারিদিকে তাকিয়ে বলে, উনি তামাশা করে কথাটা বলেছেন। নইলে মনো-বিজ্ঞান নিয়ে, যৌন-বিজ্ঞান নিয়ে এত লিখেছেন, উনি কি সত্যি জানেন না, তেল আর জলের মত বিপরীত বলেই প্রেম আর বিয়ের মধ্যে, একটা বাদ দিয়ে আরেকটার মানেই হয় না?

প্রৌঢ় অনিমেষ আমোদে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, দেখলে তো, ডায়ালেক-টিক্স ঠিক টেনে এনেছে!

সকলে সশব্দে হেসে ওঠে।

আসর যখন এমনিভাবে হাসি আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে তখন এসে দাঁড়ায় উমাকান্ত।

হাসি কথা একেবারে থেমে যায়। পুতুলের শোচনীয় মরণের বিবরণ প্রায় সকলেরই জানা ছিল না, অনেকের এটাও জানা ছিল যে ভেবে চিন্তে উমাকান্তের দিক্ বিবেচনা করেই তাকে মহেশ আহ্বান জানায় নি।

মহেশ অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, এসো উমাকান্ত, বোসো!

উমাকান্ত শান্তভাবেই বলে, বসা উচিত নয়, তবু বসব। চন্দ্রার বিয়েতে আমি একটা নিমন্ত্রণ পেলাম না!

মহেশ অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলে, কি জানো, আমরা ভাবলাম এই সে দিন—

মহেশ থেমে যায়। উমাকান্ত বসে এবার একটু হাসে—সত্যই হাসে! বলে—জানি, আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করেই আমায় বলেন নি। তাই তো যেচে এলাম।

তার মাথার ব্যাণ্ডেজ তখনো খোলা হয় নি।

৫

মাস ছয়েক কেটেছে চন্দ্রার বিয়ের পর।

চন্দ্রা কিছুদিন বাপের বাড়ী থাকতে আসে। জহর নিজেই তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়—সকালে। সারাদিন থেকে, মন্দ্রার সঙ্গে মিষ্টি ইয়ার্কির লড়াই চালিয়ে, জামাই আদর ভোগ করে, বিকালে সে বিদায় নেয়।

সকলের কাছ থেকেই দুটো দিন থেকে-যাবার অনুরোধ আসে। কিন্তু জহরের নাকি জরুরী কাজ, থাকার উপায় নেই।

মন্দ্রা মিনতি করে বলে, কবির আবার জরুরী কাজ থাকে নাকি জামাইবাবু? আচ্ছা বেশ দু'দিন না থাকতে পারেন, আজকের রাতটা শুধু থেকে যান!

বলে সে একটু মুচ্‌কে হাসে, বৌ থাকবে যেখানে, সেখানে দিনটা কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা কি চলে যেতে আছে? এটুকু বুদ্ধিও নেই? কাল সকালে যাবেন। দুপুরের জামাই-ভোজ না খেতে চান—সকালে চা খাবার খাইয়ে ছেড়ে দেব।

জহর হেসে বলে, তোমার সঙ্গে এক বাড়ীতে রাত কাটাতে বলছ? জানই তো নিজেকে সামলাতে পারব না, রাত দুপুরে চুপি চুপি ঘুম ভাঙ্গাতে যাবই—দিদি দিদি, চোর চোর, বলে চেঁচিয়ে আমার দফাটি সারবে। বেশ মতলব করেছ জব্দ করার!

ঃ কথা দিচ্ছি চেঁচাব না, চুপ করে থাকব।

ঃ এখন আর কথা দিয়ে লাভ কি? তোমার দিদি তো শুনে ফেলল, ও কি আর রাত্রে ঘুমোবে ভেবেছ? সারারাত জেগে পাহারা দেবে।

ছ'মাসের মধ্যে নানা উপলক্ষে এবং বিনা উপলক্ষে কয়েকবার চন্দ্রা দু'চার দিনের জন্য বাপের বাড়ী এসে থেকে গিয়েছে—নিজের শাড়ী গয়নার সৌভাগ্যে বেশ একটু লজ্জিতভাবেই যেন এসেছে।

মন্দ্রার জন্য প্রতিবার দামী শাড়ী আর অন্য নানারকম উপহার নিয়ে এসেছে।

এবার তার যেন একটু কেমন কেমন ভাব!

মন্দ্রার জন্যও এবার সে কিছুই আনে নি।

সন্ধ্যার পর মলয়া রুটি সেঁকে, মন্দ্রাকে সরিয়ে দিয়ে চন্দ্রা রুটি বেলে দিতে বসে।

মলয়া বার বার তাকায় মেয়ের দিকে, বার বার একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে যায়।

চন্দ্রা বলে, পোড়া পোড়া করছ কেন রুটি?

খুন্তি দিয়ে চাটুতে রুটি দু'টো উল্টে দিতে দিতে মলয়া বলে, মা'র কাছে কিছু লুকোতে নাই জানিস্ তো?

[illegible] ছে?

[illegible] মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বসে মলয়া বলে, কিছু [illegible]কম গণ্ডগোল করে আসিস্ নি তো? বেঘরে [illegible]ছিস্, তোর জন্যে ভেবে ভেবে রাত্রে আমার [illegible]

[illegible]। রুটি বেলতে বেলতেই বলে, কিছু হয় নি, কিছু [illegible] নিশ্চিন্ত হয়ে রাতে ঘুমিও। একটা কি বিষম [illegible] লেখা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকতে হবে, তোমার

মেয়ের দিকে মন গেলে, শুধু বই লেখা নিয়ে মাতা যাবে না—তাই দু'একমাসের জন্য তোমার মেয়েকে বাপের বাড়ী বেড়াতে পাঠিয়েছে।

মলয়া খানিকটা স্বস্তি পায়, একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মুখ ভার করে বলে, বাবা, বই লেখার জন্য বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাতে হয়!

মন্দ্রা বলে, কবি জামাই এনেছ ভুলে যাও কেন? কবিদের কখন কোন্ ভাব কখন কোন্ ঠাট, তার কি কিছু ঠিক আছে?

ছ'মাস কেটে যায়।

চন্দ্রাকে নেবার কথা তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরাও বলে না, জহরও বলে না।

জহর মাঝে মাঝে আসে—সকালের দিকে। সারাদিন থাকে, মন্দ্রার সঙ্গে হাসি তামাশা চালায়, যথারীতি জামাই আদর ভোগ করে, বিকালে কিম্বা সন্ধ্যার পর বিদায় নিয়ে চলে যায়।

তার জরুরী কাজ আছে।

মন্দ্রা বলে, আচ্ছা বেশ, তাই সই, আর ক'দিন লাগবে কাজটা চুকতে? যদ্দিন লাগুক, আরও একটা দিন নয় বেশী লাগাবেন। বাড়াবাড়ি করবেন না জামাইবাবু!

জহর অন্যমনে কি ভাবে।

মন্দ্রা রেগে বলে, আপনার কোন বুদ্ধি বিবেচনা [illegible] ছেলেমানুষ, নয় গোমুখ্যু। জামাই আসে, রাতে [illegible] বাবার কি রকম লাগে বোঝেন না? আত্মীয়[illegible] কি ভাবে? দিদির কথা নয় বাদ দিলাম—আ[illegible] আপনারাই জানেন, দিদিকে শাস্তি দিচ্ছেন বুঝে[illegible]

জহর তাড়াতাড়ি বলে, না-না, শাস্তি কেন দে[illegible]

মন্দ্রা আরও রেগে বলে, এভাবে আসেন কেন [illegible] না পারলে আর আসবেন না।

জহর বলে, তাই বটে, এদিকটা তো আমার খেয়াল হয় নি। সবাই যে নানারকম ভাববে মনেই পড়ে নি একেবারে।

মন্দ্রা ব্যঙ্গ করে বলে, তা মনে পড়বে কেন, আকাট মূখ্যু কবি যে!

জহর একটু হেসে বলে, আচ্ছা বেশ, বুদ্ধিমতী শালীর কথাই মানলাম, আজ, থেকে যাচ্ছি। এবার থেকে যেদিন আসব থেকে যাব।

খুসীর সীমা থাকে না মন্দ্রার।

সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা! কিন্তু বইটা শেষ হতে কদ্দিন লাগবে বললেন না তো!

: তা কি বলা যায়? লেখার কাজের কিছুই ঠিক থাকে না।

পরদিন চন্দ্রার মুখখানা ম্লান দেখায়। জহর তখনও ঘুমোচ্ছিল। অনেক দিন পরে স্বামীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, রাত জাগার জন্য মুখ শুকনো দেখাতে পারে, ম্লান দেখাবে কেন?

সকলের তাকাবার রকম দেখে চন্দ্রা নিজে থেকেই বলে, বই লেখা সত্যি বড় বিশ্রী কাজ। কেমন অন্যমনস্ক ভাব, সারারাত উস্‌খুস্‌ করেছে, ঘুমোতে পারে নি—প্রায় শেষ রাত্রে ঘুমিয়েছে। একটা কিছু অসুখ বিসুখ না হয়ে যায়!

মন্দ্রা এক সময় চন্দ্রাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি রকম অন্যমনস্ক ভাব দিদি? তোকে বুঝি আদর টাদর করে নি?

: আরে না, ওসব নয়। কতবার তো বলেছি আমাদের মধ্যে ওসব গোলমাল কিছু হয় নি। বই লেখা নিয়ে হয়েছে যত ঝন্‌ঝাট্‌।

দিন সাতেক পরে শনিবার বিকালে ছোট একটি স্যুটকেশ নিয়ে জহর আসে এবং দু'রাত্রি থেকে যায়।

পরদিন সকালে আরও শুকনো, আরও ম্লান দেখায় চন্দ্রার মুখ।

মেজাজও যেন একটু খিটখিটে হয়ে গেছে।

: কালও ঘুম হয় নি জহরের?

: ঘুমিয়েছে—ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে।

ওষুধটা যে মদ সেকথা চন্দ্রা আর খুলে বলে না।

জহর মাঝে মাঝে আসে দু'একটা দিনরাত্রি থেকে চলে যায়—কিন্তু এতটুকুতে কেউ খুসী নয়।

প্রায় বছর পূর্ণ হতে চলল ভালবেসে বিয়ে করা বৌকে বই লেখার অজুহাতে বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছে—একি অদ্ভুত ব্যাপার !

চন্দ্রা শুকিয়ে যাচ্ছে, দিন দিন আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছে তার মেজাজ।

মন্দ্রার উপরেই তার মেজাজটা যেন বেশীরকম বিরূপ।

মন্দ্রা যে অশান্ত তড়বড়ে মেয়ে এটা যেন তার সহ্য হচ্ছে না, উপদেশ দিয়ে ধমক দিয়ে শাসন করে, সে যেন তার প্রকৃতি সংশোধন করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

মন্দ্রার মেজাজও বিগড়ে যায়, দুই বোনে উঠতে বসতে ঝগড়া বাধে।

চন্দ্রা বলে, আগেকার দিনকাল নেই—জানিস্ তো? এভাবে বিগড়ে যাস্ নে ছোট বোনটি আমার !

: এভাবে বেলো না দিদি। ছোট বোনটিকে অন্য সময় আদর কোরো। যা বলতে চাও—সোজা করে স্পষ্ট ভাষায় বলো।

: কেন তুই যখন তখন বাইরে চলে যাবি, হৈ চৈ করে বেড়াবি, পড়াশোনায় মন দিবি না? বড় হোস্ নি? এত অবাধ্য হবি কেন?

: তুমিই বলো কেন? এত উপদেশ ঝাড়বে কেন তুমি? মা বাবা থাকতে আমার জন্য তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন? এত টাকা খরচ করে বাবা তোমার বিয়ে দিলেন, এখনো দেনা শোধ দিতে পারেন নি—জামাইবাবু কেন তোমায় নেয় না, কেন বাপের বাড়ী ফেলে রাখে? আমার পিছনে না লেগে, এসব 'কেন' নিয়ে মাথা ঘামালেই হয় !

সশব্দে গালে চড় পড়ত।

মন্দ্রা জানত, তাই দু'হাতে দিদির হাতটা পাকড়ে নিয়ে ঠোঁট উল্টে বলে, মন খুলে যদি কথাই না কইতে পারিস্, এত উপদেশ ঝাড়তে কেন আসিস্ দিদি?

: হাত ছাড়্।

: গালে চড় মারবি না, বললেই ছাড়ব।

: চড় মারব না।

মন্দ্রা দিদির হাত ছেড়ে দেয়।

বলে, দিদি, কেন এত বকিস্? কেন এত উপদেশ ঝাড়িস্? আমারও তো তোর মত দশা হবে দু'চার বছর পরে!

সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে মহেশের বাড়ীতে কয়েকজন লেখক লেখিকার ছোটখাট বৈঠক বসে।

মানব ও খালেকও কোন কোনদিন উপস্থিত থাকে।

নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনায়, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তর্ক বিতর্কে বৈঠক জম-জমাট হয়ে ওঠে—শুধু চুপচাপ বিষণ্ণ উদাস মুখে বসে থাকে চন্দ্রা—অবশ্য স্বেচ্ছায় যেদিন সে বৈঠকে হাজির থাকে।

খানিক বসে থেকে ঠিক যেন বিরক্ত হয়েই উঠে যায়। অন্য ঘরে একা একা সে কি করে কে জানে!

সাহিত্য সম্পর্কে তার বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় খুব স্পষ্ট ভাবেই।

কবি জহরের স্ত্রী, পরস্পরকে পছন্দ করে তাদের ভালবাসার বিয়ে—সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠলে তার কিনা জাগে বিতৃষ্ণা!

অপর্ণা একদিন সোজাসুজি মহেশকে জিজ্ঞাসা করে, চন্দ্রার ভাবসাব এরকম কেন? ওর কি হয়েছে?

তখন কেবল মানব উপস্থিত ছিল।

: কে জানে কি হয়েছে ! কিছুই বুঝতে পারি না—নিজেও কিছু বলে না।

: অনেকদিন এসে রয়েছে, না ?

: ন'দশ মাস হল।

: জহরবাবু নিতে চান না ?

: তেমন তাগিদ দেখছি না। বড় ভাবনায় পড়েছি মেয়েটাকে নিয়ে। নেমন্তন্ন করলে তো আসেই, জহর নিজে থেকেও মাঝে মাঝে আসে, ছ'জনে দিব্যি কথাবার্তা বলে, কিছুই বোঝা যায় না। জহর বলে একটা জরুরী কাজের নাকি খুব চাপ পড়েছে।

অপর্ণা একটু চিন্তা করে বলে, ঝগড়াঝাঁটি হয় নি মনে হয়—কোন ভুল বোঝার পালা চলছে !

মানব এতক্ষণ মুখ বুজে ছিল, এবার সে বলে, ভুল বোঝা নয়—অমিল। বিয়ের আগে ভুল বোঝা ছিল, এখন সেটা অমিল দাঁড়িয়েছে।

অপর্ণার মুখের ভাব দেখে মানব একটু লজ্জা পায়, বলে, আমার অবশ্য এসব বিষয়ে কিছু বলা সাজে না—

অপর্ণা বলে, সাজে—তবে অভিজ্ঞতা নেই কি-না তাই ভুল বোঝা আর অমিলে তফাত করে বসছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝা মানেই অমিল। ছোটখাট বিষয়ে অমিল থাকলে এসে যায় না—বরং থাকাই ভাল, আসল মিলটা তাতে আরও জমে। বড় ব্যাপারে বা গোড়ার ব্যাপারে অমিল থাকলেই মুস্কিল হয়। কিন্তু চন্দ্রার তো জানা উচিত কোথায় মিলছে না ?

মহেশ চিন্তিতভাবে বলে, চন্দ্রা ঠিক করে কিছুই বলতে পারে না। ইচ্ছা করে বলে না কি-না কে জানে ! শুধু বলে যে কোনরকম মনোমালিন্য হয় নি, কিছুই ঘটে নি, আপনা থেকে জহর নাকি কেমন বদলে গেছে,

কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে। সেটা অবশ্য আমরাও বেশ ধরতে পারি বুঝতে পারি।

: চন্দ্রা কি জহরকে অনাদর করে?

মহেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

: যার আদর কমে যাওয়ায় মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে, খিটখিটে মেজাজ হয়েছে, তাকে অনাদর করে বলি কি করে? এখন আর তেমন নেই কিন্তু আগে জহর এলে খুব খুশীই হত। জহরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— সেও ঠিক চন্দ্রার কথাই বলে। কিছুই নাকি ঘটে নি, চন্দ্রাই নাকি কি রকম বদলে গেছে—কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে।

অপর্ণা বলে, এ তো ভারি সমস্যার কথা হল! এ বলে ওর ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে, ও বলে এর ছাড়া-ছাড়া ভাব এসেছে। তা'হলে আর সন্দেহ কি যে একটা গুরুতর ভুল বোঝার পালা চলেছে?

মানব বলে, আমি আবার মুখ খুললাম। এরকম না হলে আর সমস্যা থাকত কিসের? আমি খানিকটা ব্যাপার বুঝেছি। খুব মোটা আর বাস্তব ব্যাপারে অমিল দেখা দিয়েছে—বোঝাপড়া করে নিতে দু'জনে লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। দু'জনেই ভাবছে, যদি আরও খারাপ হয়, যদি আরেকজনের মন আরও বিগড়ে যায়!

অপর্ণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানবের মুখের দিকে তাকায়, একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, আপনার বয়স বেশী নয়, বিয়েও করেন নি—আপনি এত সব জানলেন কি করে?

: এ সব জানা আর কঠিন কি? দু'জনেই রোমান্টিক প্রকৃতির, গোড়ায় দিব্যি মিল ছিল, ধীরে ধীরে অমিল দেখা দিল। এ বলে ও বিগড়ে গেছে, ও বলে এ বিগড়ে গেছে—দু'জনের একটা বাস্তব সম্পর্কের ব্যাপার ছাড়া এরকম হতে পারে?

অপর্ণা সোজা প্রশ্ন করে বসে, কি ধরণের বাস্তব সম্পর্কের কথা বলছেন ?

: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক ! ঠিক কি ভাবে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনুমান করা যায় না—কিন্তু এটুকু বোঝা যায় যে এই সম্পর্ক নিয়ে তুজনের ধারণা তু'রকম, কিছুতে খাপ খাচ্ছিল না। তু'জনেই কিছুদিন তফাতে থেকে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করবে ভাবছিল। জহর চন্দ্রাকে এখানে রেখে গেছে, চন্দ্রাও আপত্তি করে নি। জহর আর এখন নিয়ে যাবার কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না, চন্দ্রাও কিছু বলতে পারছে না। এখন তবু ভাবটা আছে, খোলাখুলি ঝগড়া নেই—তু'জনেই ভয় পাচ্ছে, একটা যদি বিশ্রী রকম মনোমালিন্য হয়ে যায়, সম্পর্কটা আরও বিগড়ে যায়।

অপর্ণা একটু ভেবে মানবকে বলে, আমি এদিকে চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে দেখি, আপনি জহরবাবুর সঙ্গে আলাপ করুন না ? মহেশবাবুকে সব খুলে বলতে জহরের সঙ্কোচ হয়েছে, আপনাকে হয়তো খুলে বলতেও পারেন আসল ব্যাপারটা কি।

: চটে গিয়ে চড়িয়েও দিতে পারেন !

: সে ভাবে বলবেন কেন ? এই বয়সে সংসার এত বোঝেন, একটু কায়দা করে আলাপ করতে পারবেন না ? আপনাদের জানা শোনাও তো কমদিনের নয়। খুলে বলতে না চাইলেও কথাবার্তা থেকে খানিকটা হয়তো বুঝতে পারবেন।

মন্দ্রা কখন এসে চুপচাপ আড়ালে বসে পড়েছিল, কেউ খেয়াল করে নি। হঠাৎ সে ফোঁস করে ওঠে, অনাদর ? অনাদর না ছাই। দিদিই বরং আমল দেয় না জামাইবাবুকে।

মহেশ বলে, তুই এখানে কেন ? এসব কথায় কেন ?

মন্দ্রা বলে, আমি জানতে বুঝতে চাই। তু'দিন বাদে আমারও তো দিদির মত দশা হবে।

এর পরে আর কথা নেই। মন্দ্রার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করেই তাদের কথা চলে।

চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলে অপর্ণা খানিকটা ধরতে পারে কিন্তু ঠিক কি ব্যাপারটা যে চলছে দু'জনের মধ্যে বুঝতে পারে না।

হাসিমুখে একটু তামাশার সুরে সে জিজ্ঞাসা করে, একসঙ্গে শোয়া হত না দু'জনের ?

চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে যায়।

: হত না ? কি যে বলেন !

: তুমি জান না ভাই, ওই নিয়েই কত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি দাঁড়িয়ে যায়—আমার নিজের বেলা ঘটেছিল কি-না, আমি জানি। একটু থেমে একটু হেসে আবার সে জিজ্ঞাসা করে, শুধু ভদ্রতা রক্ষার একসঙ্গে শোয়া হত না তো ?

: ধেৎ !

তবে ? অপর্ণা ভাবনা চিন্তায় কুল-কিনারা পায় না। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছে মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে—রক্ত মাংসের দুটো মেয়ে পুরুষের সম্পর্কের গণ্ডগোল বুঝতে তার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে ! কেন তবে এমন অমিল মাথা তুলেছে দু'জনের মধ্যে যে, পরস্পরকে ভালবেসেও দু'জনে তফাতে সরে আছে—মন্দ্রার ধমকানি খাওয়ার আগে, শ্বশুরবাড়ী এসে একটা রাত কাটাতেও জহর ছ' সাত মাস রাজী হয় নি ?

: আগে জহরবাবু এলে রাত্রে থাকতে চাইতেন না কেন ?

: আমি কি জানি ওর কি হয়েছে ?

: থাকতে বলতে না ?

: বলতাম না ? সবাই বলত, আমিও বলতাম। একটা নাকি বড়

বই ধরেছে, রাত জেগে লিখছে— মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে বইটাতে। এটা নাকি ওর সেরা বই হবে।

: ছাই হবে। বৌয়ের জন্য এদিকে প্রাণ খাঁ-খাঁ করছে চব্বিশ ঘণ্টা, সেরা বই লেখা হবে!

চন্দ্রা ম্লান হেসে বলে, তাই নাকি হচ্ছে, আমি কাছে না থাকাতেই হচ্ছে। আমার জন্য খুব ব্যাকুলতা জাগে, লিখতে বসলে ওটাই নাকি লেখার ঝোঁক দাঁড়িয়ে যায়, তর-তর করে কলম চলে।

: হতেও পারে! লেখকদের কত রকম পাগলামিই যে থাকে। একটু ছিট না থাকলে বোধ হয় লেখক হওয়া যায় না।

: আপনিও তো লেখিকা!

: আমি তো গল্প উপন্যাসও লিখি রসালো প্রবন্ধের মত করে! কাজের কথা, দরকারী কথা লিখি।

তফাত কি ?

এ তফাতটুকুও বোঝ না? আমি কি কবিতা লিখি? আমি লিখি প্রবন্ধ।

মানব ভেবেচিন্তে জহরের সঙ্গে কায়দা করে কথা বলার চেয়ে সরলভাবে সোজাসুজি কথা বলাই ভাল মনে করে।

সুযোগ জোটে কয়েকদিন পরেই। বই-এর দোকানে জহরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

: চা খাওয়াবেন চলুন!

চায়ের দোকানে বসে বলে, আমরা দু'জনেই লেখক কবি—আমাদের মধ্যে কথার মারপ্যাচ চলবে না কিন্তু। সোজাসুজি বলি। মহেশবাবুর বাড়ীর সকলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আপনার স্ত্রীর মুখে তো কেউ হাসি দেখতেই পায় না। কীরকম রোগা হয়ে গেছে সে-তো আপনি মাঝে মাঝে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসেন।

জহরের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, সে ঠোঁট কামড়ায়। মানব একটু ভড়কে গিয়ে ভাবে, লেগেছে!

শুরুতেই চটে গেল নাকি!

সে আবার বলে, যদি কিছু হয়ে থাকে—মিট্‌মাট্‌ করে নিন না? চন্দ্রা আমার বোনের মত, আরও যদি জের টেনে চলেন ও বেচারা ভেঙ্গে পড়বে, সাংঘাতিক কিছু করে বসবে। চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আর দু'এক মাসের বেশী টানতে পারবে না, বিশ্রী কিছু করে বসবে। হয় তো খবরের কাগজেও ছাপা হয়ে যাবে।

মানব ভাণ করে নি, বলতে বলতে তার মুখ এমন ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল যে চেয়ে দেখে জহর হঠাৎ কিছু বলতে পারে না।

মানব বলে, জানেন তো আমি চ্যাংড়ামি পছন্দ করি না! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার—তার মধ্যে আমার যে নাক গলানো চলে না সেটা আমি খুব ভাল করে জানি। এতদিন তাই চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু চন্দ্রা এবার সাংঘাতিক কিছু করে বসবেই জেনে একেবারে মরিয়া হয়ে নাক গলাতে চাইছি—আপনি নয় দুটো গাল দেবেন, তবু চেষ্টা তো করা যাক বিপদ ঠেকাবার। যাই হয়ে থাক, আমাদের খুলে বলুন, মিটিয়ে দিচ্ছি। গোলমালটা কি নিয়ে?

জহর মাথা নাড়ে, গোলমাল কিছু নয়, আপনারা বুঝবেন না, মেটাতেও পারবেন না।

চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলে, আমরা লেখক কবি—সোজাসুজি কথা বলব বলছিলেন? তাই বলছি। যদি বলেন গোলমাল—গোলমালটা আমার স্বভাবের। দোষটা আমার—আমার প্রকৃতির। চন্দ্রাকে কাছে রাখতে আমার ভয় করে—কবে মন ভেঙ্গে দেব, সারা জীবনের মত সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিজের স্বভাবটা একটু শুধরে নেবার চেষ্টা করছি।

: ও!

: কবি কিনা, উঁচু সুরের প্রেমের কথা লিখি, স্বভাবটা তাই দাড়িয়েছে উল্টো। সংযমের বালাই নেই, একটু ভদ্র আর সংযত থাকতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

: ও!

: সবাই ভাবছে, আমিই বুঝি খেয়ালের ঝোঁকে চন্দ্রার মনে কষ্ট দিচ্ছি। আমার দোষ আমি বুঝি—মোটেই এটা খেয়াল বা পাগলামি নয়। মনটা একেবারে বিগড়ে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল। মাঝে মাঝে যাই, চিঠিপত্র লিখি, জানাবার চেষ্টা করি যে আমার ভালবাসা একটুও কমে নি—ও আমার কাছে না থাকার জন্য বইটা ভাল হচ্ছে, ওর জন্য প্রাণের ছট্‌ফটানি লেখার প্রেরণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু উপন্যাস লিখতেই পারছি না—তবে কয়েকটা গল্প খুব উৎরে গেছে। এ রকম গল্প আগে কখনো লিখতে পারি নি।

জহর একটু হাসে।

: উৎরে গেছে মানে আমার ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উৎরে গেছে। ওকে একটু খুসী রাখার জন্য বড় বই লেখার কথা বলে এসে এখন পড়েছি মহা বিপদে। যদি একদিন এসে দেখতে চায় বই কতটা লিখেছি, কি রকম লিখেছি—মুস্কিলে পড়ে যাব।

মানব তার মুখের ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল, জহরের মুখে উদ্ধত ভাবের চরম নির্ব্বিকারতা। সে যে বিনীত আর সংযত ভাবে কথা বলছে, সেটা যেন তারই উদারতা।

মানব ধীরে ধীরে বলে, কিন্তু চন্দ্রাকে তো সেরকম কোল্ড টাইপের স্ত্রী বলে মনে হয় না! তা ছাড়া সংযম নিয়ে কীএত ভাবনা আপনার? বিয়ের পর কিছুদিন একটু বাড়াবাড়ি হলে কি এসে যায়? আপনা থেকেই সামঞ্জস্য হয়ে যায়। আমি নিজে অবশ্য বিয়ে করি নি, কিন্তু পাঁচজন বন্ধুর কাছে শুনি তো ব্যাপার সব! স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারের বিজ্ঞানটা তো

পড়েছি তন্ন তন্ন করে। অভিজ্ঞতার অভাবও নেই—ঘর সংসার পেতে বসার আয়োজন করিনি—শুধু এইটুকু।

: জহর মাথা নাড়ে, আমার ব্যাপার জানেন না।

: জানিয়ে দিন না?

: চন্দ্রা কোল্ড নয়—নর্ম্যাল। আমি মানুষটাই নীচ।

নীচ! প্রেমের ব্যাপারে চন্দ্রার তুলনায় নিজেকে জহর নীচ মনে করে। ব্যাপার তো তবে সহজ নয়!

: বিয়ের পর বুঝি নিজেকে অ্যাবনর্ম্যাল মনে হয়েছে—আগে একেবারে কিছুই জানতেন না?

: না—ঝোঁকটা ছিল মানসিক, ভাবতাম এটা আমার তেজী পুরুষত্বের লক্ষণ। অসংযমের ঝোঁকটা এত জোরালো জানলে বিয়ের আগেই নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করতাম। এরকম ঝন্‌ঝাট্ হত না।

চায়ের দোকান,—ভিড়ের সময় না হলেও আশেপাশে দু'চারজন লোক আছে। একটু নীচু গলায় কথা বললেও যেভাবে যে সুরে সে কথা বলে, যেভাবে আবেগে তার গলা কেঁপে যায়, তাতে তার মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হয় না মানবের।

: চন্দ্রাকে খোলাখুলি বললেই পারেন? একা একা নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা না করে দু'জনে মিলে মিশে পরামর্শ করে করলে, আরও ভাল হয় না? স্বামীর যদি কোন অসুখ থাকে, স্ত্রী নিজের গরজেই সেটা সারাতে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে।

জহর মাথা নাড়ে—আজ বললে বুঝবে অন্য রকম। নিরুপায় হয়ে হয়তো সয়ে যাবে, সাহায্যও করবে—কিন্তু এক বিন্দু শ্রদ্ধা কি আর থাকবে আমার ওপর? ভদ্রঘরের মেয়ে, একটা রুচিবোধ আছে—আমার প্রকৃতি কিরকম জঘন্য, কিরকম পশুর মত ওকে চাই—জেনে, আর কি আমায় মানুষ ভাবতে পারবে?

মানব ধীরে ধীরে বলে, বুঝলাম ব্যাপার। আমি যদি বলি এর মধ্যে অনেকটাই আপনার কল্পনা, আপনার কিছুটা দোষ থাকলেও আসল দোষটা আপনার স্ত্রীর—আপনি নিশ্চয় চটে যাবেন! নাঃ, দোষ বলব না—আপনারও দোষ নেই, চন্দ্রারও দোষ নেই। আপনারা শুধু ভুল করেছেন। সামলে নেবার জন্য যে চেষ্টা আপনারা করেছেন তার প্রশংসা করতে হয়, ভুল উপায়ে করলেও সিরিয়াসলি চেষ্টা করাটাই মস্ত বড় গুণের কথা। খেওয়ো খেওয়ি না করে আপনারা দুজনেই সমাধান খুঁজছেন।

জহর বলে, বিয়ে করলে, আমার মত ধাত হলে, টের পেতেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে এসেছি, তবু যেটুকু টের পেয়েছে তাতেই চন্দ্রা ভড়কে গিয়েছিল। সাধে কি তাড়াতাড়ি ওকে বাপের বাড়ী সরিয়ে দিয়েছি?

: বেশী ড্রিঙ্ক করছেন শুনলাম?

: একটু সামলে নিচ্ছি!

মানব মনে মনে বলে, ড্রিঙ্ক করার জন্যই যে ড্রিঙ্ক করে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, এ অবস্থায় নিজেকে সামলাবার জন্য ড্রিঙ্ক করে তুমি নিজেকে সামলাবে!

মানব জানে, লেখকের বিশেষ অবস্থায় দু'এক চুমুক ড্রিঙ্ক দরকার হয়, ওষুধের মত দরকার হয়—সকলের অবশ্য নয়।

এ এমন ধরণের কাজ যে তার সঙ্গে মানুষটার ধরণের একটা যোগাযোগ ঘটলে মাঝে মাঝে স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থা, ব্রেণের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ডাক্তারি শাস্ত্রের হিসাব নিকাশের বাইরের একটা অদ্ভুত কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল দু'এক চুমুক খাওয়া।

এ অবস্থাটা আসে অনিয়মিত ভাবে, ওষুধের মত খেলে অভ্যাস জন্মে যাবার কারণ থাকে না।

লেখার জন্য নেশা দরকার হয়—এটা স্রেফ বাজে কথা। নেশা কোন কাজেই লাগে না লেখার। কোন লেখক যদি নিয়মিত নেশা করে—অন্য পাঁচজনের মত নেশার জন্যই করে।

সারা সপ্তাহ দেহ ক্ষয় করে খেটে হপ্তা পাবার দিন, কলকারখানার কোন কোন নিরক্ষর মজুর যে কারণে দু'একজন সাঙাতের সঙ্গে এক দেড় টাকার বেশী খেয়ে পরদিন বুকভরা আপশোষ নিয়ে ঘুম থেকে জাগে!

৬

সামান্য সাধারণ তুচ্ছ ছোট ছোট বিষয়ে ভুল ধারণাই পিছানো দেশের মানুষের ক্ষতি করে বেশী।

সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে জেনেও মানুষ পরম সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু শিশুকে টিকা দিতে নেই একথা জানার ফলে অনেক ভবিষ্যৎ জীবন আরম্ভ হতে না হতে শেষ হয়ে যায়। বড় বড় নাম করা রোগে মানুষ যত না ভোগে আর মারা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক, অনেক কাল ধরে অনেক বেশী কষ্ট পায় আর অকারণে অকাল মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

জীবনের খুঁটিনাটি ছোট ছোট বিষয়ে ভুল ধারণাই মানুষের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ।

বড় বড় ব্যাপারে হাল ধরে আছে বড় বড় মানুষেরা, ছোটখাট সাধারণ মানুষকে বড় ভুল করার সুযোগ তারা দেয় না। বড় ভুল করাটা তাদেরই একচেটিয়ে অধিকার।

বড় বড় ভুল সংসারে ক'জন মানুষ ক'বার করে ? অসংখ্য দৈনন্দিন ছোট ছোট ভুল মানুষ হরদম করে চলেছে। অনেক বড় বড় ভুলের শোচনীয় জের—অবশ্য বড়র পিছু ধরা আধা বড় মানুষকে সারাজীবন টেনে চলতে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে ফলটা মারাত্মক হলেও ধীরে ধীরে মানুষ সামলে উঠতে পারে।

তা'ছাড়া, ভুল সম্বন্ধে মানুষের আত্মরক্ষার একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে, সেটা হল তার ভীরুতা। লাভের আশাতেও বড় কিছু করতে মানুষ ভয় পায়, ইতস্ততঃ করে। যে-সব বৃহৎ ব্যাপারের ফলাফল সুনিশ্চিত সে সমস্ত ব্যাপারেও মানুষ জোরালো অথবা মৃদু দ্বিধার অস্বস্তি বোধ করে, কোন কারণে ফলাফলটা যদি অন্য রকম হয়ে যায় !

কারণটা খুবই সহজবোধ্য।

বড় ব্যাপারের সুফল এবং কুফল দুটোই বড় রকমের হয়।

কিন্তু ছোট ছোট ব্যাপারকে মানুষ অতটা গ্রাহ্য করে না, যদিও ফলাফল জমা হতে হতে, একদিন ফলাফলের দিক থেকে বড় ব্যাপারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে !

অল্প পরিমাণে আফিম খেলে উপকার হয় এই ধারণার বশে আফিমের নেশার দাসত্ব মেনে নিয়ে অনেকে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অকর্ম্মণ্য জীবন কাটিয়ে দেয় ; কিন্তু তিলে তিলে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার অভ্যাস সঞ্চয় করে বাস্তব জগতে বেঁচে থাকার পক্ষেই নিজেদের যারা অনুপযুক্ত করে ফেলে, তাদের তুলনায় আফিমখোরেরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। আফিমের নেশা আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নষ্ট করে নি, কিন্তু স্বপ্ন দেখার নেশা জাতির-পর-জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

অথচ, মুস্কিল এই, জেগে জেগে একটু একটু স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাকে মানুষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য করে নিয়েছে !

স্বপ্ন যে কল্পনা নয়, একথাটা অনেকের জানা নেই। কল্পনা মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রগতির জন্য তো বটেই!

কিন্তু স্বপ্ন-দেখা একটা রোগ মাত্র।

বোধ হয়, জগতের সবচেয়ে ব্যাপক আর সবচেয়ে মারাত্মক আর সবচেয়ে কঠিন রোগ।

যাদের দেখলেই স্বপ্ন-বিলাসী বলে চেনা যায়, যারা অলস অকর্মণ্য পর-মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনের সমস্ত অবস্থাতে দারুণ অশান্তির মধ্যে জীবন যাপন করে এবং দশজনের জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে, সংসারের অধিকাংশ বীভৎস পাপই যাদের দ্বারা ঘটে থাকে, যারা চুরি ডাকাতি গুণ্ডামিকে জেনে রেখেছে জীবনের রাজকীয় জীবননীতি, তাদের বাদ দিলেও স্বপ্ন-রোগের বহু রোগী জগতে আছে।

ভাব-প্রবণতা স্বপ্ন-রোগের মত মারাত্মক নয়।

কারণ ভাব-প্রবণতায় আজও আদর্শবাদিতার রসায়ন মেশানো আছে। কোন আদর্শ না আঁকড়ে এ জগতে কেউ আজও ভাব-প্রবণ হতে পারে না।

যারা ভাব-প্রবণ, অনুভূতির জগতে অসাধারণ ও অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি আর উপভোগ করার জন্য, চিন্তাশক্তির সাহায্যে কতকগুলি ভুল ধারণাকে নিয়ে তারা নাড়া চাড়া করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসমস্ত ভুল ধারণা সাধারণ বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বাস্তবতাকে বিশেষ বিকৃত না করে বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করলে যে ভুল ধারণা জন্মায়।

যেমন নর-নারীর মিলন সম্পর্কে ভাব-প্রবণ নর-নারীর কল্পনা। এই কল্পনার মধ্যে অনেক ভুল ধারণা থাকে, অনেক মিথ্যা থাকে, অনেক অসম্ভব প্রত্যাশা থাকে,—তবু নর-নারীর মিলনের বাস্তবতাই এই কল্পনার ভিত্তি। এই রকম ভাব-প্রবণতার জন্য নর-নারীর মিলিত জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সে অশান্তি কদাচিৎ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে যত বড় বীভৎস অপরাধই স্বপ্নরোগীরা করুক, আত্মসমর্থনের অজস্র যুক্তি সর্বদাই এদের ভুলধারণার ভাণ্ডারে মজুত থাকে। এই সব যুক্তি মাখিয়ে কদর্যতাকে এরা মনোহর রূপ দেয়, হীনতাকে দাঁড় করাতে পারে মহত্ত্ব হিসাবে এবং মনে প্রাণে তাই বিশ্বাসও করে।

কয়েকটা টাকার জন্য মানুষ খুন করেও এরা অনায়াসে ভাবতে পারে যে, বীরত্ব আর পৌরুষের আদর্শের জন্য ফাঁসির বিপদ বরণ করেছে এবং একথা ভেবে রীতিমত গৌরব বোধ করতে পারে।

মানুষ খুন করার নামে যার শিহরণ জাগ্‌বে, রাজার আইন, সমাজ ও ধর্মের আইন, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যাওয়ার কল্পনা করাও যার পক্ষে বিচার বিবেচনা করে দেখার ব্যাপার, সেইসব তথাকথিত সাধারণ ভাল মানুষের জীবনে স্বপ্ন-অভিব্যক্তি বড়ই বিচিত্র। হাজার হাজার নর-নারীর দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে এই বিজাতীয় মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সচেতন অভিযান, সাধারণ লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

ধনদাস আর কালাচাঁদের ভাব-প্রবণতার কি আকাশ পাতাল তফাত দেখা যাচ্ছে! একজন যেন ভাব-প্রবণতাকে জয় করে চলেছে, আরেক জন স্বপ্ন-প্রবণতা নিয়ে খেলা করছে।

বাইরে যাবার সময় ধনদাস চৌকাটে হোঁচট খেল।

ধনদাসের ধারণা, কোন কাজে যাবার সময় হোঁচট খেলে কাজটা সফল হয় না। একটু বসে, স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে, ছেলেমেয়েকে একটু আদর করে কয়েক মিনিট পরে ধনদাস আবার বাইরে গেল।

কুসংস্কার না বলে ধনদাসের এই ধারণাকে স্বপ্ন-রোগের পর্যায়ভুক্ত ভুলধারণা হিসাবে গণ্য করা চলে। এই একটি ভুলধারণার সঙ্গে ধনদাসের মনের আরও কত যে ভুল ধারণা একসূত্রে গাঁথা হয়ে আছে!

হোঁচট খাওয়া-না-খাওয়ার সঙ্গে ধনদাসের মনের এই সমস্ত ভুল

ধারণার কেবল এইটুকু সম্পর্ক যে, এই উপলক্ষে তার ব্যর্থতার ভীতিটা তীব্রতর হয়ে উঠল, নিজের নিরন্তর দুরদৃষ্টের জন্য মানসিক বিষাদ ও অসহায় ভাবটা নাড়া খেল, ইত্যাদি। হোঁচট খাওয়ার ফলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় নি—স্বপ্ন-রোগে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকার ফলে হোঁচট খাওয়াকে একটু কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র।

কথাটাকে সহজ করা সম্ভব হবে।

ছোট বড় যে কাজেই হাত দিক তাতেই' তার সাফল্যলাভ করা শুধু উচিত নয়, সেটাই জগতের অন্যতম অপরিবর্তনীয় নিয়ম—এই স্বপ্ন মনকে বশ না করলে কেউ ভাবতেও পারে না, বেরোবার সময় হোঁচট কোঁচটের বাধা-পড়া ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার ইঙ্গিত। আগামী ব্যর্থতার এই অস্বাভাবিক অপ্রমাণিত স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে ধনদাস মানে, কিন্তু সায়েব সুবোদের হিসাব মত তাদের হুকুমে তাকে যে এটা মানতে হয় এটা একেবারেই সে স্বীকার করে না।

ফলে, ন্যায্যতঃ প্রাপ্য সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম করাটা মহেশ, ধনদাস আর তার পেয়ারের আত্মীয়-কুটুম্বরা বোকামি মনে করে। সহজে ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধারের প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

ব্যর্থতা ধনদাসকে বড় বেশী কাবু করে দেয়।

ব্যর্থতার ভয়ে বড় কাজের প্রেরণা আসে না—ছোট কাজে আলস্য জাগে, অবহেলা জাগে।

অন্য লোকে কষ্ট পাক আর নিজে সে সুখ ভোগ করুক—ধনদাস এই স্বপ্ন-রোগে ভুগছে।

অর্থাৎ ধনদাস মানুষটা হিংসুক আর স্বার্থপর। যেখানে সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্ন আছে সেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে বাধ্য। কারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয়ে একা ধনদাসের কর্তৃত্ব থাকলে ব্যর্থতার প্রশ্নই ওঠে না। যিনি অথবা যাঁরা নিজেদের লাভ লোকসানের হিসাব করে ধনদাসের

লাভের কাজটা হতে দেবেন না, ধনদাস তাঁদের হিংসা করে এবং তাঁদের ক্ষতি করে নিজের লাভ চায়।

সমস্ত বিরোধিতার ক্ষেত্রেই অবশ্য মানুষ প্রতিপক্ষের ব্যর্থতা এবং নিজের সাফল্য কামনা করে, নতুবা বিরোধিতার কোন অর্থই হয় না।

কিন্তু ধনদাসের কামনার রূপ অন্যরকম। বিরোধিপক্ষের সাফল্য ধনদাসের কাছে অসঙ্গত, এটা যেন দেবতার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব। সাফল্যের পথে যে বা যারা বাধা-স্বরূপ আসবে ছলে-বলে-কৌশলে তাদের নিপাত করা জীবন সংগ্রামের অন্যতম বাস্তব-নীতি।

জহরকে সে যে কি রকম ভড়কে দিয়েছিল মানব সেটা টের পায় সকাল বেলা তার বস্তির ঘরে জহরের আবির্ভাব ঘটায়।

আত্তি এসে জানায় : একজন ভদ্দরলোক ডাকছেন।

মানব কলম চালিয়ে যেতে যেতে মুখ না তুলেই বলে, ভদ্দরলোককেই এখানে নিয়ে এসো না ? আমার তো খোলা দরজা।

: একবার মুখ তুলেও তাকাতে নেই বুঝি !

কলম রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আত্তির আহত অভিমানের মুখভঙ্গি দেখে মানব প্রায় তাজ্জব বনে যায়।

শুধু মুখ না তুলে কথা বলার জন্য আত্তিরও এমন অপমান বোধ হয়, রাগ হয় !

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, আমি রাগ করেছি। তোমার দিকে তাকাবও না, তোমার সাথে কথাও বলব না।

আত্তি একটু হেসে চলে যায়।

: ভদ্দরলোককে ডেকে কাজ নেই আত্তি—আমিই যাচ্ছি।

জহরকে দেখেই মানবের মনে পড়ে যায়, তার মুখে চন্দ্রা এখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছে এবং যেকোনদিন সাংঘাতিক কিছু করে বসতে পারে শুনে, জহরের মুখের ভাবটা কি রকম হয়েছিল !

আতঙ্ক জহরকে আজ তার কাছে টেনে এনেছে !

জহরের মুখখানা প্রায় কাঁদ কাঁদ ।

কোনরকম ভূমিকা না করেই সে বলে, চন্দ্রার ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আপনি মিটমাট করে দেবেন বলেছিলেন !

মানব বলে, আমি একা নই, আমরা—আমরা মিটমাট করে দেব বলেছিলাম। চলুন চায়ের দোকানে গিয়েই বসি ।

জহরকে সে রবির দোকানে নিয়ে যায়। এত দামী শাল কাঁধে এমন সুবেশধারী একজনের সঙ্গে মানবকে তার দোকানে ঢুকতে দেখে রবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে ।

জহর বলে, কাল চন্দ্রাদের ওখানেই ছিলাম, ওখান থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। আপনি বলেছিলেন না যে চন্দ্রার ধৈর্য বেশীদিন টিঁকবে না, একটা কিছু করে বসবে ? ভেবেচিন্তে দেখলাম, আপনার কথাই ঠিক। এ দিকটা আমার একেবারে খেয়াল হয় নি ।

: এদিকটা খেয়াল করছেন না বুঝেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। খেয়াল করলে কি আর চুপ করে থাকতেন ?

: তাই ঠিক করলাম নিয়ে আসব—তারপর যা হবার হবে। আমায় নয় অমানুষ বলে ঘেন্নাই করবে ।

: এটা আপনার ভুল ধারণা। অমানুষ ভাবা ঘেন্না করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন হল, মানিয়ে নেবার—আপনি যেমন, তেমনিভাবেই চন্দ্রা আপনাকে মানবে ; চন্দ্রা যেমন, তেমনিভাবে ওকে আপনি মানবেন। দু'জন মানুষের যেখানে দেহ-মন কোনটার ঢাকা থাকছে না, সব কিছু জানাজানি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কি ওসব হিসাব চলে ? দু'জনের দোষ-গুণ দুটোই দু'জনকে মানতে হবে ।

জহর খানিক চুপ করে থেকে বলে, ভুল করেছি বুঝলাম কিন্তু এদিকে যে মুস্কিল হল। ওকে আনার ব্যবস্থা করার জন্যই কাল গিয়েছিলাম।

চন্দ্রা পরিষ্কার বলে দিয়েছে এ জীবনে আর কোনদিন আমার বাড়ী যাবে না।

খানিক আগে দেখা আত্তির মুখ মনে পড়ে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু সে কথা বলেছিল কাগজের বুক থেকে মুখ না তুলে।

তাতেই কি রাগ আত্তির!

মানব ধীরে ধীরে বলে, চন্দ্রা তো বলবেই ওকথা। কতদিন ফেলে রেখেছেন বাপের বাড়ী! কতকাল ধরে অভিমানে ঘা দিয়ে আসছেন, অপমান করে আসছেন! মেয়েদের যে মান-অভিমান আছে এটা খেয়াল করতেও ভুলে গেছেন নাকি!

জহর চুপ করে থাকে।

মানব হেসে বলে, ক্ষমা চাইতে হবে, সাধতে হবে, ব্যাকুলতা দেখাতে হবে—আমি হলে চন্দ্রার পায়ে ধরতাম। মেয়েদের নিজেদের তো কোন মান নেই—আমরা যেটুকু দেব সেইটুকু।

জহর চুপ করে থাকে।

মানব আবার বলে, তবে হ্যাঁ, চন্দ্রাকেও একটু বোঝানো দরকার। ওর কয়েকটা ভুল ধারণাও ভেঙ্গে দিতে হবে। আমার মনে হয় অপর্ণা পারবে। ওর সঙ্গে কথা বলব।

জহর কৃতজ্ঞভাবে বলে, একটা মিটমাট যদি করে দিতে পারেন—

মানব জোর দিয়ে বলে, পারব বৈ-কি! আপনি মিটমাট চাইছেন মানেই তো মিটমাট হয়ে গেছে। তবে এটাও কিন্তু বলে রাখছি—খিটিমিটি থাকবেই।

এবার জহরের মুখেও হাসি ফোটে।

প্রাক্তন দু'টি বিবাহিতা ছাত্রী আর চন্দ্রাকে অপর্ণা তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে।

চন্দ্রা আশ্চর্য হয়ে বলে, হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন ?

: গেলেই বুঝবে। খাওয়া গৌণ ব্যাপার—আসল নেমন্তন্ন হল আমার কথা শোনার। একটা ভারি মজার গল্প শোনাব।

অপর্ণার কথা শুনে তিনটি মেয়ের মুখই লজ্জায় অল্প লাল হয়ে ওঠে।

তিনজনেই তারা অপর্ণার পুরানো ছাত্রী, বয়সে তারা অপর্ণার ছোট বোন সন্তানবতী সুমিতার চেয়ে অনেক ছোট, তিন জনেরই বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। অপর্ণার প্রথম ছেলেটির বয়স হবে সাত আট বছর, যদিও তাকে দেখে আজও অনুমান করা যায় না বয়স তার ত্রিশের দিকে এগিয়ে গেছে এবং বিবাহিত জীবন সে যাপন করছে দশ বছরের বেশী।

অবশ্য অপর্ণার কথা শুনে মুখ যে তাদের আজই প্রথম লাল হল তা নয়। তাদের এবং আরও অনেকের মুখ অনেকবার অপর্ণা এরকম আরক্ত করে দিয়েছে। মুখের যেন তার আটক নেই। যে কথা সমবয়সী সখীর কাণে কাণে বলতে পর্যন্ত সঙ্কোচ হয়, পাঁচজনের সামনে অপর্ণা অনায়াসে অতি স্পষ্ট ভাষায় তা বলে বসে !

তবু অপর্ণাকে এরা প্রায় সকলেই শ্রদ্ধা করে।

কারণ, যাই বলুক অপর্ণা, অনাবশ্যক বাজে কথা সে কখনো বলে না তার কথা হাল্কা ইয়ার্কি নয়। জীবনের অতি বাস্তব গুরুতর সমস্যা নিয়ে সে কথা বলে। সঙ্কোচহীন স্পষ্টতার সঙ্গে আলোচনা করার বিকৃত সুখ উপভোগ করাটা যে তার উদ্দেশ্য নয়, সেটাও স্পষ্টই বুঝা যায়। এ-সব বিষয়ে সবরকম ন্যাকামিকে সে সব সময় তেজের সঙ্গে এড়িয়ে চলে।

আকারে ইঙ্গিতে, নানারকম হাস্যকর ঢং করে যে সব কথা বলা চলে, স্পষ্ট ভাষায় তা বলে ফেলাই কি সহজ আর সুবিধাজনক নয় ?—অপর্ণা এই মত পোষণ করে।

তাই অপর্ণার কথা শুনে পাড়ার অনেক মেয়ের দেহে

অনেকবার রোমাঞ্চ হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের রক্ত-মাংসের দেহ সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার আর ভুল ধারণাও তাদের কেটে গেছে, অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানও তারা অর্জ্জন করেছে। অপর্ণার চমকপ্রদ কথাবার্তা শুনেই যে পাড়ার একটি নব-দম্পতীর অশান্তিময় ভাঙ্গা জীবন আবার জোড়া লেগে সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, এ খবরও অনেকে জানে। কারণ এই দম্পতীটি অপর্ণার এক জোড়া অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছে এবং নিঃসঙ্কোচে নিজেরাই বন্ধু ও বান্ধবীদের কাছে প্রকাশ করেছে যে, কত তুচ্ছ কারণে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল এবং কত সহজে অপর্ণা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শুধু তাদের সস্তা ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে!

চন্দ্রা পরদিন স্বামী-গৃহে যাবে।

তাকে লক্ষ্য করেই অপর্ণা কথা বলছিল এবং লজ্জায় সঙ্কোচে সে-ই কাতর হয়ে পড়েছিল সবচেয়ে বেশী। তবু অপর্ণা গ্রাহ্য না করেই বলতে থাকে, তুমি বড় বোকা মেয়ে। নিজেকে সস্তা করার ভয়ে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে বসেছ। একটিবার মিলনের জন্ম জহরকে প্রাণপণে লড়াই করতে হয়! নিজেকে সস্তাই যে করে ফেলনি তাই বা কে জানে? হয়তো জহরের মনে ধারণা জন্মে গেছে ভেতরে ভেতরে তোমার কোন অসুখ বিসুখ আছে, নইলে এই বয়সে বিয়ের প্রথম বছরে—

অপর্ণা চুপ করে মিনিটখানেক ভাবে। তারপর একটু হেসে বলে, তোমাকে বোকা বলছি, আমিও তোমার মতই বোকা ছিলাম। শোন আমার বোকামির গল্প—তাহ'লে নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

বোকামি করে এমন ভুল করেছিলাম যার ফলে জীবনের সব সুখশান্তি

আমার ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ভুলটা করেছিলাম তোমারি মত,—নিজেকে সস্তা করব না, স্বামীর কামনাকে সব সময় চড়া পর্দায় চড়িয়ে রেখে তাকে একেবারে আমার গোলাম করে রাখব। অল্প বয়েস, বুদ্ধি কম, তাই স্কুল কলেজে বন্ধুদের কাছে পুরুষ সম্বন্ধে যে-সব তত্ত্বকথা শুনতাম তাই মন দিয়ে বিশ্বাস করতাম। বিয়ের রাত্রেও একটি বন্ধু আমার কাণে কাণে বলে দিয়েছিল, খপর্দ্দার, চাওয়ামাত্র ধরা দিয়ে নিজেকে সস্তা করবি না! মনে রাখিস্, নিজের তুই যত দাম করবি পুরুষ তোকে তত দাম দেবে। আমি শুনে শুধু একটু হেসেছিলাম। কারণ, তখন আমার ধারণা ছিল যে এসব বিষয়ে জানতে কি আর আমার কিছু বাকী আছে। মানুষের মন যে কি দুর্বোধ্য জটিল জিনিষ তা কি তখন জানি?

তিনজনে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনে। চন্দ্রা প্রথমে উসখুস্ করছিল, এখন সে হাতে মুখ রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে বসেছে।

অপর্ণা হাসে, প্রথমেই তোমাদের বলে রাখি, নিজেদের সস্তা না করা মেয়েদের একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সব মেয়েই জানে প্রেমিকের কাছে নিজের দাম কমাতে নেই। জেনে হোক আর না জেনে হোক সব মেয়েই নানাভাবে প্রেমিকের কাছে নিজের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য, নিজের প্রভাব বাড়াবার জন্য চেষ্টা করে। এটা দোষের কিছু নয়, এটা প্রকৃতিরই একটা নিয়ম। নিচু স্তরের জীবের মধ্যেও এ নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রা প্রশ্ন করে, নিয়মটা কেন?

: স্ত্রী-পুরুষ দু'রকম জীব বলে।

: ও!

: কিন্তু সব জিনিষের সীমা আছে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রকৃতির কোন নিয়ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভাবি যে খুব

বাহাদুরী করছি, কিন্তু সেটা যে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করা হচ্ছে তা আমাদের মাথায় ঢোকে না।

অর্পণা একটু থামে।

: আমাদের মধ্যে সত্যি ভালবাসা জন্মেছিল। তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে দু'জনে মিলে নীড় বাঁধবার জন্য আমরা দু'জনেই পাগল হয়ে উঠেছিলাম। বিয়ের রাত্রে আমরা দু'জনেই যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। কিন্তু তখন আমার এল পাগলামি। পাছে ভালবাসার বাঁধন ঢিল হয়ে যায়, ওঁর আগ্রহ ঝিমিয়ে আসে, বেশী পেয়ে আমাকে সস্তা মনে হয়, এই ভয়ে আমি হঠাৎ ভয়ানক সংযত হয়ে গেলাম। সংযম না ছাই, একটা বিপজ্জনক খেলা আরম্ভ করে ছিলাম আর কি! তুমিও খুব সম্ভব জহরের সঙ্গে এই রকম একটা খেলা আরম্ভ করেছিলে চন্দ্রা।

চন্দ্রা চুপ করে থাকে।

: উনিও আমার অনিচ্ছার মর্য্যাদা দিতেন। এমনিভাবে দিনের পর দিন অতৃপ্তি দিয়ে কদাচিৎ ওঁর কাছে ধরা দিতাম। তাও এমনভাব দেখাতাম যেন কেবল ওঁর মুখ চেয়ে মস্ত একটা কুৎসিৎ কাণ্ড মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি। উনিও যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করছেন এমনিভাবে কেমন যেন লজ্জিত আর অপরাধী হয়ে পড়তেন। আর এমন মূর্খই আমি তখন ছিলাম যে ওঁর ওরকম ভাব দেখে খুসী হয়ে ভাবতাম, আমি যেন অনেক উঁচুতে উঠে আছি আর উনি নীচে নেমে গেছেন, এটা যখন উনি বুঝতে পারছেন, এবার থেকে ওঁর শ্রদ্ধা ভালবাসা নিশ্চয় আরও বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, আমার সঙ্গলাভের জন্য ওঁর ব্যাকুলতাও যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সেটাও বেশ বুঝতে পারছিলাম।

আমার প্রতি ওঁর আকর্ষণ বাড়ছে এই সব ভেবে মনকে বুঝালেও তলে তলে কেমন একটা গভীর অতৃপ্তি আমাকেও কিন্তু পীড়ন করত। কাজকর্ম্মে মন বসত না, গল্পগুজব বই পড়া ভাল লাগত না, মাঝে মাঝে

ওঁর আদর পর্যন্ত বিস্বাদ লাগত। সব সময় কেমন একটা অস্বস্তি আর অভাব বোধ করতাম। এটা বুঝতে অবশ্য আমার সময় লেগেছিল, কারণ, তখন মনে মনে আমার বিশ্বাস ছিল,—আমি পরম সুখী, নিজের চেষ্টায় নিজের দাম্পত্য জীবনকে আদর্শ জীবনে দাঁড় করাতে পেরেছি। নিজের ভেতরের ছটফটানিটা স্পষ্টভাবে বুঝতে আমার বছর খানেক কেটে গেল। তখনও অবশ্য বুঝতে পারলাম না, কি জন্য আমার ওরকম লাগে।

ততদিনে তিনি অনেক বদলে গেছেন। বদলে গেছেন মানে যে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন বা আমাকে অবহেলা করতে আরম্ভ করেছেন, তা নয়। কতকটা যেন আমার মন যুগিয়ে চলবার জন্যই নিজেকে সামলে চলেন, মিলনের জন্য আগের মত আর ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন না। আমি দেহটা তুচ্ছ করি, তিনিও যেন সেইজন্যই দেহটা তুচ্ছ করতে আরম্ভ করেছেন। রাত্রে ঘরে এলে খিল দেওয়া মাত্র আগের মত আর দুহাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে হাজার খানেক চুমু খান না, বেশ ভদ্রভাবে সন্তর্পণে আদর করেন। কোন রকম ঝগড়াঝাটি বা সামান্য মনান্তরও কখনো হত না। আগের মত দরকারের চেয়ে বেশী শাড়ী-ব্লাউজ, সাবান-পাউডার-স্নো-ক্রীম এনে দিচ্ছেন, বেড়াতে আর সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন, হাসিমুখে কথা বলছেন, তবু যেন আমার মনে হত মানুষটা কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে, তফাতে সরে যাচ্ছে।

তা'ছাড়া বাইরে সময় কাটানোর স্বভাবটাও তাঁর বাড়তে লাগল। শেষে একদিন রাত্রে বাড়ীই ফিরলেন না। কৈফিয়ৎ দিলেন যে বন্ধুর বাড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দোকান থেকে একেবারে চুল ছাঁটিয়ে, দাড়ি কামিয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন, তবু মুখখানা বড় বেশী শুকনো দেখাতে লাগল। আমার মনটা খুঁত্ খুঁত করতে লাগল।

কয়েকদিন পরেই আবার রাতে বাড়ী ফিরলেন না। তারপর দু'চার দিন

পরে পরেই, রাত্রিটা বাইরে কাটিয়ে আসতে লাগলেন। আমার যে তখন কি অবস্থা হল বুঝতেই পারছ! একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেন এমন হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার মুখের দিকে চেয়ে যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন, একটা রাত আমায় ছেড়ে থাকতে হলে যাঁর প্রাণ ছটফট করত, তিনি আমায় ফেলে সারারাত বাইরে হৈ চৈ করে কাটাতে আরম্ভ করেছেন।

দাম বাড়ার বদলে এতই দাম কমে গেল আমার!

প্রথম কিছুদিন রাত্রিটা বাইরে কাটিয়ে সকালে অথবা বিকালে একেবারে আপিস থেকে বাড়ী ফেরবার সময় নিজেকে ভাল করে মেজেঘষে আসতেন, আমি যাতে চেহারা দেখে কিছু টের না পাই। কিন্তু একদিন রাত প্রায় তিনটার সময় মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরলেন। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি, তিনিও উঠে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। দেখেই আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, মাতাল অবস্থায় আমার কান্না দেখে বুঝি ব্যঙ্গ করছেন।

ধমক দিয়ে বললাম, কি মাতলামি আরম্ভ করেছ?

তখন তিনি কত কথাই যে বললেন। অবশ্য নেশার ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়েই কথাগুলি বললেন, মাতাল অবস্থায় সে রাত্রে বাড়ী না ফিরলে হয়তো কোনদিন আমায় বলতেন না। সব কথা তোমাদের শুনে কাজ নেই, আসল কথাটা শোন। তিনি বললেন, আমি সত্যি পশু, অপর্ণা। কিছুতে নিজের পশু প্রবৃত্তি চেপে রাখতে পারি না। কিন্তু তুমি তো আমার বৌ, আমার সন্তানের জননী হবে তুমি, তোমায় কি করে নীচে নামাই? তাই বাইরে একটু হৈ চৈ করে আসি, আমায় তুমি মাপ কর।

আরও অনেক কথা বলতে বলতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বাকী

রাতটা আমি জেগেই কাটিয়ে দিলাম। কত কথাই যে ভাবতে লাগলাম তার ঠিকানা নেই। ওঁর এই অবস্থার জন্য কে যে দায়ী বুঝতে আমার আর বাকী রইল না। সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে প্রথম খেয়াল হল, এতদিন ওঁর ওপোর, কি অত্যাচারটাই করেছি। বেঁধে মারার একটা কথা আছে না? এতদিন তেমনি ভাবে মেরেছি ওঁকে। মনের জোর ওঁর কম নয়, আমি যদি তফাতে থাকতাম বা অসুখ হয়ে পড়ে থাকতাম তা'হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু প্রথম যৌবনের লাবণ্যে ঢল ঢল শরীর নিয়ে সর্বদা চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কতরকম ভালবাসার খেলা খেলছি, পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাচ্ছি, সবসময় ওঁকে উত্তেজিত করে তুলছি, অথচ ধরা দেওয়ার বেলায় আমার আসছে পাগলামি!

ভাবতে ভাবতে এ কথাটাও বুঝতে পারলাম, তিনি যাকে নিজের পশুবৃত্তি ভেবে নিজেকে অশ্রদ্ধা করছেন, সেটা এরকম অবস্থায় এমন প্রচণ্ড না হয়ে উঠলেই বরং ওঁকে অসুস্থ মনে করা চলত। একজন সুস্থ সবল যোয়ান মানুষ, সে-যে একটি মেয়েকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করে এনে যোগী ঋষির মত ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে, উত্তেজনা বোধ করবে না, পাগল ছাড়া এমন কথা কে ভাববে? আর দিনের পর দিন সেই উত্তেজনা অতৃপ্ত থাকার ফলে মানুষটা যদি বিগড়ে যায়, তাতেই বা আশ্চর্যের কি আছে!

আমি বুঝতে পারলাম, নিজের যা ক্ষতি আমি করেছি, নিজেকেই আমায় তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। ওঁর ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হল। লজ্জায় চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতে পারলেন না, যেন অপরাধটা সমস্ত ওঁর, আমার কোন দোষ নেই।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, কাল তোমায় অনেক যা-তা কথা বলেছিলাম, না?

আমি সহজভাবে বললাম, না, দামী দামী কথা বলেছ, দরকারী কথা বলেছ, অনেক আগেই তোমার ওসব কথা আমায় বলা উচিত ছিল।

তারপর ওঁকে তিন মাসের ছুটি নেওয়ালাম। পরদিন জিনিষপত্র বেঁধে চলে গেলাম পুরী। সেইখানে আমাদের হনিমুন্ আরম্ভ হল— বিয়ের একবছর পরে।

একবছর ধরে যে অস্বাভাবিক অবস্থায় দু'জনের জীবন অশান্তি আর অতৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল, তিন মাসেই সেটা কেটে গিয়ে আমাদের জীবন আনন্দে, তৃপ্তিতে, ভরে উঠল। ওর ভালবাসা আর আকর্ষণও যেন মাঝখানের ঝিমানো ভাবটা কাটিয়ে দিন দিন বেড়েই চলতে লাগল। দেখলাম যে প্রেমিককে বঞ্চিত করেই শুধু নিজের দাম বাড়ানো যায় না।

চন্দ্রা মুখ তুলে বলে, নিতে যদি নাও আসে, আমি নিজেই কাল যাব অপর্ণাদি।

৭

নানা স্তরের ছোট বড় নানারকম সাহিত্যিক-সভা বৈঠক ও আড্ডায় মানব মাঝে মাঝে যাতায়াত করে—তাকে যেতে হয়।

প্রধানত সাহিত্য করার প্রয়োজনেই। কিন্তু তার খেয়ালও হয় না যে প্রধানত কালাচাঁদের লেখক হবার সাধকে কেন্দ্র করে কি ভাবে তারই আস্তানায় গড়ে উঠেছে একটা ঘরোয়া বৈঠক— সে থালেক আর দু'চারজন লিখিয়েদের নিয়ে।

কালাচাঁদ উপস্থিত থাকবার এবং নানারকম প্রশ্ন করবার অনুমতি পেয়েছে। তবে প্রশ্ন সে করে কম, অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে তাদের তর্ক ও আলোচনা শোনে।

নিজের লেখা যখন খুসী পড়ে শোনাবার ঢালাও অনুমতিও তাকে দেওয়া আছে। কিন্তু সুযোগটা সে কাজে লাগায় খুব কম।

মানব জিজ্ঞাসা করে, লেখার চেষ্টা করছ না কালাচাঁদ ?

: করছি বৈ-কি ! হবে না জানা কথা, চেষ্টা করে দেখতে ছাড়ব না।

: লেখা পড়ে শোনাও না কেন ?

: শোনাবার মত লেখা কি আর হচ্ছে মানুবাবু ?

সেদিন খালেক আর সুরেন এসেছিল একটা গুরুতর পরিকল্পনা নিয়ে : দেশ ভাগ্ হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, কিন্তু একালের হিন্দু মুসলমানে যে সেকেলে সত্তা অমিল নেই এটা দেখাবার জন্ম একটা কাব্য সঙ্কলন বার করলে দোষ কি ?

কতকাল ধরে হিন্দু মুসলিম কবিরা পাশাপাশি মূলতঃ একই ভাষাভিত্তিক ভাবের ও ধারার কবিতা ও গান রচনা করে এসেছে,একই বাংলা মাতৃভাষা বলে তাদের কাব্যে ঐতিহ্যের ছাপ আর পরিবর্তনের ধারা যে মূলত একই। সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে ধরা।

একাজ যে কত কঠিন এবং কি ভাবে এ কাজ যে করা সম্ভব, তাই নিয়ে তিনজনে যখন তর্ক আর আলোচনায় মশগুল, স্কুল বই-এর মরশুমের সময়কার ডবল সিফ্‌টের হরফ সাজানো আর হরফ সংশোধনের ডিউটি দিয়ে এসে, শুধু হাতটা ধুয়ে নিজের লেখা একটা গল্প তাদের পড়িয়ে শোনাতে এসে কালাচাঁদ আলোচনা গতি পাল্টে দেয়।

দুর্ভিক্ষের একটা গল্প লিখেছে কালাচাঁদ।

পুতুল মরার আগে উমাকান্তের লেখা একটা গল্প পুতুল মরার পর ছাপা হয়েছে—সেই গল্প পড়ে কালাচাঁদ নিজে একটা গল্প লিখেছে।

গতবারের মহান ভীষণ দুঃভিক্ষের ব্যাপার নিয়ে লেখা গল্প। উমাকান্ত মাঝে মাঝে মন্বন্তর নিয়ে গল্প লেখে।

গল্পটি ছাপা হয়েছিল 'রস-সাহিত্য' পত্রিকায়। কম্পোজ করেছিল কালাচাঁদ নিজে।

একটু ফেনের জন্ম কাতারে কাতারে লাইন দিয়েও, লাখের হিসাবে

মানুষ মরেছে যে দুর্ভিক্ষে—সেই মন্বন্তরকে মহান বলা! বীভৎস মৃত্যুর আঘাতে জাতির চেতনা জাগিয়ে দিয়েছে বলে!

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কালাচাঁদ।

জাতির চেতনা তবে এমনি ভাবে মরার ঘায়ে জাগে!

কে জানে লেখকেরা কিভাবে চিন্তা করে সংসারের ছোট বড় ব্যাপার নিয়ে!

গল্প শুনিয়ে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করে ভাল হয়নি জানি, কিন্তু গল্প হয়েছে কি?

মানব বলে, না, গল্প হয় নি। তুমি শুধু তোমার নিজের প্রাণের জ্বালাটা প্রকাশ করেছ।

: আপনি হলে কি ভাবে গল্পটা সাজাতেন মানুবাবু?

: আমার কত গল্প পড়েই তো দেখছ কি করে সাজাই!

কালাচাঁদ হেসে বলে, তা নয়। আমার এই বিষয়টা নিয়ে লিখতে চাইলে কি লিখবেন, ধরবেন কি করে?

খালেক এবং মানবও হাসে।

: চারদিকে কি হচ্ছে-না-হচ্ছে দেখে শুনে হদিস পাই, কি নিয়ে কি লিখতে হবে। মানুষ কে আসবে, কি ঘটনা ঘটবে ভেবে সাজিয়ে নিই—খেয়াল রাখি যাতে গল্প হয়।

কালাচাঁদ খালেককে প্রশ্ন করে, কবিতাও তাই?

খালেক বলে, নিশ্চয়! কি নিয়ে কবিতা লিখব সেটা আগে ভাবি, তারপর ঠিক করি কি করে ভাবনাটা সাজালে কবিতা হবে।

কালাচাঁদ চিন্তিত হয়ে বলে, গল্পের গল্প হওয়া চাই, কবিতার কবিতা হওয়া চাই—এ তো সোজা কথা বললেন। এটা বুঝতে তো কষ্ট নেই। কিন্তু কি বলবেন আর কি করে সাজিয়ে গল্প কবিতা করবেন—দুটো একসাথে মিলিয়ে ভাবেন কি করে? ভাবতে গেলে মোর মাথা ঘুরে যায় বাবু!

খালেক মিষ্টি সুরে বলে, আমাদেরও একদিন তোমার মত মাথা ঘুরে যেত কালাচাঁদ। ব্যাপারটা বুঝেছি কিন্তু ভাবটাকে কি রকম চেহারা দেব ভেবে আজও মাথা ঘুরে যায়। তুমি ভাবছ দুটো বুঝি ভিন্ন—তা কিন্তু নয় কালাচাঁদ। শোন, তোমায় বুঝিয়ে বলি। গল্প কবিতা লেখার কায়দাই হল—যা বলবো অর্থাৎ যেটা হল ভাবনা—সেটাকে গল্প কবিতার চেহারা দিয়ে ভেবে চলা যেমন তুমি দুর্ভিক্ষ নিয়ে লিখেছ—তোমার ভাবটা হল, না খেয়ে তিল তিল করে মরাটা যে কি ভীষণ ব্যাপার, যারা দু'বেলা খায় তারা বুঝতে পারবে না। এই ভাব নিয়ে তুমি যা ভেবেছ সেগুলি গল্পের চেহারায় ভাবা হয় নি।

কালাচাঁদের গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা কাগজগুলি তুলে নিয়ে খালেক আবার বলে, তুমি আরম্ভ করেছ: 'ওই যে ফুটপাথের ধারে ল্যাম্প-পোষ্টে হেলান দিয়া কঙ্কালসার মানুষটা ধুঁকিতেছে উহার কি যন্ত্রণা হইতেছে আমি কেমন করিয়া বুঝিব? যেমন হোক দুইবেলা আমি শাক ভাত খাইতে পাই।' এইভাবে মাঝে মাঝে তুমি লোকটির কথা উল্লেখ করেছ আর নানাভাবে তোমার মূল ভাবটা প্রকাশ করেছ। শেষ করেছ এই বলে যে, তিন দিন পরে লোকটিকে ওখানেই মরে পড়ে থাকতে দেখে তুমি ভাবছ— উপোস দিয়ে মরণ না হলে তুমি মরেও ওর যন্ত্রণা বুঝতে পারবে না।

খালেক একটু থামে। কালাচাঁদ যে কী আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছে লক্ষ্য করে সে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়।

বলে, ভাবটা সুন্দর, মাঝে মাঝে ঝাঁঝটা ফুটেছে চমৎকার কিন্তু গল্প আছে কতটুকু? একজন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক ফুটপাতে বসে ধুঁকছিল, তিনদিন পরে দেখা গেল সে মরে পড়ে রয়েছে।

মানব খুসী হয়ে বলে, বাঃ, তুই তো চমৎকার বলেছিস্ খালেক! আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না কি ভাবে ওকে বোঝাব যে কেন এটা গল্প

হয় নি, কেন এতে গল্প নেই। বুঝতে পেরেছ তো কালাচাঁদ? খেতে না পেয়ে একজন ফুটপাতে ধুঁকছে, তিন দিন পরে মরে গেল—শুধু এইটুকু নিয়ে কি গল্প হয়? এ-তো সবাই দেখেছে, দেখে সবার প্রাণেই জ্বালা ধরেছে—গল্পে আরও অনেক কিছু দিতে হবে, পড়ে যাতে সকলে বুঝতে পারে যে ফুটপাতে ধুঁকতে ধুঁকতে একজনের মরণ দেখে জ্বালা শেষ করাটাই সব নয়, সংসারের আরও অনেক বিরাট ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এ-মরণের মানে আরও গভীর।

বুক ফেটে যেতে চেয়েছে কালাচাঁদের। আরেকটুকু যদি লেখাপড়া কেউ তাকে শেখাত!

আরেকটু বিদ্যা যদি তার পেটে পড়ত!

স্কুল থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সীসার অ-আ ক-খ-আকার-ইকার সাজাবার কায়দা শিখতে।

মানব বলে, হাল ছেড়ো না, গল্প লেখাও অনেক চেষ্টা করে শিখতে হয়। তোমার কয়েকটা ভাল ভাল নামকরা গল্প পড়া উচিত। এমনি পড়লে হবে না, কেটে কেটে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে। বিষয় কি, ঘটনা কি, চরিত্র কেমন, কি ভাবে গল্প সাজানো হয়েছে—

কালাচাঁদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, থাক্, আর গল্প লিখে কাজ নেই মোর। আমার অনেক ভাগ্যি যে আপনাদের লেখা কোনমতে পড়তে পারি।

মানব স্থির দৃষ্টিতে তার রকম সকম লক্ষ্য করতে করতে বলে, কি বলতে চাও ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। কথাটা হল লেখাপড়া। লেখা আর পড়া এক সাথে চলে—যে ক-খ লেখে সে ক-খ পড়ে। যে বড় জ্ঞানের বই লেখে সে বড় জ্ঞানের বই পড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা কি খোলসা করে বলত শুনি?

: ওমনি করে তলিয়ে বুঝে গল্প পড়ার বিদ্যা পেটে আছে? কে পড়াবে, কে বোঝাবে?

মানব হেসে ওঠে—আমরা পড়াব—আমরা আছি কি করতে? ভাবছ কেন—স্কুলের মত পড়া নয়! তোমায় আগেই তো বলেছি, আমাদের মত পণ্ডিতদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখতে চাইলে তোমার চলবে না। তোমায় কি আর ওরকম সূক্ষ্মভাবে বিচার করে গল্প পড়তে বলছি? তুমি গল্প লেখার মোটা মোটা কায়দা বুঝবার চেষ্টা করবে। যা বুঝবে না, আমাদের জিজ্ঞাসা করবে।

কালাচাঁদ খুসী হয়ে বলে, জ্বালাতন হবেন না তো?

এবারের রস-সাহিত্য পত্রিকায় মানব ও খালেকের দুটি লেখা ছাপা হয়েছে। দুভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প এবং কবিতা। লেখক কবি মানুষ, কালাচাঁদের দুভিক্ষের গল্প না হলেও লেখাটার মধ্যে যে প্রাণের জ্বালা প্রকাশ পেয়েছিল সেটা মর্ম স্পর্শ করেছিল। পরামর্শ করে না লিখলেও দু'জনেই বোধ হয় তাই দুভিক্ষের গল্প আর কবিতা লিখে ফেলেছে!

মহেশ পড়ে বলেছিল, তোমরা কি পরামর্শ করে লেখো নাকি? দু'জনেই তো এক ছবি এঁকেছো, এক সুর গেয়েছ। একটা গল্প আরেকটা কবিতা—এইটুকু শুধু তফাত।

: ছোট গল্প আর কবিতা খানিকটা সমধর্মী।

এই নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে যেতে পারত কিন্তু তর্ক বাধাবার মত অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না।

মহেশ তর্ক করে না।

মাঝে মাঝে লাগসই মন্তব্য করে, তর্ককে আরও উছলে দেয় কিন্তু নিজে কখনো তর্কে যোগ দেয় না—না তার খোলা সম্পাদকীয় দপ্তরে, না নিজের বাড়ীর বৈঠকে।

দুভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প কবিতা।

কবিতাটি আবার একজন মুসলিম তরুণের লেখা। তবে গল্পটি শুধু দুভিক্ষের চিত্র—কবিতাটিও দুভিক্ষের ক্ষুধার কাব্যরূপ।

একটু ইতস্ততঃ করে মহেশ গল্প আর কবিতা ছেপে দেয়।

ছুটি লেখাই বড় সুন্দর হয়েছে। মনকে অভিভূত করে, নাড়া দেয়।

এতকাল পরের কাগজে সম্পাদকত্বের জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে বুড়ো হতে চলেছে, লেখা ছুটো পড়ে তার প্রাণটাও আন্‌চান্‌ করে উঠেছে।

কবিতাটি খালেক লিখেছে বিছানায় শুয়ে। সখের শোয়া নয়, রোগের বাধ্যতামূলক শোয়া। কী রোগ সেটা সঠিক জানা যায় নি। তবে জানবার জন্য যথা নিয়মে পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেই অবশ্য জানা যাবে। কী রোগ হয়েছে সেটা ঠিকভাবে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করাও কি সোজা হাঙ্গামা, সহজ দায় এদেশের গরীব মানুষের পক্ষে!

তবে খালেকের কি হয়েছে সেটা প্রায় সকলেই অনুমান করতে পেরেছিল, মানবও টের পেয়েছিল। একটা যোয়ান মানুষ কি দিন দিন অকারণে রোগা হয়ে যায়? তার অল্প জ্বর হতে শুরু করে? অকারণে থেকে থেকে কাসে?

কেসে কেসে রক্ত তোলার অবস্থায় পৌছতে শুধু বাকী।

খালেকের মত তারও বিছানা নিতে ক'মাস ক'বছর বাকী আছে কে জানে!

কবিতাটি সেখানেই লেখা—তাকে দেখতে গিয়ে মানব নিয়ে এসেছিল।

একটা খটকা লেগেছিল মানবের মনে। কোন্‌ কাগজে দেবে তার গল্প আর খালেকের কবিতাটি?

মহেশের কাগজে দেওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি? ছাপতে মহেশ সাহস পাবে কি?

হঠাৎ সে ডেকে পাঠিয়েছিল আভিকে।

তখন ছুপুরবেলা। আভির মা যে ঘরে ছিল না, ভোরে উঠেই বোনের বাড়ী গিয়েছিল, এটা মানবের জানা ছিল না।

আত্তিকে ঘরে ডাকা যায় না, কারণ, কাজটা দু'চার মিনিটে শেষ হবে না—আত্তিকে বেশ খানিকক্ষণ থাকতে হবে। বেশীর ভাগ পুরুষেরা কাজে গেছে, যার কাজ নেই সেও বেরিয়েছে কাজের চেষ্টায়।

চোখ পাতা আছে মেয়েদের। এইসব মেয়েদের চোখ আর মনকে মানব চেনে। বেচারাদের সে দোষ অবশ্য এতটুকু দেয় না, সে জানে যে মনের এই গড়নের জন্য ওরা নিজেরা দায়ী নয়।

দরজা যে সটান খোলা এটা হয়তো ওদের চোখেই পড়বে না, অথবা চোখে পড়লেও মন সেটা গ্রাহ্য করবে না।

খাঁ-খাঁ দুপুরে আত্তি অনেকক্ষণ তার ঘরে একলা ছিল এটাই শুধু চোখ দেখবে এবং মন বুঝবে।

রোয়াকে উবু হয়ে বসে আত্তিকে বসতে বলে মানব বলে, একটা গল্প আর একটা কবিতা শোন দিকি আত্তি—কেমন লাগে বলবে। পড়তে পারো না—তোমায় নিয়ে এই তো হয়েছে মুস্কিল।

আত্তি খুসী হয়ে মাটিতে জাঁকিয়ে বসে।

প্রথমে মানব কবিতাটা পড়ে শোনাতে যায়।

তখন কোথা থেকে এসে দাঁড়ায় কুঞ্জর মা। বেঢপ রকমের মোটা প্রৌঢ় বয়সী বিধবা—যেমন ঝগড়াটে তেমনি কড়া মানুষ মেয়ে বৌদের চালচলনের ব্যাপারে।

: কি হচ্ছে বাছা তোমাদের ?

মানব হেসে বলে, ব্যাপার কিছুই হচ্ছে না মাসী, বলি শোন। কাগজে ছাপাবার জন্য একটা রূপকথা লিখেছি আর একটা ছড়া লিখেছি। লিখেছি গরীব মুখ্যুদের জন্যে। তা ভাবলাম কি, পেটে তো বিদ্যে জমিয়েছি ঢের, অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখেছে যারা, তারা পড়ে বুঝতে পারবে তো কি লিখেছি ? মুখ্যু মেয়েটাকে তাই শোনাচ্ছি রূপকথা আর ছড়াটা। ও যদি না বুঝতে পারে তবে বুঝব ঠিকমত ফাঁদা হয় নি।

মানব আবার হেসে বলে, তুমিও বলোনা মাসী, শুনে বল না কেমন লাগল ? তোমার পেটেও তো বিত্তের বালাই নেই, তুমিও যাচাই করতে পারবে কেমন হয়েছে।

কুঞ্জর মা ফোলা ফোলা চামড়া ঝোলা মুখে গালভরা হাসি হাসে।

সামান্য একটুখানি হাসি তার মুখে কোনদিন দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না মানব।

: দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়েই শুনছি বাবা।

খালেকের কবিতাটা আবৃত্তি করে শুনিয়ে মিনিটখানেক চুপচাপ দুজনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে মানব আত্তিকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগল ?

আত্তি বলে, ইস্! খিদের জ্বালায় এমন করে মানুষ! তা সত্যিই তো, করেই তো!

কুঞ্জর মাকে প্রশ্ন করতে হয় না, সে নিজেই কপাল চাপড়ে বলে, পোড়া পেটের ঝনঝাট,—বাবারে!

মানব তারপর নিজের গল্পটা পড়ে। আত্তি আর কুঞ্জর মা'র থমথমে মুখের দিকে চেয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না মানবের।

আত্তি ঢোক গিলে কাঁপা জড়ানো গলায় বলে, ছড়াটা আরেকবার শোনাও দিকি ?

মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখের দিকে চেয়ে কবিতাটা আরেকবার আবৃত্তি শুরু করার পরেই দু'জনের চোখে জল জমে ঝরে পড়ার প্রক্রিয়াটা দেখতে দেখতে মানবের গলাও কেঁপে যায়।

আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্র দু'জনে তারা একভাবে কিন্তু দু'রকম ভাষায় যেন ফেটে পড়ে,—যার মর্মার্থ হল : কেন ? কেন ? কেন না খেয়ে মরবে মানুষ ?

তারা মরুক, ভিটেয় তাদের শকুনি চড়ুক, সর্বাঙ্গে তাদের কুষ্ঠ হোক যারা মানুষকে খেতে না দিয়ে মারে!

প্রায় হতভম্ব মানব ভাবে, ও বাবা, আমি তো তবে সহজ লেখক হই নি! খালেক তো সহজ কবি হয় নি!

কালাচাঁদ গল্প লিখতে চায়, তার কাছে গল্প লেখার কায়দা শিখতে চায়—প্রায় গুরুর মতই তাকে সম্মান করে।

কিন্তু মুখ্যুদের জন্য লেখা গল্প-কবিতা তার বয়স্থা মেয়েকে প্রকাশ্য-ভাবে দাওয়ায় বসে কুঞ্জর মার চোখের সামনে লেখা দুটো পড়ে শুনিয়ে যাচাই করবার চেষ্টা করলে·কালাচাঁদ যে এমন ভীষণভাবে রেগে যাবে, মানব তা কল্পনাও করতে পারে নি।

কালাচাঁদ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

কী রাগত ভাব কালাচাঁদের! কী কটাং কটাং কথা!

আবছা ভোরে উঠে দরজা খুলতেই মানব দেখতে পায়, রোয়াকে কালাচাঁদ উবু হয়ে বসে আছে।

: কি ব্যাপার ভাই?

বলে মানব দাতনটা চিবোতে শুরু করে।

: মেয়েটাকে টানাটানি ঘাঁটাঘাঁটি কোরোনা মানুবাবু! আন্তির মা বলেছিল সেবারের ব্যাপার, আমিও তোমায় জানি। আমার কোন ডর নেই। কিন্তু পাঁচজনে তো বুঝবে না!

: বুঝেছি ব্যাপার।

: ছোট তো নেই—একলাটি থাকে। এইটুকু মেয়েকে ফুসলাবার জন্য কটা বজ্জাত যে উঠে পড়ে লেগেছে কি বলব তোমায় মানুবাবু।

: আমি জানি না? করুক না একটু বাড়াবাড়ি! আন্তির সঙ্গে

ইয়ার্কি দিতে গেলে ভাল করে টের পাবে যে মানুবাবু শুধু কলম পেষে না, ডাণ্ডা চালাতেও জানে।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে কালাচাঁদ বলে, না-না, সে ব্যাপার নয়। তোমায় কেন ডাণ্ডা চালাতে হবে? কুঞ্জর মা দেখছে না মেয়েটাকে? ওর মুখের তোড়ে ভেসে যাবে না বজ্জাত ক'টা?

কালাচাঁদ আবার সখেদে মাথা নাড়ে।

মানব একটু দমে গিয়ে বলে, কি তবে ব্যাপারটা? আন্তিকে তো একলা ডেকে লেখা শোনাই নি? কুঞ্জর মা সাথে ছিল।

: ওরা রটাচ্ছে, তুমি উছলে উছলে বিগড়ে দিয়ে মেয়েটাকে বাগাবার চেষ্টা করছ।

ব্যাপারটা তা হ'লে সত্যই গুরুতর দাঁড়িয়েছে!

সীসার হরফ সাজানোর কাজে টাইম আর ওভার টাইম মিলিয়ে সারা-দিন খাটে যে কালাচাঁদ, তার কথা বলার ভঙ্গি আর ভাষার বাঁধুনি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় মানবের!

আন্তি আর তাকে নিয়ে সস্তা একটা ছ্যাচড়ামির পালা শেষ হয়ে চুকে-বুকে যাবে দু'দিনে—কিন্তু কালাচাঁদের এমন নিখুঁত সুন্দর জীবন্ত ভাষায় কথা বলা তো সম্ভব হয় নি এতকাল—এই অদ্ভুত ব্যাপারের জের তো দু'চার বছরে মেটার নয়!

আন্তির প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় মানব।

: তুমি কদ্দূর পড়েছ কালাচাঁদ?

: এইট-এ উঠলাম, বাবার হল অসুখ। লেখাপড়া হবে না টের পেয়েছিল নিশ্চয়, স্কুল ছাড়িয়ে বলল, পড়ে তোর ঘোড়া হবে, হাতের কাজ শিখবি যা, খেটে খাবি। আট ন'মাস শিখে যেই এপ্রেন্টিস হলাম আট আনায়, চোখের সামনে বাবা একদিন পূজো সংখ্যার একটা লেখা কম্পোজ করতে করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে পটল তুলল।

কালাচাঁদকে একটা বিড়ি দিয়ে মানব শেষ বিড়িটা ধরায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। যে ভাবে এসে থাক, যে ভাবে কথা বলে থাক, যতই আপশোষের আওয়াজ করে থাক—কালাচাঁদকে আজ আশ্চর্যরকম তাজা আর জ্যান্ত মনে হচ্ছে।

বিড়িটা কালাচাঁদ শেষ পর্য্যন্ত টেনে ক্ষয় করে। তারপর গেঞ্জির তলা থেকে বার করে ভাঁজ করা ছোট খাতাটা।

: লেখাটা পড়বে মানুবাবু ?

: পড়ব না ? তোমার লেখা পড়ব না তো কার লেখা পড়ব !

: বলবে কিন্তু কেমন হয়েছে।

: নিশ্চয় বলব !

মানব শব্দ করে হাসে।

: শেষ পর্যন্ত আমায় সাথে পাল্লা দিলে কালাচাঁদ ?

কালাচাঁদও হাসে।

: তোমার সাথে পাল্লা ? তুমি একলা লেখো নাকি ?

মানব আর খালেকের দুর্ভিক্ষের ভীষণতা নিয়ে লেখা গল্প আর কবিতা রস-সাহিত্যে ছাপানো নিয়ে কি সংঘর্ষই যে হয়ে গেল মহেশ আর ধনদাসের মধ্যে !

সংঘর্ষ ?

কিসের সংঘর্ষ ? ধনদাসের একটি মুখের কথাই তো যথেষ্ট যে—কাল থেকে আর আসবেন না। বাস্। ফুরিয়ে যাবে মহেশের চাকরী।

তবু সংঘর্ষ বৈ-কি !

মহেশকে ওভাবে হঠাৎ লাথি মেরে তাড়ানোর অসুবিধা আর বিপদ ধনদাস জানে।

প্রেসের কম্পোজিটাররা পর্যন্ত মানুষটাকে খাতির করে।

অনেক লেখক শুধু তারই খাতিরে মজুরি কম নিয়ে রস-সাহিত্যে লেখা দেয়।

কয়েকটা বড় বড় লাইব্রেরী বই কেনার ব্যাপারে তার পরামর্শ চায়। মহেশের এই সব গুণগুলি যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়ে এসেছে—মানুষটার ওই গুণগুলিই যে এমন ঝঞ্ঝাট হয়ে দাঁড়াবে কে জানত!

সে পয়সা দিয়ে লোক রাখবে, মফতে তো নয়। যাকে খুসী, রাখবে—যাকে খুসী তাড়াবে। এটুকু স্বাধীনতাও তার নেই? পয়সা দিয়ে লোক রেখে তবে লাভ কি!

কী দিনকাল যে হয়েছে!

মানব আর খালেকের গল্প কবিতা বুকে নিয়ে রস-সাহিত্যের সংখ্যাটা বার হবার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ধনদাসের টনক নড়ে।

ছাপা হবার পর বাঁধাই করা প্রথম সংখ্যাটি তাকে দেওয়া হয়—কাগজ হয় তো বাজারে বেরোবে পরদিন। পড়ে উঠতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে ধনদাসের। তার পড়ার সময় কই?

রস-সাহিত্য তার সাহিত্য চর্চার সখের কাগজ নয়। সাহিত্যের কিছু সে বোঝেও না, সাহিত্য নিয়ে তার কিছুমাত্র মাথা ব্যাথাও নেই।

কাগজটা বার করে নগদ লাভও খুব বেশী হয় না। তবে কিনা প্রেসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাগজটা বার করায় লোকের কাছে তার নিজেরও মর্যাদা বেড়েছে—প্রেসটারও মর্যদা বেড়েছে।

নানারকম যোগাযোগে নানারকম কাজও জুটে যায় প্রেসের।

জহরের কবিতার বইটা ছাপিয়ে দেবার সুযোগ পাওয়া তারই একটা আদর্শ নিদর্শন!

দিন পাঁচেক পরে প্রেসে এক পাক দিয়ে মহেশের টেবিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ধনদাস বলেছিল, বাঃ, এবার তো খাসা খাসা লেখা দিয়েছেন

কাগজটার। ক'দিনে একশো কপির বেশী বিক্রি হয়েছে। পাঁচ কপির বেশী হাজারিমল কোনবার নেয় নি—এবার আরও পাঁচ কপি বেশী নিয়েছে।

ধনদাস উদারভাবে হাসে, গুণের কদর জানি মশায় আমি! আমি তেমন লোক নই, কাউকে ঠকাই না।

মহেশ খুব বেশী খুসী হবার ভাব না দেখিয়ে বলে, আপনাদের কাছে কদর না থাকলে সেটা কিসের গুণ? আজ এখানে কাল ওখানে ভেসে বেড়াতাম—আপনার কাছে চোদ্দ পনের বছর কেটে গেল। গুণের কদর জানেন বৈ-কি।

ধনদাসের আগেই ভাবা ছিল, আগেই সিদ্ধান্ত করা ছিল। দ্বিধামাত্র না করে সে বলে, দশটাকা মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলেন না? কাজ দেখালে মাইনে বাড়বে এতো জানা কথাই! দশ কেন, পনের টাকা বেশীই নেবেন সামনের মাস থেকে।

মহেশ ধীরস্বরে বলে, আপনাকে বলিনি আমি—কাগজটা কিছু একেলে করা দরকার? সময় পাল্টে গেছে—সেকেলে কাগজ চলে না।

: তাইতো পনের টাকা বাড়িয়ে দিলাম আপনার মাইনে। একটু একেলে করুন কাগজটাকে—আমার ইণ্টারেষ্ট বজায় রেখে রেখে করুন। আপনি তা পারবেন—এটাই তো আপনার আসল গুণ।

ইংরাজী মাসের পনের তারিখে ধনদাস আইন মাফিক লিখিত নোটিশ জারি করে মহেশকে বরখাস্ত করে দেয়।

তার মূর্তি অন্যরকম। ব্যবহার অন্যরকম। কথাবার্তার ধরণ-ধারণ অন্যরকম।

পনের দিনের নোটিশ পেয়ে মহেশ নোটিশটা হাতে নিয়ে ধীরে

হুন্থে বার্ণিশ করা কাঠের তক্তার ঘেরা আপিস ঘরে গিয়ে বলে, ব্যাপারটা তো বুঝলাম না।

: ওই লেখা দুটো ছাপলেন কেন? দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা গল্প আর কবিতাটা?

: লেখা দুটো ছাপানোর জন্ম দুশো কপি বিক্রী বেড়েছে। আপনিই তো গিয়ে আমার পিঠ চাপড়ে এলেন।

: বিক্রী বাড়লে আমার লাভ কি? চারটে বড় বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে লিখেছে। আরও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হবে জানিয়েছে। আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই, দায়িত্ব জ্ঞান নেই—এই সেদিন পরিষ্কার বলে এলাম আমার চাকরী করতে হলে আমার স্বার্থ দেখতে হবে—সব হদিস্ হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের খামখেয়ালে লেখা ছাপবেন—আমার পাঁচ ছ'শো টাকার বিজ্ঞাপন নষ্ট হবে! আসল ব্যাপার বুঝতে পারি নি ভেবেছেন, আপনি নিজে মতলব করে এসব করছেন। আপনাকে রেখে ডুবব?

মহেশ ধীরে ধীরে বলে, পলিসিটা আপনার—আমার নয়। আপনিই আমায় বলেছিলেন যে কাগজের সার্কুলেশন বাড়া দরকার—সার্কুলেশন বাড়ালে আপনি বেশী বিজ্ঞাপনও যোগাড় করতে পারবেন। আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম যে সার্কুলেশন বাড়াতে হলে কাগজটাতে খানিকটা একালের সুর আনতে হবে, কিছু কিছু কড়া লেখা দিতে হবে। আপনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়েছিলেন, স্পষ্ট বলেছিলেন—আমার দিক বাঁচিয়ে একটু হিসেব করে কড়া করুন না কাগজের সুর। আমি শুধু তাই করেছি—কোন বিপ্লব করার লেখা ছাপিনি। দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা পর্যন্ত না ছাপিয়ে কি করে কাগজের সুর কড়া করব? আপনিই বললেন কাগজের সুর পাল্টাতে, কাগজের বিক্রী বাড়ায় আপনিই খুশী হয়ে আমার গুণ গাইলেন, পনের টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন—আজ হঠাৎ উল্টো কথা বলে আমায় একেবারে তাড়িয়ে দিচ্ছেন? আপনি বললেই সামনের মাস থেকে

আগের মত কাগজ বার করব। কাগজ আপনার—আপনি যে নীতি চালাতে বলবেন আমি সেই নীতি চালাব।

ধনদাস খানিক্ষণ চুপ করে ভাবে, বোধ হয় নতুন সমস্যা নিয়ে নতুন ধরণের চিন্তার কুল কিনারা না পেয়েই বলে, আচ্ছা নোটিশটা ফেরত দিন। দু'একদিন ভেবে দেখে আপনাকে জানাব।

বরখাস্তের নোটিশ মহেশের হাতেই ছিল—নোটিশটা সে ধনদাসের টেবিলে রাখে।

নাম সই করে আইন সঙ্গত ভাবে তাকে নোটিশটা নিতে হয়েছিল, আইন সঙ্গত ভাবে নাম সই করে ধনদাস সেটা ফেরত না নিলে যে নোটিশটা ফেরত নেওয়ার কোন আইন সঙ্গত মানেই হয় না—মহেশ তা ভাল ভাবেই জানে।

তবে সে এটাও জানে যে আইন ধনদাসের পক্ষে। তাকে আইন মানতে অনুরোধ করার কোন মানেই হয় না।

মন্দ্রা বলে, কেন ভাবছ বাবা? কাল থেকে আমরা শাড়ী তুলে রেখে সায়া-শেমিজ ঘাগরার মত পরব। কাল থেকে আমরা ছোট উনুন ধরিয়ে চাল ডাল শাক পাতা একচড়া রেঁধে খাব। তুমি কিছু ভেবোনা। এত বড় আস্পর্দ্ধা ব্যাটার, তোমায় চাকরী থেকে তাড়িয়ে দেয়!

মহেশ হেসে বলে, এখনো তাড়ায় নি—তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমায় তাড়াবেই। মাথায় কোন মতলব ঢুকেছে।

: কি মতলব?

: আমি কি জানি মনে মনে কি মতলব ভাঁজছে? তবে মনে হয় এভাবে বিক্রী না বাড়িয়ে কাগজটাকে সস্তা আর নোংরা করে বিক্রী বাড়াবার কথা ভাবছে।

৮

কালাচাঁদের কাছে মানব খবর শোনে যে মহেশকে ধনদাস তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদেরই লেখা ছাপানোর অপরাধে!

: আমি যে বছর ঢুকলাম সে বছর ওনার চাকরী হল, কাগজ বেরোল। কি খাটুনিটাই খেটে এসেছেন বললে প্রত্যয় যাবে না মানুবাবু। এদিকে প্রেসের কাজ দেখছেন, ওদিকে কাগজ বার করার জন্য খাটছেন।

কালাচাঁদ মানবকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে টেনে কেসে কফ তুলে থুতু ফেলে বলে, বড়ই বোকাসোকা মানুষ। মজুরি যেমন হোক, মোদের টাইমের খাটুনি। বাডতি টাইম খাটালে বাড়তি মজুরি। উনি দিনরাত খেটেই আসছেন বরাবর—টাইম ঘণ্টার কোন হিসেব নেই। অ্যাদ্দিন খেটে পনের দিনের নোটিশে বরখাস্ত হলেন।

মানব চিন্তিত হয়েও তার কথা শুনে হেসে বলে, ঘণ্টা টাইমের হিসেবে মহেশবাবু বেশী খেটে এসেছেন বলছ? এ জগতে আজ কারও ওরকম বেহিসেবে খাটিয়ে নেবার ক্ষমতা কিন্তু আছে কি কালাচাঁদ? কারো নেই হিসাবে কিছু কিছু ঠকাতে পারে—একেবারে ক্রীতদাসের মত বেহিসেবী বেশী খাটাবার সাধ্য পাবে কোথায়? মহেশবাবুর মাসিক মজুরির হিসাবটা বাঁধা আছে কিন্তু ওঁর খাটার কোন ঘণ্টা ধরা হিসাব —এ রকম কখনো হতে পারে? এলোমেলো খাটেন তো, খানিক খাটেন ঘরে, খানিক খাটেন প্রেসে। হিসেব করলে দেখতে পাবে ঘণ্টা হিসাবেই উনি খেটে আসছেন—ওঁর মজুরিটা অবশ্য একটু বেশী—সামান্য বেশী। বেশী খাটার সুযোগ আছে কিনা—দু'ডবল তিন ডবল ওভার টাইম খেটে উনি বেশী পয়সা কামান।

কালাচাঁদ মাথা চুলকে বলে, মোর সাথে তফাত শুধু এই?

মানব বলে, তবে কি? মহেশবাবুর অবশ্য অনেক বছরের খাটুনি জমা ছিল আগে থেকে। তুমি সোজাসুজি স্কুল থেকে প্রেসের কাজে ঢুকলে, দু'চার মাস আলগা হাত খরচে খেটে বাঁধা মজুরির কাজে লেগে গেলে। মহেশবাবু আরও সাত আট বছর বাপ দাদার পয়সা জলের মত খরচ করে তারপর পয়সা রোজগারের চেষ্টায় নেমেছিলেন। তার পরেও কিছুকাল হয় তো ছ'মাস এক বছর কাজ করেছেন—ছ'মাস একবছর বেকার থেকেছেন। অনেক বছর এমনিভাবে কাটিয়ে তারপর তোমাদের ওখানে ঠেকে পড়লেন।

কালাচাঁদের মুখ দেখে মানব বলে, যোগ বিয়োগের সোজা হিসেবটা জান তো কালাচাঁদ? তোমায় লিখিয়ে পড়িয়ে রোজগেরে করার খরচ আর মহেশবাবুকে রোজগেরে করার খরচটা হিসাব করে ফেল না? দেখবে—মজুরি প্রায় সেই একরকম। মহেশবাবু শুধু বাড়তি ওভার টাইম খাটার সুযোগ পেয়েছেন।

জরুরী একটা লেখার কাজ ছিল। প্রায় শেষ হয়েও এসেছে লেখাটা। মানসিক চিন্তার হ্রদে আরেকবার অল্পক্ষণের জন্য ডুব দিলেই লেখাটা সম্পূর্ণ করে ফেলা যায়।

কিন্তু কি যেন ঘটেছে দেহ-মনে, কি ভাবে কোথায় যেন বিগড়ে দিয়েছে জীবনের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক, লিখতে মানবের মন বসে না।

লেখাটায় মন বসানোর জন্যই নগদ পয়সা খরচ করে রবির দোকানে চা খেয়ে এসে ঠিক তিনটি লাইন লিখে মিনিট পনের কলম হাতে চুপ করে বসে থেকে মানব উঠে পড়ে, পাট করে রাখা ধোপদুরস্ত ধুতি পরে গায়ে চাপায় তার একমাত্র পাঞ্জাবী।

পাঞ্জাবীর নীচে গেঞ্জি পরা নিয়ম কিন্তু একটা গেঞ্জিও তার নেই।

প্রেসের আর কাগজের কাজ চালাবার জন্যই সকাল সকাল চান করে খেয়ে উঠে জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে ভাঙা খাটের বিছানায় বসে

মলয়ায় এনে দেওয়া ওষুধটা সবে মহেশ গিলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ব্যাপার জানতে মানব গিয়ে হাজির হয়।

ঠোঁটে ঠেকানো ওষুধের গেলাসটা নামিয়ে মহেশ তার চিরন্তন হাসি হেসে রসিকতার স্বরে বলে, এক সেকেণ্ড কি দু'সেকেণ্ডের জন্য বিষম খাওয়া থেকে বাঁচলাম। একমিনিট চুপ চাপ বসবে কি—ওষুধটা নিশ্চিন্ত মনে গিলে নেব ?

মানব হেসে বলে, আপনাকে তবে সত্যি সত্যি তাড়ায় নি ? প্রেসের কাজেই যাচ্ছেন ?

ওষুধ খেয়ে কোমরটাকে একটু আরাম দেবার জন্য একমিনিটের জন্য দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মহেশ বলে, তাড়িয়ে দিয়েছিল রে ভাই—ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে কোনরকমে সামলে নিয়েছি। তবে মন বলছে, আর বেশীদিন চলবে না, বরখাস্ত হবই হব। তোমরা এসে কি ভাবে যে বিগড়ে দিলে মনটা আমার, লেখা বাছাই করে করে বুড়ো হয়ে আজ লেখা বাছতে ভুল হয়ে যাচ্ছে !

: সত্যি কি ভুল হচ্ছে ? না, ঠিক বাছাই করছেন ?

মহেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোমরের ব্যথায় মুখ বাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তবু হাল্কা সুরেই বলে, যে বাছাই করে এ বয়সে চাকরী যায় সেটা কি ঠিক বাছাই ? তোমরা আমার মাথা গুলিয়ে দিলে বুড়ো বয়সে।

শেষ পর্য্যন্ত মহেশের আশঙ্কাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আশঙ্কা অবশ্য তার আকাশ থেকে জাগে নি, ধনদাসের রকম সকম দেখেই চাকরী যাবার কথা মনে হয়েছিল।

আইনের হিসাবে ওই পনের দিনের নোটিশেই চাকরী তার খতম হয়ে গেছে কিন্তু ধনদাস ওই নোটিশের কথা উল্লেখ করে না, নতুন কোন নোটিশও দেয় না। মুখে খুব ভদ্রভাবে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় যে পরের মাস থেকে আর তার কাজ করতে হবে না।

মহেশ হাসিমুখেই বলে, আবার কি অপরাধ করলাম ?

ধনদাস তাড়াতাড়ি বলে, না-না, অপরাধ কিছুই করেন নি। ব্যাপার কি জানেন, কাগজটা আমি একটু অন্যরকম করতে চাই।

মহেশ বলে, বলুন না কি রকম কাগজ চান, আমিই করে দিচ্ছি। এতকাল সম্পাদকগিরি করলাম, আপনার মনের মত কাগজ বার করে দিতে পারব না! কিন্তু মুখ ফুটে আমায় তো বলতে হবে আপনি ঠিক কি জিনিষ চান ?

ধনদাস ইতস্তত করে অস্বস্তির সঙ্গে বলে, আমি একজন কমবয়সী লোক রাখতে চাই।

: তাই বলুন! এ বুড়োকে আর পছন্দ হচ্ছে না ?

লোক ঠিক না করে ধনদাস অবশ্য মহেশকে তাড়ায় নি। পরীক্ষামূলক ভাবে তিনমাসের জন্য উমাকান্তকে মহেশের পদে বসিয়ে দিয়েছে।

মহেশের যেদিন থেকে কাজে যাওয়া খতম সেদিন প্রেসের প্রায় সকলেই নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে প্রেসে হাজির হয় এবং একসঙ্গে গোল হয়ে বসে জটলা আরম্ভ করে।

মহেশকে এরকম আচম্‌কা বিদায় করায় তাদের সকলের মনেই গভীর অসন্তোষ জেগেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তারা ভালমত বুঝতে পারে নি।

খারাপ লেখা ছাপিয়ে কাগজের ক্ষতি করার অপরাধে মহেশকে বরখাস্ত করা হয়েছে ?

কোন্ লেখাটা খারাপ ছাপা হয়েছে তাদের অল্পবিদ্যা নিয়ে তারা বুঝে উঠতে পারে না। এবারও দু'একটা জোরালো লেখা ছাপা হয়েছে, কিন্তু মানব আর খাকেকের লেখার মত তেজী নয়। জোরালো লেখা থাকলে তেজী লেখা থাকলে, কোন হিসাবে কাগজের ক্ষতি হয়, সেটা একেবারেই তাদের মগজে ঢোকেনা।

একজন বলে, এবার বরং আরও ভাল হয়েছে কাগজটা।

কালাচাঁদ বলে, ভাই, লেখা বড় কঠিন কাজ। জীবন-যৌবন পণ না করলে কেউ ভাল লিখতে পারে না। মাহুবাবু আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে কোঁচা উড়িয়ে ফুর্তি করে বেড়াতে পারে, কিন্তু কেবল লেখার খাতিরে মোদের বাস্তির ঘরে পচছে, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে অজ্ঞান হচ্ছে। ব্যাপারটা কি বুঝিনে মোটে কিন্তু জীবন পাত করে তো লিখছে, তার লেখা ছাপিয়ে এতকালের চাকরী যাচ্ছে মহেশবাবুর! মোর পেটে যদি বিদ্যা থাকত, লিখতে যদি পারতাম—কত্তাব্যাটাকে একচোট ঠুকে লিখে দেখিয়ে দিতাম মজা!

ধনদাস আসে এগারটায়।

মহেশ বরাবর ঠিক টাইমে এসে কাজ শুরু করে দিত, আজ মহেশ আসবে না। সুতরাং জানা কথাই যে ঠিক সময়ে কাজও শুরু হবে না।

যথা সময়ে উমাকান্তকে সঙ্গে করে ধনদাসকে আসতে দেখে তারা থ' বনে যায়। দেখেই টের পাওয়া যায় যে উমাকান্ত স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়েছে। ঠিক এই সময়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রেসে আসার মানে বুঝতেও তাদের এক মূহুর্ত বিলম্ব হয় না।

হতবম্ব কালাচাঁদ ভাবে, শেষ পর্যন্ত মহেশের যায়গায় বহাল হল উমাকান্ত! প্রকারান্তরে তার বৌকে একরকম খুন করবার জন্য যে দায়ী, মহেশকে চাকরী থেকে একরকম অকারণেই যে তাড়িয়েছে—উমাকান্ত তার কাছে সেই চাকরী মাথা পেতে নিতে পারল! উমাকান্ত যে এই স্তরের মানুষ এটা তো কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারে নি!

ধনদাস হাসিমুখে অমায়িকভাবে উঁচু গলায় সকলকে শুনিয়ে উমাকান্তকে বলে, আপনাকে তো আর কাগজের কথা বুঝিয়ে বলতে হবে না—সবই আপনার জানা আছে।

মহেশের প্রায় চোদ্দ বছর ব্যবহার করা টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে

উমাকান্ত বলে, মোটামুটি জানা আছে, তবে কিনা কোনদিন হাতে নাতে করি নি—প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে।

: সে তো বটেই! আপনি তবে নিজের যায়গায় বসুন, এক একজন করে ডেকে জেনে বুঝে নিন কে কি কাজ করছে। কাগজটার ফাইল আর লেখা দেখিয়ে শুনিয়ে ব্যাপার সব হরেন আপনাকে বুঝিয়ে দেবে—ওর নাম হরেন।

কাগজের ও প্রেসের বহুদিনের প্রুফ রীডারকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে ধনদাস বলে, একবার ভেবেছিলাম মহেশবাবুকেই বলব আপনাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মাইনে নিয়ে যাবেন—সব আপিসে যেমন নিয়ম। তারপর আপনার দিকটা বিবেচনা করে সেটা আর করলাম না—আপনার চেনা লোক মহেশবাবু, আপনি হয় তো লজ্জা পাবেন।

মহেশের সঙ্গে চাকরীর ব্যাপার নিয়ে উমাকান্তের যে অনেক কথা হয়েছে সেটা ধনদাস জানত না, কালাচাঁদও জানত না।

তাই ঘরে ফিরেই মানবকে সবিস্তারে ব্যাপার জানিয়ে উমাকান্তের বিরুদ্ধে প্রায় গালাগালির মত তীব্র একটা মন্তব্য করা সত্ত্বেও মানবকে হাসতে দেখে কালাচাঁদ অবাক হয়ে যায়।

: আপনি হাসছেন?

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, সে ভাব থেকে হাসছি না কালাচাঁদ—না জেনে না বুঝে কিভাবে একজন মানুষ আরেকজনের সম্পর্কে ভুল বিচার করে বসে, তাই ভেবে হেসেছি। তুমি জান না যে উমাবাবু মহেশবাবুর কাছে গিয়েছিলেন, তাঁকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁর চাকরীতে ফিরে যাবার কোন চান্স আছে কি-না, উনি চাকরী নিতে রাজী না হলে মহেশবাবুর কোন লাভ আছে কি-না!

কালাচাঁদ তবু সন্তুষ্ট হয় না, ব্যঙ্গের সুরে বলে, সে তো বুঝলাম—লুকিয়ে চুরিয়ে তলে তলে কাজটা বাগান নি। কিন্তু বৌ মরছে শুনে যে

সেতশো টাকায় বড় একটা বইয়ের কপিরাইট কিনতে চায়—শ্রেফ টাকার অভাবে বৌটা মরার পরেও তার কাছে কোন মানুষ চাকরী করতে পারে মানুবাবু?

তার দিকে ধীর চোখে চেয়ে মানব খানিকক্ষণ ভেবে বলে, তোমায় জানি বলেই বলছি কালাচাঁদ। তাছাড়া, এবার থেকে উমাবাবু তোমারও কাজকর্ম দেখবেন—মনে এরকম বিরাগ থাকলে তোমারও কাজ করতে অসুবিধা হবে। কিন্তু আমাকে কথা দাও—কানে যা শুনবে এখন, মুখে কখনো উচ্চারণ করবে না।

: কথা দিলাম মানুবাবু!

: উমাবাবু ধনদাসকে খুন করার কথা ভাবছিলেন।

কালাচাঁদ চমৎকৃত হয়ে বলে, বটে!

মানব বলে যায়, কিন্তু লেখক মানুষ তো, ভাল করেই জানেন যে একজনকে খুন করাটা কোন শাস্তিই নয়। লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই—কিন্তু মরলে তো সব ফুরিয়েই গেল, মরে গেলে আর কিসে কি আসে যায়? চলতি কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়, সত্যিই মরতে বলার চেয়ে বড় গাল, বড় শাপমন্যি আর নেই। বাঁচতে চাওয়াটাই মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম কিনা—মরতে বলাটা তাই সবচেয়ে বড় গাল। মৃত্যুভয় জাগানো খুব বড় শাস্তি—মেরে ফেলাটা কিন্তু কোন শাস্তিই নয়।

একটু থেমে মানব যোগ দেয়, আমি কিন্তু বক্তৃতা করছি না, তোমায় উমাবাবুর কথাগুলি শোনাচ্ছি কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ একটু অভিভূত ভাবে বলে, উমাবাবু কি এইভাবে কথাগুলি বলেছিলেন? না আপনি ওনার কথা নিজে সাজিয়ে গুজিয়ে বললেন?

: উমাবাবুর মনের অবস্থা বোঝ তো? একঘণ্টার বেশী একটানা এলোমেলো কথা বলে গিয়েছিলেন। আমি তোমায় মোট কথাটা বললাম।

উমাবাবু ব্যাপারটা শুধু অনুভব করেছেন—মাথায় তেমন স্পষ্ট ভাবে ধরতে পারেন নি। তুমি সাফ বুঝতে পারবে। খুন করা ফাঁসি দেওয়ার আসল মানে কি? যে খুন হল, যে ফাঁসি গেল তার কোন শাস্তি নয়। যারা বাঁচতে চায় তাদের জানিয়ে দেওয়া যে এরকম কাজ কোরো না, এরকম করলে মরতে হবে। বুঝেছ ব্যাপারটা?

: বুঝেছি মানুবাবু!

: ধনদাসকে খুন না করে উমাবাবু তাই ওকে ফাঁসিয়ে ফাঁসিয়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে সাজা দেবার সুযোগ হিসাবে চাকরীটা নিয়েছেন।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে কালাচাঁদ বলে, পারবেন না। উনি গায়ের জ্বালায় মিথ্যা প্রতিশোধের স্বপন দেখছেন। সব কিছু বড় কত্তার হাতের মুঠোয়—ওনাকে গোলামের মত চাকরীই করতে হবে। উনি কিছুই করতে পারবেন না।

মানব খুসী হয়ে বলে, ঠিক ধরেছ। এভাবে চাকরী নিয়ে গোলাম হয়ে কি ধনদাসদের ফাঁসানো যায়? নিজের মনের জ্বালায় শুধু জ্বলে মরা! তবু আমি উমাবাবুকে বারণ করিনি। পুতুলদির জন্য প্রাণের জ্বালা তো আছেই—ঘরেই থাকুন আর জ্বালা জুড়োবার সুযোগ খুঁজে চাকরীই করুন—জ্বালা ওঁর নিভবে না। ছ'মাস একবছর যদি পারেন তো করুন চাকরীটা—ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচবে।

আন্তি আগের মতই ঘরে আসে যায়, কথা বলতে বলতে যেন খেলার ছলেই টুকটাক কয়েকটা কাজ সেরে দেয়—সে না করলে যা মানবকেই করতে হত।

কালাচাঁদের লেখার নমুনা এনে শোনায়। বলে, বাবাকে ধমকে দিয়েছি। মা ফিরে এসেছে কুঞ্জর মা চোখ পেতে রেখেছে, সবাই দেখেছে—কেন আসব না? বদনাম মোদের দেবেই বদ লোকে—সে ভয়ে কি কুঁকড়ে থাকব?—আন্তি হাসে।

: সবাইকে বলেছি—বেতন নিয়ে তোমার ঘরে ঝি'র কাজ করি। একেবারে মিছে কথা হবে—তাই তোমার ঘরটা ঝেঁটিয়ে দিই, উনানটা ধরিয়ে দিই—

: আমায় বলে কয়ে উনানটা ধরাতে তো হয়? রাঁধব কিনা খাব কিনা ঠিক নেই—মিছি মিছি উনান ধরিয়ে কয়লা পুড়িয়ে ছাই করা!

আত্তি রেগে মাথা উঁচু করে ছ'চোখে অনুশাসন ফুটিয়ে বলে, রাঁধবে কিনা ঠিক নেই মানে? ছ'বেলা রাঁধবে, ছ'বেলা পেট ভরে খাবে। না খেয়ে মানুষ বাঁচে? না খেয়ে মানুষ খাটতে পারে? অমন ছাই লেখা দিয়ে কাজ নেই, লেখা চুলোয় দিয়ে সেই চুলোয় ভাল ভাল রান্না রেঁধে পেট ভরে খেলে অনেক ভাল হয়। আর্সিতে একবারটি তাকিয়ে ছাখোনা কি চেহারা হয়েছে নিজের?

: ভাল ভাল জিনিষ রেঁধে খাবার পয়সা কে দেবে?

: আদায় করবে। তোমার লেখা যাদের দরকার তারা পয়সা না দিলে লিখবে না!

আত্তির নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব—আদায় করাটা যেন সংসারে এমনি সহজ ব্যাপার!

তবে হ্যাঁ, লেখকের খামখেয়ালি করতে হওয়ার কুসংস্কারে কতগুলি বাজে ঝোঁকে মানব যে এত কষ্টে রোজগার করা পয়সা নষ্ট করত—আত্তি ওরকম কয়েকটা পাগলামি সামাল দিয়ে সে পয়সাটা ছ'বেলা পেটে অন্ন দেবার ভোঁতা বিশ্রী একঘেয়ে দরকারে লাগাতে তাকে বাধ্য করেছে। ধোঁয়ার চেয়ে খাদ্য যে ঢের বেশী দামী এই সহজ সত্যটা তার মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করে চলেছে অবিরাম।

হয় তো লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই মানব বলে, বেশী বক্ বক্ না করে এক প্যাকেট সিগ্রেট আনিয়ে দিলে সত্যিকারের কাজ হত আত্তি। বালিসের নীচে পয়সা আছে।

বালিশের নীচের পয়সার পরিমাণটা দেখে আত্তি হিসাব করে পয়সা নিয়ে যায়—দু'টো সিগারেট, এক বাণ্ডিল বিড়ি আর এক জোড়া ডিম নিয়ে আসে।

গন্ গন্ করে উনান জ্বলছে। চটপট অল্প তেলে একটা ডিমের মামলেট ভেজে চা করে এনে দিয়ে বলে, বুদ্ধির গোড়ায় খালি ধোঁয়া দিলেই হয় না—পেটের পূজা না করলে বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

: বেশী খেলে লিখতে পারি না যে!

আত্তি গালে হাত দেয়।

: একটা ডিমের মামলেট আর এক কাপ চা তোমার বেশী খাওয়া? না খেয়ে লিখে লিখে কী ছুঁচিবাইটাই করেছ! মোদের তুমি আবার ছুঁচিবাইয়ের খোঁচা দাও!

মুখে যাই বলুক মানব সাগ্রহে মামলেট মুখে দিয়ে পরম আয়াসে চা খেতে শুরু করেছে দেখে আত্তি খুসী হয়ে বলে, মা'র ক'টা কাজ সেরে আসি। বাবার একটা লেখা শোনাব।

কালাচাঁদ নতুন নিয়ম করেছে লেখার সাধনা চালাবার।

সারাদিন খেটে এসে সে মানবের ঘরে বাতির আলোয় শুধু পড়ে—আধ ঘণ্টা পড়ে হাই তুলতে শুরু করে কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় আরও আধ ঘণ্টা পড়া চালিয়ে যায়।

তারপর কাঁকর ভরা চালের ভাত বা পচা আটার রুটি এবং ডাল তরকারী যা আত্তির মা দেয় তাই গোগ্রাসে গিলে বিছানায় চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রোজ এক সময়ে না হলেও খানিকটা রাত্রি বাকী থাকতেই সে জাগে এবং আলসেমির অভ্যস্ত মোহ কাটিয়ে গায়ের জোরে উঠে পড়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এক জামবাটি জল খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে লিখতে বসে যায়। লেখার জন্য মানবের জোর আলোর বড় ল্যাম্পের মতই একটা ছোট ল্যাম্প সে কিনেছে।

মানবের ল্যাম্পটা সমস্ত ঘর আলোকিত করে—একেবারে লেখার কাগজের মাথার কাছাকাছি বসালে কালাচাঁদের ছোট ল্যাম্পটা ঘরে আলো ছড়ায় সামান্য—কিন্তু তার লেখার কাগজে প্রায় মানবের বড় ল্যাম্পের মতই আলোক পাত করে।

একটা মানুষ খাটতে যাবে। খেটে যেমন হোক কিছু সে পয়সা আনবে। সারাদিন খাটতে যাওয়ার জন্য তাকে খাইয়ে পরিয়ে তৈরী করে দিতে হবে বৈ-কি।

কালাচাঁদ খেতে বসলে তার নতুন লেখার নমুনা নিয়ে আত্তি মানবের ঘরে আসে, বলে, শোন দিকিনি বাবার এ-লেখাটা কেমন হয়েছে?

লেখাটা পড়া চলতে চলতেই কোনদিন কালাচাঁদ খাওয়া শেষ করে এসে একপাশে বসে, কোনদিন লেখা পড়ে শেষ হবার পর মানবের মন্তব্য শুরু হওয়ার পর আসে।

সেদিন বড়ই উৎফুল্ল মনে হয় আত্তিকে। ঘরে এসেই চাপা উত্তেজনার সুরে সোৎসাহে বলে, বাবা একটা কবিতা লিখেছে মানুবাবু!

মানব প্রুফ দেখছিল। মুখ তুলে বলে, কবিতা লিখেছে? হতেই পারে না। কালাচাঁদের কবিতা লেখার ক্ষমতা নেই আত্তি। কালাচাঁদ ছড়া লিখেছে। কবিতার মত যা কিছু লিখবে, সব ছড়া হয়ে যাবে।

আত্তি ফুঁসে উঠে, বটে নাকি? তবে শুনে কাজ নেই। কবিতা লিখবে তোমরা আর মোর বাবা কবিতা লিখলে তা হবে শুধু ছড়া! অত খায় না!

মানব হেসে বলে, ছড়া কি কবিতার চেয়ে ছোট রে পাগলি? একটা ছড়া মুখস্থ হয়ে যায় সব মানুষের—হাজার কবিতা শূন্যে মিশে যায়।

আত্তি নম্র হয়ে বলে, তাই বলো—ওসব কি আমরা জানি বুঝি?

কথা শুনে ভাবলাম কবিতা না লিখে ছড়া লেখা মহাপাপ—মোর বাপটা বুঝি পাপ করেছে।

: ছড়াটা শোনা না আত্তি, বেশী বক্‌বক্‌ না করে?

ছড়া শুনে মানব অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তার ভাব দেখে আত্তিও মুখ ফুটে তার মতামত জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

শেষে বিরক্ত হয়ে বলে, কি হল? কিছু বলবে তো?

: কিছু বলতে পারছিনা যে? একবার মনে হচ্ছে অদ্ভুতরকম ভাল হয়েছে—আবার মনে হচ্ছে সবটা ছেলেমানুষি ব্যাপার!

তার এই মন্তব্যে আত্তি কিন্তু খুসীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

: উড়িয়ে দিতে পারছ না তো? বলতে পারছ না তো বাজে হয়েছে?

মানব মাথা নেড়ে বলে, না—উড়িয়ে দেয়া যায় না, বাজে বলা যায় না। কালাচাঁদ তোকেও পয়দা করেছে, ছড়াটাও পয়দা করেছে। মনে হচ্ছে, ছড়াটাকে উড়িয়ে দিলে বাজে বললে, তোকেও উড়িয়ে দিতে হয় বাজে বলতে হয়!

আত্তি খুসীর হাসি হেসে বলে, এবার যেদিন খুসী যখন খুসী মোকে আদর কোরো। তোমায় জেনে গেছি চিনে গেছি—তোমার আদর সস্তা নয়। তোমার আদর পাওয়া মোর ভাগ্যির কথা।

খালেকের সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে কালাচাঁদের ছড়ার একটা আশ্চর্য মিল আছে মনে হয়—সরলতার মিল।

খালেকের যায়-যায় অবস্থা। তবু হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সে কবিতা লিখছে। যখন চলে ফিরে বেড়াত, জীবনের স্তরে স্তরে খোঁজ করত কবিতার প্রাণবস্তু—তখনও সে এর সিকি কবিতাও লেখেনি।

জীবনদীপ নিভে আসছে জেনে হাসপাতালে রোগ-শয্যায় শুয়ে সে যেন তার বক্তব্যকে কাব্যরূপ দিতে ব্যাকুল হয়েছে।

তার কবিতা পড়ে উমাকান্ত মানবকে বলে, এ কবিতা না ছেপে তো পারব না। কেন তুমি ওর কবিতা এনে আমায় শোনাও? এই কবিতা ছাপিয়ে জেলে গেলে ভাল হবে?

মানব কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, যান না একবার জেলে! এদেশে জেল না খেটে অনেককাল বেঁচেছেন, একবার নয় জেলের অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করবেন। খালেক যে আটাশ বছরে মরছে?

: ওর কবিতাটা তাই ছাপাতেই হবে? আটাশ বছরে মরছে বলে?

: না-না, আপনি সম্পাদক—লেখা ছাপানো না ছাপানো আপনার খুসী। আমরাও কি আপনার ঝঞ্ঝাট জানি না? এ কবিতা না ছাপতে পারলে কিছুমাত্র দোষ ধরব না।

: এ কবিতা না ছাপিয়ে পারব না।

: তবেই দেখুন, আমার কোন দোষ নেই।

উমাকান্ত নীচু গলায় বলে, কবিতাটা এমাসেই ছাপিয়ে দেব—গল্প বুঝি আর লিখছ না?

: গল্প একটা লেখা আছে—আপনার জন্যেই। এ মাসে খালেকের কবিতাটা যাক—সামনের মাসে আমার গল্পটা যাবে। একমাসে আমাদের দুজনের লেখা ছাপলে আপনার তো আবার বিপদ ঘটবে!

: যা হবার হবে তোমার গল্পটা এনে দাও।

এক সংখ্যায় মানবের কড়া গল্প আর খালেকের বাঘা কবিতা বার হয়, দিন কাটে কিন্তু ধনদাস একটি কথাও বলে না। উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবে, লেখা দুটো কি তার চোখ এড়িয়ে গেছে?

মানবের সেদিন হঠাৎ জ্বর এল। সাধারণ সর্দি জ্বর নয়, একেবারে হাড়কাঁপানো খাঁটি জাতের জ্বর।

শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল ক'দিন, দুপুরে সস্তা হোটেলে দু'একটা রুটি আর দু'এক আনার আলুর দম খেয়ে আসবে ভেবে সে আর সকাল বেলা রান্নার আয়োজন করে নি।

একটা জরুরী লেখা লিখতে বসেছিল।

লেখা কিন্তু কিছুতেই এগোলো না। বেশ শীত শীত করতে লাগল বেলা দশটা নাগাদ।

এগারটায় দড়ির খাটিয়ায় বিছানো ছেঁড়া সতরঞ্চিতে পুরানো তোষকটা গায়ে চাপিয়ে গুঁড়িসুড়ি হয়ে শুয়েও ভিতরের হাড়কাঁপানো শীতে সে কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক্ করে।

জর যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চড়তে থাকে, মাথার মধ্যে ভাবনা চিন্তা কেমন গোল পাকিয়ে যায়, একটা আধা-সচেতন অবস্থায় সে আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে। কিন্তু তার মধ্যেই সে টের পায় যে আভি এসে শিয়রে বসে কপালে জলপটি দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে আরম্ভ করেছে। কুঞ্জর মার তর্জন গর্জনও তার কাণে আসে।

আভির তীক্ষ্ণ চীৎকারে চমকে উঠে রক্তবর্ণ চোখ মেলে একবার দেখবার চেষ্টাও করে তার মুখ।

: জরে গা আগুণ হয়েছে, হুঁশ হারিয়েছে—মরে যাবে না মানুষটা? চেঁচাস্‌নে। গিয়ে ঘাড় মটকে দিয়ে থামালে ভাল হবে?

সন্ধ্যার পর কখন কালাচাঁদ আসে, উবু হয়ে থাকে, চুপচাপ বসে আভি বরফ এনে দিতে বললে কখন সে বরফের সঙ্গে দু'বছর ডাক্তারি পড়া লাইসেন্স হীন ডাক্তার শশাঙ্ককেও ডেকে আনে—দু'বছর ডাক্তারি শেখা বিদ্যা আর চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে শশাঙ্ক তার গা ফুঁড়ে কি ওষুধ দেয়, কিছুই মানব জানতে পারে না।

শেষ রাত্রে ঘাম দিয়ে তার জর কমে যায়।

কেরোসিনের বড় ল্যাম্পটা জ্বালানই ছিল। নিজের এতকালের চেনা

ল্যাম্পের আলোয় জেগেও মানবের মনে হয় কোন এক অজানা জগতে যেন তার ঘুম ভেঙেছে।

কালাচাঁদ মেঝেতে একটা মাদুরে চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আত্তি বসে আছে শিয়রে।

বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগে মানবের সে কোথায় আছে, কেন আছে, কি হচ্ছে, ব্যাপার বুঝতে।

কয়েকবার চোখ খুলে চোখ বুজে আত্তিকে একভাবে শিয়রে নিথর মূর্তির মত বসে থাকতে দেখে নিয়ে, কয়েকবার এপাশ ওপাশ ফিরে মানব ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, একটু জল খাব।

: দিচ্ছি জল।

তারই কুঁজো থেকে তারই কাঁচের গেলাসে জল ভরে এনে আত্তি এবার আর শিয়রে বসে না। খাটিয়ায় বিছানার পাশে বসে বাঁ হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে খানিকটা উঁচু করে ধরে ডান হাতে গেলাসটা তার মুখে ধরে বলে, খাও—জল খাও।

কী মিষ্টি লাগে ভাঙা টিউব ওয়েলের জল!

কী মধুর লাগে আত্তির গায়ের আলগা আলগা স্পর্শ!

এক গ্লাস জল খেয়ে খাটিয়ায় জোড়াসন হয়ে বসে মানব ক্ষীণ জড়ানো গলায় বলে, সারা রাত জেগে আছো বুঝি?

আত্তি মৃদুস্বরে বলে, কী জ্বরটাই তোমার হয়ে গেল। ডাক্তার বললে এ নাকি একরকমের ম্যালেরিয়া—তখন স্বস্তি পেলাম।

: আমার জ্বর হলে তোমার কিসের অস্বস্তি?

: ডাক্তার আরও কি বলল শুনবে? এই বয়সে তোমার গায়ে মোটে জোর নেই—জ্বরটা তাই এত কাবু করেছে। ভাল ভাল খাবার খেতে বলেছে ডাক্তার—বুঝলে?

মুখের কাছে মুখ এনে হাত নেড়ে তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মানব একটু হেসে বলে, বুঝলাম।

মানবের আসল জ্বর ছেড়ে গিয়ে উল্টো পালা শুরু হয় কুইনিনের জ্বরবোধ আর নেশার।

যেহেতু ম্যালেরিয়া জ্বর, ঠেসে কুইনিন দাও। হাতুড়ে ডাক্তার শশাঙ্ক সোৎসাহে গা ফুঁড়ে কুইনাইন দিয়ে, দৈনিক তিনবার করে খাবার জন্য কুইনাইন মিকশ্চার দিয়ে সগর্বে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল—দু'টাকা দক্ষিণা আদায় করে

মানবের শরীর কমজোরী বলে জ্বরের প্রতাপ বেশী হয়েছিল এটা ধরতে পেরেও তার খেয়াল হয় নি যে এই রোগীকে একটু হিসেব করে কুইনিন দেওয়া উচিত।

কালাচাঁদের ঘুম ভাঙ্গলে মানব কাতর কণ্ঠে বলে, একবার ডাক্তারের কাছে যাবে কালাচাঁদ? বলবে যে জ্বর নেই কিন্তু আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, গা ঘামছে!

কালাচাঁদ ঘুরে আসে। ডাক্তার আর কি বলবে, সবাই যা জানে সেই চিরকেলে কথা—বেশী করে দুধ খাও!

দুধ!

মানব বালিশের তলাটা হাতড়ায়। বালিশের নীচে গোটা তিনেক টাকা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আভি কি তার দিকে নজর পেতে রেখেই ঘরের কাজ করছিল? কোথা থেকে এসে বলে, টাকা নেই—ডাক্তারকে দিয়েছি, ওষুধের দাম লেগেছে। কুলোয় নি ওতে, মোদের কাছে কিছু ধার করেছ।

তবে আর কথা কি!

আভি কিন্তু যোগাড়ে মেয়ে। কালাচাঁদের কাছেই বোধ হয় সে

ব্যাপার শোনে, পনের বিশ মিনিটের মধ্যে এক বাটি দুধ হাতে করে এসে বলে—ধার আরও বাড়ল, সেরে উঠে শোধ দিও।

যে লেখাটা লিখতে লিখতে জ্বর এসে গিয়েছিল সেটা শেষ করলেই ধার শোধ হবে। কিন্তু শশাঙ্কের কুইনিনের এমনি তেজ যে তিন দিনের মধ্যে মানব লিখতে বসতেই পারে না।

আগেকার চেনা একজন ভাল ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে সব কথা খুলে বলে, ডাক্তার মন দিয়ে শুনে একটু হাসে।

বলে, ব্যাপারটা বুঝে দেখুন! কুইনিন দিয়েছে ঠিক তাতে ভুল নেই। কিন্তু অতিরিক্ত রকম বেশী দিয়েছে। জানে না যে তা নয়, আসলে মেশাল দেওয়া কমজোরী ভেজাল ওষুধ বেশী ডোজে দিয়ে থাকে, আপনাকেও তাই দিয়েছে' কোন কারণে আপনার বেলা পড়েছে খাঁটি ওষুধ।

মানবও হেসে বলে, আমারই সৌভাগ্য!

কুইনানের নেশা কাটে তিন দিন পরে। জ্বরের নেশা আর ওষুধের নেশা কাটিয়ে উঠে মানব ভোরবেলা খাটিয়ার বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করে—কী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে তার খাটিয়ার ময়লা বিছানা থেকে!

লেখক হিসাবে খাঁটি থাকার জিদের ফলে তার যেন বেশীরকম দুর্দ্দশা দাঁড়িয়েছে। অনেকদিন পরে প্রাণটা বড় জ্বালা করে—যতক্ষণ না খালেককে মনে পড়ে।

৯

প্রেসের ম্যানেজার আর কাগজের সম্পাদক হয়ে ভেতরে ঢুকে ধনদাসকে একেবারে ফাঁসিয়ে দেবার কল্পনা ছিল উমাকান্তের। মুখে আনুগত্য জানাবে, কাজও মোটামুটি ঠিকমত করে যাবে, এদিকে তাকে তাকে থাকবে আর সুযোগ পেলেই ডুবিয়ে দেবে ধনদাসকে।

মানব কালাচাঁদের কাছে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে ধনদাসের কিছুই করতে পারবে না উমাকান্ত—এভাবে ধনদাসকে ফাঁসানোর চেষ্টা নিছক পাগলামি।

তবু তারা পুতুলের শোকে কাতর উমাকান্তের পাগলামিতে সায় দিয়েছিল এই ভেবে যে সে যখন ধনদাসকে নিয়মসঙ্গতভাবে ফাঁসাবার ইচ্ছাই পোষণ করে, হঠাৎ খাপছাড়া কিছু সে যখন করবে না, কারো যখন কোন ক্ষতি নেই—মহেশের স্থানে করুক সে কিছুদিন চাকরী। ছেলেমেয়েরা বাঁচুক, সে নিজেও একটু সামলে সুমলে উঠুক।

মানবের ভবিষ্যদ্বাণী শুধু সার্থক প্রমাণিত হয় না—দেখা যায় সে খুব কম করেই বলেছিল।

উমাকান্ত কাজে লেগে ধনদাসকে ফাঁসিয়ে দেবার বদলে তাকে যেন ফাঁপিয়ে দেয়।

রস-সাহিত্যের বিক্রী বাড়ে, বিজ্ঞাপন বাড়ে।

প্রেসের কাজ—ভাল ভাল পার্টি থেকে পাওয়া কাজ—এত বেড়ে যায় যে ধনদাসকে কয়েক মণ নতুন টাইপ আর কয়েকজন নতুন কম্পোজিটার আমদানী করতে হয়।

উমাকান্তকে ধনদাস প্রায় খাতির করতে আরম্ভ করে জামায়ের মত। তাদের সম্পর্ক যে শুধু মাইনে-দেনেওলা মনিব আর খেটে-খাওয়া চাকুরের—এটা বাতিল করার জন্য উমাকান্তের চেয়ে তারই যেন গরজটা বেশী দেখা যায়।

শরীর ম্যাজ ম্যাজ করলেই, লেখার কাজে জমে গেলেই, উমাকান্ত কাজে যায় না। মাস হিসাবে নয়, হপ্তায় সে গড়পড়তা দু'একদিন কামাই শুরু করেছে। তবু ধনদাস কিছুই বলে না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করে যে কি হয়েছিল—উমাকান্ত যে কৈফিয়ৎ দেয় তাই সে উদারভাবে প্রশান্তমুখে মেনে নেয়।

প্রেসের উন্নতির কার্য কারণটা বুঝে উঠতে পারে নি, বুঝবার মত মাথাও ধনদাসের নেই। ও-সব জটিল হিসাব বুঝবার সাধও তার নেই। ধনদাস শুধু বোঝে যে মহেশকে তাড়িয়ে উমাকান্তকে সেই পোষ্টে এনেই তার ভাগ্য খুলে গেছে।

কাজে এত ফাঁকি দেয় উমাকান্ত, মৃত্যুশয্যাশায়ী থালেকের কবিতা ধনদাসের নিষেধ সত্বেও রস-সাহিত্যে ছাপিয়ে দেয়—মানবের একটা ধারাবাহিক উপন্যাস পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসা না করেই ছাপতে শুরু করে—তবু ধনদাস বছর ঘুরতে না ঘুরতে উমাকান্তকে বিনামূল্যে অফার করে শতকরা পঞ্চমাংশ শেয়ার।

একটু যেন লজ্জিতভাবেই বলে, যা করেছেন তার তুলনা হয় না। মালিকানার সামান্য একটু অংশ দিচ্ছি—আরও বেশী আপনার পাওয়া উচিত ছিল।

: আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চান?

: বাঁধা তো পড়েই গেছেন—আর বাঁধনে ভয় কি? মাইনে যা আছে তাই রইল—মাসিক কাজের হিসাবে একটা কমিশন পাবেন। সারা বছরের হিসাবে লাভের এই পাঁচ পার্সেণ্ট পাবেন।

উমাকান্তের মুখ কেন খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না ধনদাস বুঝতে পারে না। লেখকেরা খাপছাড়া মানুষ সন্দেহ নেই।

কিছু অবশ্য আসে যায় না তাতে। প্রেস আর কাগজের উন্নতিই তার আসল হিসাব—একমাত্র হিসাব। আবার ধনদাস হেসে বলে, গা লাগিয়ে কাজ করছেন—আরও একটু গা লাগান না? আমার লাভ বাড়িয়ে দিলে আপনার কোন লাভ নেই, আপনি কোন ভাগ পাবেন না, এ ধারণা মনেও স্থান দেবেন না। ফাইভ পার্সেণ্ট লাভের মালিকানা এমনিতেই দিলাম—পুরস্কার হিসেবে। চেষ্টা করে যত বাড়াবেন তত আপনার মালিকানার শেয়ার বাড়বে। একদিন হয় তো আমার সমান বখরাদার হয়ে যাবেন।

কালাচাঁদ সবই শুনতে পায়।

উমাকান্ত এসব কথা মানব, মহেশদের যা বলে তাতে মিথ্যার ছাপ না থাকায়, কিছুই বানিয়ে না বলায়, কী খুসীই যে হয় কালাচাঁদ!

কে কোন্ দরের লেখক ভগবান জানেন কিন্তু এরা খাঁটি মানুষ, মিথ্যার সঙ্গে এরা কারবার করে না।

উমাকান্ত হঠাৎ প্রাণান্তকর আপশোষের সঙ্গে বলে, কি ভেবে গেলাম, কি দাঁড়াল! চুটিয়ে চাকরী করছি—কাগজটাকে ফাঁপিয়ে দিচ্ছি।

মানব বলে, করে যান না চাকরী, কি আসে যায়? একজন জাত সাহিত্যিক, কাগজটাকে ভাল না করে তাজা না করে কি আপনি পারেন? ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা নিয়ে মেতে থাকলে কি সাহিত্যিকের চলে উমা-দা—সাহিত্যিকের অনেক বড় ধর্ম পালন করতে হয়। কি রকম জ্যান্ত করে তুলেছেন কাগজটাকে!

: ধনদাসকেও ফাঁপিয়ে দিচ্ছি।

: দিন না ফাঁপিয়ে—ফাঁপতে ফাঁপতে ফটাস্ করে ফেটে যাবে।

তার বলার ভঙ্গিতে কালাচাঁদ সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে অনেক চেষ্টায় নিজেকে সামলে নেয়।

উমাকান্তের চাকরি বছর পার হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে চাকরি নিয়েছিল, ফল অবশ্য হয়েছে তার বিপরীত—ধনদাসকে ডুবিয়ে দেবার বদলে তার ছাপাখানা আর কাগজ দু'য়েরই অনেক শ্রীবৃদ্ধি স্বেচ্ছায় না হলেও তার জন্যই হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রাণের জ্বালা কি কমে গিয়েছে উমাকান্তের? পুতুলের শোচনীয় মরণের স্মৃতি কি মুছে গেছে তার মন থেকে? নিভে গেছে প্রতিহিংসার আগুন?

এ আগুন নিভবার নয়। কিন্তু কি করবে—কাজে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তার নেই। কাজে ছুটকো ফাঁকি দিয়ে ধনদাসের সর্বনাশ করার

সাধও অবশু তার মিটবে না, ছশো' পাঁচশো টাকা কতি করিয়ে দিলে কি আসবে যাবে ধনদাসের !

না, ধনদাসকে সুযোগ-সুবিধামত প্রাণে মেরে ফেলার কথা সে আগেও ভাবে নি, আজও ভাবে না। মাঝে মাঝে সে শুধু ভাবে যে ওকে মারা কত সহজ !

ধনদাস চোখের সামনে এলেই সে তার মুখে মৃত্যুর ছাপ দেখতে পায়,—সদাজাগ্রত মৃত্যু যেন একটা ঘুমন্ত ভাবের ছাপ হয়ে তার মুখে সব সময় সেঁটে আছে।

পুতুলের গলা ছিল মাখনের মত নরম, শুধু একটা দাড়ি-কামানো ক্ষুরের ঘায়েই জল বা বাতাস কাটার মত অনায়াসে তার গলাটা ফাঁক করে দেওয়া যেত। কিন্তু ওভাবে পুতুলকে কেউ খুন করে নি।

ধনদাসের শুষ্ক-শীর্ণ কাঠির মত বিসদৃশ গলাটা দেখে উমাকান্তের মনে হয় যে ওর গলার জন্য একটা পেন্সিল কাটা সাধারণ ছুরিও দরকার হয় না, খালি হাতে মুঠো করে ধরে মোচড় দিলেই গলাটা মটকে যাবে।

মাঝে মাঝে তার চাউনি দেখে ধনদাস দারুণ অস্বস্তিবোধ করে।

: কি দেখছেন হাঁ করে ?

উমাকান্ত চমকে উঠে। দ্রুতবেগে কয়েকবার চোখ বন্ধ করে আর খোলে, মাথায় ঝাঁকি দেয়।

: না-না, কিছু নয়।

: শুনেছেন তো যা বললাম ?

: শুনেছি বৈ-কি।

ধনদাসের বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু জেরা করে দেখা যায় উমাকান্ত সব কথাই মন দিয়ে শুনেছে এবং ভাল করে বুঝেছে। কাজের কথা একটিও তার কান এড়িয়ে যায় নি।

ধনদাস তখন একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, আপনার ভাব দেখে মনে

হচ্ছিল অন্য কোন জগতে বুঝি চলে গেছেন! একাই থাকেন নাকি বাড়ীতে?

: ছেলেমেয়ে ক'টা আছে।

: তা জানি। আপনার ছেলেমেয়ের খবর কি আর রাখি না মশায় আমি? আপনি তো আর ডাকবেন না, সেদিন বাড়ী খুঁজে নিজে গিয়ে পরিচয় করে এসেছি।

: ওদের কাছে শুনছিলাম।

: একা থাকেন মানে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে মেয়েছেলে তো কেউ থাকে না? সংসার দেখবার কেউ নেই?

: না।

ধনদাস একটু চুপ করে থেকে বলে, আর কেন উমাবাবু, এবার একটা বিয়ে থা করে ফেলুন। শোক-দুঃখ সব সয়েই বাঁচতে হবে তো মানুষকে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন? একটি ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলুন, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও করতে পারবে।

: বিয়ে? কি বলছেন আপনি?

উমাকান্তের ব্যাকুলতা দেখে ধনদাস একটু ভড়কে গিয়ে বড়ই বিরক্ত হয়। কে জানে কি অদ্ভুত মতিগতি হয় লেখক মানুষদের!

ধনদাস চলে যাওয়ার পর উমাকান্ত বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবে। আজ স্পষ্ট রূপ নিয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে ধনদাসের এই আগ্রহ ও মনোযোগের ভাবটা সে কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছিল।

একটা স্নেহপুষ্ট উদার মনোভাব যেন তার সম্পর্কে গড়ে উঠেছে ধনদাসের মধ্যে, তার সে মঙ্গল চায়, তাকে সে সুখী করতে চায়।

চাকরীর সাদামাটা সম্পর্ক ছাড়াও তার সঙ্গে খানিকটা পোষ্য পোষকের সম্পর্ক গড়ে তোলার সাধ যেন জেগেছে ধনদাসের। মুখের তোষামোদ নয়, পা-চাটা নম্রতা নয়—বয়স্ক তেজস্বী পুত্রের কাছে বাপ যেমন অকৃত্রিম

সমারোহহীন সহজ আনুগত্য পায় তেমনি একটু ব্যক্তিগত আত্মীয়তা এবং নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভাব।

মানুক বা না মানুক তার কথাগুলি অন্তত নীরবে শুনে যাবার সম্মানটুকু দেখাবে, তার উদারতা এবং উপকার খুশী হয়ে গ্রহণ করবে।

উমাকান্ত বুঝতে পারে, অনেক অপরাধের ক্ষমাই তার জুটবে ধনদাসের কাছে। মহেশের যে ভুল ত্রুটি সহ্য করাই সম্ভব হত না, তার সেরকম ভুল ত্রুটি হয় তো তাকিয়ে না দেখেই উপেক্ষা করবে ধনদাস।

একটা কথা মনে হওয়ায় হাসবে না কাঁদবে উমাকান্ত ভেবে পায় না। একটু নম্র আর নত হয়ে যদি সে কিছুদিন চলে, একটু যদি খাতির করে চলে তার প্রতি ধনদাসের পিতৃত্বমূলক পক্ষপাতের সাধটাকে—কিছুদিন পরে আব্দার ধরলে তার উপন্যাসের কপিরাইটও হয়তো ধনদাস এমনিই তাকে ফিরিয়ে দেবে!

অনুতাপ নয়, অনুতাপের ধার ধনদাস ধারে না। সুযোগ পেলেই মানুষের ঘাড় ভেঙে লাভ করা তার স্বভাব এবং পেশা—ওদিকে পুতুল মরেছে বলেই উদারভাবে তার তাড়াতাড়ি উমাকান্তকে বেশী টাকা রয়ালটি দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, না দিয়ে সে মহাপাপ করেছে—এসব কথা আজও ধনদাসের কাছে হাস্যকর ঠেকবে। মানেই সে বুঝতে পারবে না, ওসব হিসাব নিকাশ বিচার বিবেচনার!

উমাকান্ত বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বছরখানেক তার সঙ্গে কারবার করে ধনদাস জেনেছে যে সে সাদাসিদে ভাবুক চিন্তাশীল মানুষ, ঠকামি ও জুয়াচুরির সুযোগ সুবিধা পেলে সেটা কাজে লাগাবার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না, কখনও কখনও অলস মনে হলেও যখন কোন কাজে মন দেয় তখন প্রাণপণে না খেটে সে পারে না।

এটাও ধনদাস টের পেয়েছে যে পক্ষপাত ও উদারতা দেখালেও সে

কোনদিন সেটা নিজের কাজে লাগিয়ে তার অসুবিধা ঘটাবার চেষ্টা করতে পারবে না। ওটা তার ধাতেই নেই।

ওদিক থেকে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। বরং উমাকান্তের কোন উপকার করতে ইচ্ছা হলে তাকেই নিজে থেকে যেচে করতে হবে।

সব শুনে মানব হেসে বলে, পছন্দ হয়ে গেছে, বাঁধবার চেষ্টা করছে ? করুক না! আপনাকে আমাকে বাঁধবার সাধ্য কি ওর আছে?

তারপর বলে, ঠিক আমার কাকার মত। আমার জন্য ওই ধরণের একরকম মনোভাব—মমতা বলব না, জিনিষটা স্নেহ মমতার মত কিছু নয় —ঝোঁক আছে বলাই ভাল। উনিও চান যে আমি গিয়ে খুব অনুগত হয়ে থাকি। খুব ভাল ব্যবহার করবেন, স্নেহ দেখাবেন, সব কিছু করবেন—শুধু ওই বোঝাপড়াটুকু চাই যে, আমার ভাল চেয়েই উনি আমায় চালাচ্ছেন, আর উনি যেমন চান আমি তেমনিভাবে চলছি।

: বড়ই বিশ্রী লাগছে। ভাবলাম একরকম, হয়ে যাচ্ছে আরেকরকম।

: যদ্দিন পারেন চালিয়ে যান। এদিকে মহেশবাবুর কাগজ গজাচ্ছে, আপনার কদর আরও বাড়বে।

পুতুলের দাদা মনোহর পাটনায় চাকরী করে। পুতুলের মা এবং ভাইবোনেরা সেখানে তার কাছেই থাকে।

পুতুলের আপনজনদের ভুলে থাকার স্বস্তি বোধ করার জন্য উমাকান্ত নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল যে ওদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র পুতুলের সঙ্গেই ছিঁড়ে গেছে। প্রথম দিকে যন্ত্রের মত দু'একখানা চিঠির জবাব দিয়েছিল, তারপর মানসিক বিপর্যয় চরমে ওঠার পর অন্যান্য চিঠির মত পাটনার চিঠিও আর খুলে পড়ে ভাখে নি।

পরে অনেকের সঙ্গে আবার তার চিঠিপত্রের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে,

কিন্তু পাটনা থেকে আর কোন চিঠি আসে নি। তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, তার ওপর চিঠি লিখে জবাব পায় না—কি এমন তাদের গরজ পড়েছে যে গায়ে পড়ে চিঠি লিখে লিখে একতরফা সম্পর্ক বজায় রাখবে?

কতগুলি বইপত্রের নীচে না-খোলা না-পড়া চিঠিগুলি চাপা ছিল—একদিন নজর পড়ায় খুলে উমাকান্ত পড়ে দেখেছিল। পুতুল মারা যাওয়ার দু'মাস পরে লেখা চিঠিতে পুতুলের বোন মুকুলের বিয়ের কথা প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল—তারপর তিন চার খানা চিঠিতে মনোহর বিশদভাবে জানিয়েছে যে মুকুলের বিয়ের জন্য তারা কিরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে,—চেষ্টা তারাও করছে, উমাকান্তও যেন চেষ্টার ত্রুটি না করে।

এতই কি বড় হয়ে গেছে মুকুল তিন চার বছরে? তিন চার বছর আগে পুতুলকে নিয়ে যখন সে পাটনায় গিয়েছিল তখন তো তেমন বড় মনে হয় নি তাকে!

ফাল্গুনের গোড়ায় উমাকান্ত মনোহরের আরেকখানা পত্র পায়। সে তিনমাসের ছুটি নিচ্ছে, সকলকে নিয়ে কলকাতায় এসে ছুটিটা কাটাবে—তার জন্য কম ভাড়ায় ছোটখাট একটি বাড়ী যেন উমাকান্ত খুঁজে পেতে ঠিক করে রাখে।

মুকুলের কথা উল্লেখ করে নি কিন্তু আত্মীয়তা ভরা চিঠি। খবরাখবর আদান-প্রদান না করার জন্য অনুযোগ, ছোটবড় দরকারী সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখার জন্য অকুণ্ঠ দাবী, তার জন্য সকলের গভীর চিন্তায় দিন কাটানোর সংবাদ!

পুতুলের মা নাকি তাকে একবার দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, তাকে দেখলে নাকি মনে খানিকটা শান্তি পাবে।

তার জন্য শাশুড়ীর এরকম উতলা হবার তাৎপর্য্য উমাকান্ত একেবারেই

বুঝতে পারে না। মরা মেয়ের স্বামীকে দেখে মনে শান্তি পাবে? মেয়ের জন্য শোক তো আরও উথলে উঠবে!

দার্শনিকের উদারতায় আশেপাশের মানুষগুলিকে জানবার বুঝবার ও আপন করার মধ্যেই পৃথিবীর সকলের সঙ্গে কাল্পনিক কুটুম্বিতা হয়েছিল, আসল কুটুম্বের একখানা চিঠির আঘাতেই সেটা যেন ভেঙে গেল।

পুতুলের জন্য বেদনা বৈরাগ্যে রসালো হওয়ায় ইতিমধ্যে হৃদয় কি তার অনেকটা শান্ত হয়েছিল—যে প্রক্রিয়ায় মানুষ সময়ের সঙ্গে শোক দুঃখের তীব্রতা ও গভীরতা দুই-ই একদিন ভুলে যায়, তার বেলাতেও কি, সে প্রক্রিয়া তেমনিভাবে ঘটে চলেছিল?

অসংখ্য বাস্তব স্মৃতির ঘূর্ণাবর্তে হৃদয় যেন আবার মুচড়ে যায়। পুতুল নেই, পুতুলকে সে খুন হয়ে যেতে দিয়েছে, পুতুলের আপন-জনেরা তবু তার কাছে দাবী করেছে আত্মীয়তা। সত্যই তো, পুতুলের সন্তান আছে এবং ওরা তাদের মামা মাসী দিদিমা হয়—একথাটা সে যেন ভুলেই গিয়েছিল।

হৃদয় মুচড়ে যায় কিন্তু উমাকান্ত বুঝতে পারে এই বেদনা নিষ্ফল হয়ে যাবে। ধনদাসের প্রিয়পাত্র হয়ে চাকরি করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই—এমনি ভাবেই সে জড়িয়ে পড়েছে চাকরিতে।

পরদিন সে মনোহরকে জবাব লিখে দেয় যে বাড়ী ভাড়া করার দরকার নেই, তার বাসাতেই সকলে কয়েকটা মাস আরামে থাকতে পারবে। আরামে থাকার কথাটা সে কেন লিখল একবার খেয়ালও হল না উমাকান্তের।

মনোহরদের যেদিন পৌছবার কথা সেদিন একটা অভিনব অভিজ্ঞতা জুটে যায় উমাকান্তের। প্রেসে এসেই ধনদাস তাকে সেদিন দুপুরে তার বাড়ী খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়।

বলে, দুপুরে আজ আপনি আমার বাড়ীতে খাবেন উমাবাবু! কিছু

মনে করবেন না, আগে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এদিকে খেতে খেতেও বেলা হবে—অসুবিধা হবে না মনে হয়!

: হঠাৎ খেতে বললেন?

: আমার বাড়ীতে দূর সম্পর্কের এক পিসী থাকে, তার মেয়ে একটা ব্রত নিয়েছে। এই উপলক্ষ আর কি—বড় ব্যাপার কিছু নয়। মেয়েটি বড় ভালো। এমন ভাল মেয়ে আমি আর দেখি নি।

: বেশ তো যাব।

: আমি একটু ঘুরে আসছি। আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।

ষ্টেশনে আর যাওয়া গেল না। উপায় কি? স্বয়ং ধনদাসের নিমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না, পৃথিবী উল্টে গেলেও না। ধনদাস চলে গেলে বিস্মিত উমাকান্ত মনে মনে ভাবে যে হঠাৎ এ কিসের নিমন্ত্রণ? একটি তুচ্ছ আশ্রিতা মহিলার অতিশয় ভাল একটি মেয়ে ব্রত করেছে, সেজন্য ধনদাসের বাড়ীতে বিশেষভাবে তার নিমন্ত্রণ? স্বয়ং ধনদাস তাকে গাড়ীতে করে বাড়ী নিয়ে যাবে?

ভাত খেয়ে উমাকান্ত আপিসে এসেছে। কিন্তু নিজের বাড়ীতে পুতুলের ভাইবোনদের আসন্ন আবির্ভাবের উত্তেজনায় পেট ভরে খেতে পারে নি। নিমন্ত্রণের মর্যাদা রাখতে পারবে। কিন্তু কেন এ নিমন্ত্রণ?

রিক্সা গাড়ীতে বসে ধনদাসের বাড়ীর দিকে এগোতে এগোতেও এই কথাটাই উমাকান্ত ভাবে।

ধনদাস একথা ওকথার পর বলে, এই নিয়ম সংসারে, জানেন, এই হল সংসারের নিয়ম। একজন রোজগার করবে, দশজন তার ঘাড়ে বসে খাবে। তবে কি জানেন, মেয়েটি বড় ভালো। চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে—সংসারের এমন কাজ নেই যা' জানে না। সেলাই ফোঁড়াই গান-বাজনা এসবও জানে।

: আজকাল এসব তো শেখাতেই হয় মেয়েদের।

: বড় স্নেহ করি মেয়েটাকে। পাত্র খুঁজছি—আমি সেকেলে মানুষ, মেয়েদের অল্প বয়সেই পার করা ভাল মনে করি। পণ-টন বিশেষ দেব না, —তবে নাতজামায়ের উন্নতি করিয়ে দেব। ওটা করতেই হবে, ওটা কর্তব্য, কি বলুন ?

: তা বৈ-কি।

অল্প ঘোটা শ্যামবর্ণা ব্রতচারিণী মেয়েটি তাদের দু'জনকে পরিবেশন করে। মেয়ে দেখানো নয়, এ নিমন্ত্রণ। ধনদাস কি মেয়ের দালাল না ঘটক যে তাকে বাড়ীতে ডেকে মেয়ে দেখাবে? কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে, ঘামে, ও অকাল যৌবনের অসীম কৌতূহলে আত্মহারা বেচারী মেয়েটিকে একবার দেখে ঘাড় হেঁট করে উমাকান্ত ভাববার চেষ্টা করে যে ধনদাসের কাছে না জানি সে কতবড় অর্থলোভী ভিক্ষুক, লম্পট এবং ছোটলোক। নতুবা তাকে এ ভাবে এই বেশে মেয়েটিকে দেখানোর কথা ধনদাস কি করে ভাবতে পারল ?

মেয়েটির গায়ে সেমিজ নেই, ব্লাউজ নেই, পরণের শাড়ীখানা প্রায় মশারির কাপড়ের মত স্বচ্ছ !

একি সত্যই ধনদাসের পরিকল্পনা ? ধনদাস বোকা নয়। সে নিশ্চয় জানে এভাবে মানুষকে উত্তেজিত করা যায় কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সে উত্তেজনা থেকে সামাজিকভাবে বিয়ে করে কোন মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করার সুস্থ কামনা মানুষের জাগে না !

ব্যাপার সে বুঝতে পারে, খাওয়ার পর বৈঠকখানার বদলে দোতলার একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে বিশ্রামের অনুরোধ পেয়ে।

গড়গড়ায় তামাক আসে—সুগন্ধি তামাক। দু'চারটা টান দিয়ে ধনদাস নলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, বিশ্রাম করুন। প্রেসে যান তো যাবেন, নইলে ছুটি নিন আজকের দিনটা। আমিও শুইগে একটু।

তারপর আসে মেয়েটি, তার হাতে পানের রেকাবি। ইতিমধ্যে তার বেশ কিন্তু বদল হয়ে গেছে। সায়া ব্লাউজ গায়ে উঠেছে, তাঁতের একখানা ডুরে শাড়ী পরেছে।

: পান নিন্।

উমাকান্তের কেমন ভয় করতে থাকে। মেয়েটিকে তার ঘাড়ে চালান করে দিতে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন ধনদাস, যে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত তার লোপ পেয়েছে?

কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান কি কখনো লোপ পায়, ধীর স্থির চালাক চতুর ধড়িবাজ ধনদাসের? মতলব না ছকে তো সে কোন কাজ করে না। সস্তায় দূর সম্পর্কের আশ্রিতা মেয়েটির একটি পাত্র জোটানোর মতলবটা সহজেই বোঝা যায়, উমাকান্ত শুধু বুঝতে পারে না তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য বিশেষ কি ফন্দিটা সে এঁটেছে। শুধু মেয়েটিকে এভাবে সামনে ধরার মত স্থূল উদ্ভট উপায়ের উপরে ধনদাস নির্ভর করেছে একথা বিশ্বাস হয় না। অত কাঁচা মানুষ ধনদাস নয়। তাছাড়া মেয়েটিকে পার করার কিসের এত তাগিদ যে, খেলিয়ে তোলার বদলে বর্শায় গাঁথবার মত এই স্পষ্ট অভদ্র উপায়টা তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে?

: তোমার নাম কি?

: সুধা।

: আচ্ছা সুধা, এবার তুমি যাও। আমার আর কিছু দরকার নেই।'

: আমায় গল্প করতে বলেছে আপনার সঙ্গে।

: আর কি বলেছে?

: বলেছে—সুধা এক মুহূর্ত ইতস্তত: করে, তারপর সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে বলে, বলেছে আপনি আমার হাতটাত ধরলে যেন—

: চেঁচিয়ে ওঠ?

: না, চুপ করে থাকি।

সুধা পাগল নয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি এখন উন্মাদিনীর মত।

দরজা খোলাই আছে। সেটা কিন্তু কোন ভরসার কথা নয়। ধনদাসের মতলব সে বুঝে গিয়েছে।

সুধার হাত সে ধরবে কি ধরবে না সেটা তুচ্ছ কথা। খালি ঘরে একলা পেয়ে সুধাকে সে অপমান করেছে, ওকে তার বিয়ে করতেই হবে নইলে তাকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আদালতে বিশ্রী মামলা রুজু করা হবে—এসব হুমকি খাটাবার বুদ্ধি ধনদাস করে নি।

সে আরও নিমন্ত্রণ পাবে, আরও কয়েকবার এমনি ভাবেই নিজের হাতে পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে নির্জন ঘরে পানের রেকাবি হাতে তার সঙ্গে সুধা গল্প করতে আসবে। তারপর ধনদাস একদিন আবেদন জানাবে তার বিবেকের কাছে। তার ভদ্র সভ্য মার্জিত আত্মার কাছে। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে বিয়ে না করলে সুধার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

বিয়ে করলে দোষই বা কি ? তেমন সুন্দরী নয়, কিন্তু মেয়েটি ভাল ! প্রাণ দিয়ে তার ছেলেমেয়েকে ভালবাসবে, তার সেবা করবে, বিলাস ব্যসনের কোন দায় তার ঘাড়ে চাপাবে না। তাছাড়া ধনদাস তো রইলই দায়িক !

উমাকান্ত মিষ্টি সুরে বলে, বোসো। খানিকক্ষণ গল্পই করা যাক।

নিজে খাটের একপাশে বসেছিল, অন্যপাশ দেখিয়ে সুধাকে সেখানে বসিয়ে খানিকটা কাছে সরে এসে বলে, আমি বিয়ে করেছিলাম জান তো ? ছেলে মেয়ে আছে। বৌ যোটে মরেছে বছর খানেক।

: জানি।

: ছ্যাবলা ছোঁড়া নই। সুযোগ পেয়েছি বলেই হাতটাত ধরব—সে ভয় কোরো না। বুঝলে ?

সুধার ঠোঁটের কোনে একটু হাসি ফোটে।

চোখের চাউনি ছিল উন্মাদিনীর মত, কয়েকবার উমাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে অনেকটা শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে আসে তার চোখ।

: ধনদাসবাবু তোমায় খুব ভাল বাসেন—না ?

সুধা চুপ করে থাকে।

: মাঝে মাঝে ঝোঁকের মাথায় হাতটাত ধরেন তো ?

সুধা দু'হাতে মুখ ঢাকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু !

উমাকান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, একটু চালাক চতুর হও না ? কেঁদে কোন লাভ আছে ? ভুল তো তোমার নয়, যে ভুল করেছে সে কাঁদবে ! নষ্ট হয়ে গেছ ভেবো না। নিজেরা নষ্ট না হলে মেয়েদের কেউ নষ্ট করতে পারে না। রামায়ণ মহাভারত পড়েছ ?

: পড়েছি।

: তবে অবুঝের মত ভড়কে গিয়ে কাঁদছ কেন ? কত দৃষ্টান্ত আছে মনে নেই ? শক্ত হও, মনে জোর কর !

সুধা মুখ থেকে হাত সরায়। জলে থৈ-থৈ করছে চোখ কিন্তু আঁচল দিয়ে চোখ সে মোছে না। জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করে, আপনি রাজী হবেন না তো ? দোজবরে বিয়ে আমি মানব না ঠিক করেছি। পালিয়ে যাব কিম্বা স্যুইসাইড করব।

স্যুইসাইড ! লেখাপড়া ভাল শেখে নি কিন্তু স্যুইসাইড কথাটার উচ্চারণ কি রকম খাঁটি আর চমৎকার !

: কোটি কোটি টাকা পেলেও তোমায় আমি বিয়ে করব না সুধা। যার সঙ্গে ভাব হয়েছে তাকে একটু শক্ত হতে বল, নিজেও একটু শক্ত হও—

: কি করে জানলেন ?

: এ তো সবাই জানে। দোজবরে বিয়ে মানবে না, স্যুইসাইড করবে—তার মানেই একবারও বিয়ে করে নি এমন কোন যোয়ানের সঙ্গে ভাব হয়েছে।

এবার মারাত্মক সমস্যার কথা তোলে সুধা।

: উনি যে দু'চোখে দেখতে না পারেন তাকে? পুলিশে ধরিয়ে জেলে দিতে চান!

উমাকান্ত হাসে।

: জেলে দেবেন? তুমি জেলের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে—বলবে যে দুজনকে একসঙ্গে জেলে না দিলে তুমি গেট ছাড়বে না।

একদিন ছুটি নেবার কথা নিজে থেকে ধনদাস যাই বলে থাক, নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার পথে প্রেসে গিয়ে কাজকর্মের মোটামুটি হিসাব জেনে নিয়ে উমাকান্ত বাড়ী ফেরে।

আত্মীয় মানুষদের ভিড় করা জম-জমাট বাড়ীতে।

বসার এবং লেখার ঘরেই মুকুল সাজিয়ে রাখছিল তার বই, তার খাতা পত্র—দেখে মনে হয় অবিকল যেন প্রথম বয়সের পুতুল!

: কখন এলে?

মুকুল মুখ ফেরায় না।

: তা দিয়ে কি দরকার? একবার ষ্টেসনেও যেতে পারলেন না লাটসায়েব! আপনাকে খাতির কার জন্য ঘর সাজাচ্ছি গোছাচ্ছি ভাববেন না কিন্তু। নিজের খুসীতেই করছি।

অবিকল পুতুল!

চেহারা! কথা! দাঁড়ানোর ভঙ্গি!

সাজসজ্জার কায়দা পর্যন্ত। পুতুল মরেনি মনে করলে, পুতুল তার ছড়ানো বইগুলি সাজিয়ে রাখছে মনে করলে, শুধু এইটুকু ভুল হয় যে এ মেয়েটা সত্যি সত্যি পুতুল নয়, যে পুতুল মরে গেছে এ মেয়েটা তার বোন মুকুল। আত্মীয়তা টানতে হয় রাত এগারটা অবধি, কিন্তু উমাকান্তের খারাপ লাগে না।

পুতুলের মতই তার রাত্রের শয্যা রচনা করতে আসে মুকুল। বিছানা পেতে মুকুল ঠিক পুতুলের মত সুর ও কথাবলার ভঙ্গিতে বলে, দয়া করে এবার থাবেন মহারাজ ?

স্বেচ্ছায় নয়, আপনা থেকেই মুকুল নকল করছে পুতুলকে। উমাকান্ত পুরানো জীবন নকল করে বলে, আগে তোকে থাব।

: খান। বাগে পেলেই খাওয়ার জন্যই আপনাদের জন্ম। পুরুষদের এমন ঘেন্না করে আমার !

সুধাকে স্মরণ করে উমাকান্ত হেসে বলে, তা হলে তো মুস্কিল, খাওয়া চলবে না। পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ! এ মেয়ে কোন পুরুষের হজম হবে ?

বলতে বলতে সে গম্ভীর হয়ে যায়, তোকে দেখে পুতুলের জন্য মনটা বিগড়ে গেল মুকুল। ঠিক পুতুলের মত দেখাচ্ছে তোকে। পুতুলও ঠিক এমনি ভাবে শাড়ী পড়ত। পুতুল ঠিক এমনি ভাবে আমায় ডেকে খেতে দিত।

নীরবে সে ভাত ডাল মাছ রুটি খেয়ে যায়। রেঁধেছে নাকি মুকুল, অবিকল যেন পুতুলের রান্না !

হঠাৎ সে বলে, পেট ভরালে হবে না। প্রাণ ভরাতে হবে।

মুকুল হঠাৎ কেঁদে ফেলে।

: প্রাণ তো ভরাবই। ক'দিন পেট ভরে খেয়ে চেহারাটা ঠিক করুন কলিতে অন্নই প্রাণ জানেন তো ?

১০

আত্তির মার অসুখের কথা বলে কালাচাঁদ দু'দিন আগে কিছু টাকা আগাম চেয়ে নিয়েছিল, উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল আত্তির মার জ্বর হয়েছে।

ধনদাস উমাকান্তকে ডেকে বলে দেয়, কালাচাঁদকে একমাস কাজে আসতে বারণ করবেন। ওর বৌয়ের বসন্ত হয়েছে। সামনের মাসের পূর্ণিমার পরদিন থেকে যেন কাজে আসে।

: পূর্ণিমার পর কেন ?

: আছে আছে, কারণ আছে। এ রোগ হবার পর একটা অমাবস্যা ও একটা পূর্ণিমা কেটে গেলে ছোঁয়াচ লাগে না।

ধনদাস একবার শিউরে ওঠে!

: ব্যাটার কি কাণ্ড জানেন মশায় ? একেবারে বাড়ীতে গিয়ে হাজির —বৌয়ের ওপর মা'র দয়া হয়েছে, কিছু টাকা দিতে হবে! সটান বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছে, বললেও কি নড়তে চায় ? শেষে ধমক দিতে রাস্তায় নেমে গেল।

কালাচাঁদকে সে টাকা দিয়েছে কিনা এ প্রশ্ন উমাকান্ত জিজ্ঞাসা করে না, অবিকল পুতুলের মত চেহারা নিয়ে মুকুল এবং মনোহরেরা আসবার পর থেকে ক'দিন মনটা তোলপাড় করছিল, লোকটার উপর তীব্র আক্রোশ আবার নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছিল।

ধনদাস হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার, মুখ এত শুকনো কেন ? চেহারা এমন হচ্ছে কেন ?

: কি হয়েছে চেহারায় ?

: রোগা হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছেন যে দিন দিন !

ধনদাসের সরু গলাটার দিকে চেয়ে অনেকদিন পরে আবার উমাকান্তের হাত নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে।

কালাচাঁদ দু'দিন কাজে আসে না। পরদিন সে আসতেই উমাকান্ত তাকে ডেকে ধনদাসের হুকুম শুনিয়ে দেয়।

: ছুটি কিরকম বাবু? মজুরি পাব তো ?

: কাজ করবে না মজুরি পাবে কি হে! ধনদাসবাবু ওরকম মজুরি কাউকে দেয় ? তবে তোমায় বরখাস্ত করা হচ্ছে না, একমাস পরে এসে যেমন কাজ করছিলে তেমনি করে যাবে।

কালাচাঁদ তবু প্রতিবাদ জানায়,—বাড়ীতে রোগ, এখনি আমার রোজের দরকার বেশী, এখন বলছেন বিনে মাইনেয় ছুটি নিতে !

কালাচাঁদ উমাকান্তকে বোঝাতে চায় যে ঘরে রোগ ব্যারাম থাকলে টাকার দরকারটা বেশী হয়। উমাকান্তের জানতে যেন বাকী আছে! সে বলে, আমি বরং নিজের দায়িত্বেই আরও ক'টা টাকা তোমায় আগাম দিচ্ছি। মানুষটাকে তো চেনো কালাচাঁদ, আমার কি করার আছে বলো ?

তিনদিন পরে কালাচাঁদ আবার এসে দাঁড়ায়।

উমাকান্ত দম নেয়। কালাচাঁদ ঢোক গেলে।

: আবার তুমি কেন এলে কালাচাঁদ ? বাবুর স্পষ্ট হুকুম তোমায় একমাস প্রেসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছোঁয়াচে রোগ কি-না!— ওনার ভয়ানক আতঙ্ক, তোমার দূরে থাকাই ভাল কিছুদিন।

: স্তিরি আজ মারা গেছে বাবু! ভোর বেলা।

: মারা গেছে ? ওঃ!—

উমাকান্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে।

: কিছু টাকা নিতে এসেছিলাম বাবু! স্তিরির সৎকারে লাগবে।

ওমাসে কেটে নেবেন। আর ছুটিফুটি দেবেন না বাবু, ছুটি চাইনে! ছুটি নিলে কি মোদের চলে?

কি করা যায়! কি করে একে বুঝানো যায় যে, বাড়ীতে এসব রোগ হলে বরখাস্ত করার বদলে বিনা বেতনে একমাস ছুটি দেওয়া ধনদাস বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে করে!

গভীর বিতৃষ্ণায় উমাকান্তের দেহ-মনে কেমন একটা অস্থিরতা ঘনিয়ে আসে। ধনদাস হুকুম দিয়েই খালাস—এদের সঙ্গে সরাসরি খারাপ ব্যবহার করার দায়টা চাপিয়ে দেওয়া হয় তার ঘাড়ে।

যার স্ত্রী আজ সকালে মারা গেছে, অমানুষ দানবের মত কি করে তাকে বলা যায় যে আর আগাম টাকা হবে না, অবিলম্বে তুমি প্রেস থেকে বেরিয়ে যাও!

অথচ না বলেও উপায় নেই।

খেদের সঙ্গে সে বলে, টাকাতো হবে না কালাচাঁদ!

: ঘরে মড়া পচবে বাবু?

উমাকান্ত চোখ বোজে। বলে, ধারটার করে জোগাড় করে নাও।

: কে আর ধার দেবে বাবু?

কালাচাঁদ যেন হন্তে কুকুরের মত খেউ খেউ করে কথা বলে, যদিও কথাগুলি বলে অতি সাধারণ,—স্তিরি, আর পিসিকে ধরেছেন শেতলা! এ্যাদ্দিন চিকিৎসে হল কিসে? ধার করতে বাকী রেখেছি কোথাও? আপনিই তবে ধার দেন বাবু কটা টাকা! ওমাসে ঘটিবাটি বেচে শোধ করে দেব।

উমাকান্ত ধার দেবে? টাকা কই তার কাছে! পুতুলের আপন জনদের আরামের ব্যবস্থা করতে নিজেকেই তার টাকা ধার করতে হয়েছে মাসের মাঝামাঝি—বেতনের টাকায় কুলায় নি।

তবে সামনের মাস থেকে ওদের খরচ হবে আলাদা।

: আমার হাত একেবারে খালি।

: জানি বাবু, জানি!

কালাচাঁদ খেঁকিয়ে ওঠে। নিরীহ গোবেচারী কালাচাঁদ যেন সব জানে তাই তার আর কিছু বলবার নেই! সে যেন জানে যে উমাকান্তরা নিজেদের স্ত্রীদের খুন হতেও দেয় আবার কালাচাঁদের স্ত্রীরা মরে গেলেও দশটা টাকা ধার দেওয়া কর্তব্য মনে করে না।

ব্লটিং-এ আঁচড় কাটে উমাকান্ত। নিজেকে সত্যই তার অপরাধী মনে হয়—বৌ মরে গেলে তাকে পোড়াবার জন্য টাকার খোঁজে হন্তে হয়ে বার হতে হয় কালাচাঁদের—এ অবস্থার জন্য সে-ই যেন দায়ী।

মুখ তুলে সে ধীরে ধীরে বলে, আমার কাছে টাকা থাকে না জান তো? একটু অপেক্ষা কর, বাবু আসুন। উনি অবশ্য স্পষ্টই বলে দিয়েছেন তোমায় আর আগাম টাকা দেওয়া হবে না। তবু একবার বলে কয়ে চেষ্টা করে দেখি।

কালাচাঁদ সহকর্মীদের কাছে যায়। সকলেই কাজ বন্ধ করে তাদের কথা শুনছিল।

কুড়ি বাইশ বছরের ভুবন হরফ সাজানোর কাজ শিখছে। কালাচাঁদকে ইসারায় কাছে ডেকেও সে গলা চড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে, তা হবে না। ক'টা টাকার অভাবে কালাদা'র বৌ মরে গিয়ে ঘরে পচবে—আমরা তা হতে দেব না।

কোণের দিক থেকে বুড়ো নকুড় আরও জোরে চেঁচিয়ে বলে, নিশ্চয় হতে দেব না। টাকা না দিলে সবাই মিলে টাইপের কেসগুলো নিয়ে গিয়ে আত্তির মাকে পোড়াব।

কুঞ্জ অত জোরে চেঁচায় না কিন্তু জোরের সঙ্গে বলে, দেবে দেবে—

টাকা মেরে। এত বছর খাটছে—বৌকে পোড়াবার জন্ত ক'টা টাকা আগাম দেবে না, ইয়ার্কি নাকি!

উমাকান্ত ব্লটিং-এ আঁচড় কেটেই চলেছিল—হঠাৎ সে মুখ তুলে বলে, চেঁচামেচি হৈ-চৈ করছ কেন তোমরা? কাজ চালিয়ে যাও। কালাচাঁদ টাকা পাবে—ব্যবস্থা করে দেব। টাকা না দিলে আমিও আজকেই ইস্তফা দেব কাজে।

সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালাচাঁদকে টাকা দেওয়া না হলে একেবারে চাকরি ছেড়ে চলে যাবে—তার কাছে এমন কথা কেউ প্রত্যাশা করে নি। সকলেই কাজ শুরু করে দেয়।

ধনদাস এসে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নিজের কামরায় চলে যায়—কালাচাঁদ যে তার নজরে পড়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সবাই নিজের নিজের যায়গায় বসে কাজ করেছে, একটা গেঞ্জি গায়ে কালাচাঁদ শুধু দাঁড়িয়ে আছে উদভ্রান্ত একটা মূর্তির মত।

উমাকান্ত ধনদাসের কামরায় যায়।

ধনদাস আপশোষের সুরে বলে, এত করে বললাম, তবু ওকে প্রেসে ঢুকতে দিয়েছেন?

উমাকান্ত বলে, ওর স্ত্রী আজ সকলে মারা গেছে। পোড়াবার টাকা নেই—ক'টা টাকার জন্য মরিয়া হয়ে এসেছে।

উমাকান্তের মুখের গম্ভীর ভাব দেখে মৃদু হেসে ধনদাস বলে, বাজে কথা। একটা মানুষকে পোড়াতে কত টাকা লাগে? দরকার হলে পাড়া প্রতিবেশীরাই ওই সামান্য টাকা জুটিয়ে দেয়। আসলে ওদের হল সুযোগ পেলেই আদায়ের মতলব। যাক গে, গোটা পনের টাকা দিয়ে দিন।

উমাকান্ত কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে!

অত্যন্ত বিচলিত ভাবে ধনদাস কয়েক মুহূর্ত তার ভাব লক্ষ্য করে। তারপর সেও গম্ভীর হয়ে যায়।

: ও, ঠিক কথা, একদম খেয়াল ছিল না। একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—এবার থেকে আপনার কাছে একশো টাকার মত সব সময় জমা থাকবে। আমারি ভুল হয়েছে, এসব ছুটকো ব্যাপার মেটাবার জন্য আপনার কাছে কিছু টাকা রাখা উচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একশো টাকার নোট বার করে গুনে উমাকান্তের হাতে দিয়ে, তাকে দিয়ে আরেকবার গুনিয়ে লিখিত রসিদ নিয়ে ধনদাস হেসে বলে, আপনার রাগ হবার কথাই। এসব ছুটকো ব্যাপারেও যদি কিছু করার স্বাধীনতা না থাকে, একজন পুরানো লোককে পনের বিশ'টা টাকা পাইয়ে দিতে আমার কাছে আসতে হয়,—আপনি তাহলে কাজ চালাবেন কি করে?

উমাকান্ত প্রায় গলে গিয়ে বলে, হ্যাঁ আমিও জ্বালাতন হই, আপনিও জ্বালাতন হন।

ধনদাস বলে, একশো টাকা সব সময় পুরো করে রাখবেন। কাকে কি দিলেন রসিদ নিয়ে হিসেবটা পাঠাবেন—টাকাটা রোজ পূরণ করে দেব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—

এবার কড়া শোনায়, ধনদাসের গলা।

: চাইলেই যেন টাকা দিয়ে বসবেন না। কালাচাঁদের বৌ মরেছে, পোড়াতে হবে—এরকম সিরিয়াস্ ব্যাপারেই শুধু দেবেন।

কালাচাঁদ চলে যাবার পর ভিতরে একটা তোলপাড় চলতে থাকে উমাকান্তের।

কালাচাঁদের বৌকেও মরতে হল টাকার অভাবে ঠিক মত চিকিৎসা না হওয়ার জন্য? পুতুলের মতই মৃত্যু বরণ করতে হল আভির মাকে—তারই মত নিরুপায় কালাচাঁদকেও মেনে নিতে হল সেই মরণ?

চোখের সম্মুখ থেকে একটা কালো পর্দা যেন সরে যায় উমাকান্তের। এইখানে চেয়ারে বসে চারিদিকে সে দেখতে পায় এই রকম অজস্র ও বিচিত্র প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড।

চিকিৎসার অভাবে যারা মরে, রোগ তো তাদের মৃত্যুর কারণ নয়! ডাক্তার থাকতে, দোকানভরা ওষুধ থাকতে সেরে ওঠার বদলে যে মরে যায়, হত্যাই তো করা হয় তাকে। পুষ্টির অভাবে যাদের দেহ রোগ ঠেকানোর ক্ষমতা হারায়, আলো বাতাসহীন নোংরা আবর্জ্জনাময় রোগের ডিপোতে যাদের রোগের সঙ্গে বসবাস করতে হয়, আত্মরক্ষার সহজ রীতিনীতি যারা জানবার স্থযোগ বা মানবার মনোভাব পায় না, তাদের অকালমৃত্যু, হত্যা ছাড়া আর কি? দেশ জুড়ে অনিবার্য গতিতে চলেছে মানুষের এই খুন হবার একটানা ব্যাপক প্রক্রিয়া—কারো বেলা আকস্মিক, কারো বেলা দ্রুতবেগে, কারো বেলা তিলে তিলে মন্থর গতিতে।

উমাকান্ত শিউরে ওঠে, তার মাথা ঘুরে যায়।

এই প্রকাণ্ড ও বিরাট হত্যালীলার মধ্যে এতকাল বেঁচে থেকে এটা সে খেয়াল করে নি, মুখে মুখে অপমৃত্যুর যে অদৃশ্য নোটিশ লাগানো থাকে সেটা চোখে পড়ে নি! শুধু কি তার একার?

ক'জনের একথা মনে হয়েছে যে আইনের সংজ্ঞার ছ'দশটা খুন ছাড়াও জগতে অগণ্য খুন চলছে অনিয়মের?

উমাকান্ত বসে বসে ভাবে।

প্রেসের কর্মব্যস্ত মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে ধনদাসের প্রতি এক অভূতপূর্ব তীব্র ঘৃণায় তার হৃদয় ভরে যায়। এমন ঘৃণা সে জীবনে কখনও অনুভব করে নি, পুতুলের অপমৃত্যুর পরেও নয়। মৃদু হোক, জোরালো হোক, ঘৃণার সঙ্গে চিরদিন সে অবজ্ঞা আর কেমন একটা অস্থিরতার কষ্ট অনুভব করেছে। আজ এমন প্রচণ্ড ঘৃণায় হৃদয় মন ভরে গেলেও ওসব

কিছুই সে বোধ করে না, এক অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার অনুভূতির মধ্যে নিজেকে মহৎ ও শক্তিশালী মনে হতে থাকে।

সে যেন সত্য দর্শন করে আজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘৃণা বিদ্বেষের বহু ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছে। ধনদাস যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনেদের প্রতীক, সে তেমনি তাকে ঘৃণা করছে—তাদের সকলের প্রতিনিধি হিসাবে—যারা খুন হয়েছে এবং হচ্ছে। সে নিজেও ওদেরি দলে।

১১

উমাকান্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে ধনদাসকে খুন করা এক অর্থহীন অবান্তর চিন্তা। ওকে প্রাণে মেরে তার বা কালাচাঁদদের কোন লাভ নেই—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লাভটুকু পর্য্যন্ত নয়!

পুতুলের মত ওর যদি কোন প্রেয়সী বৌ থাকত, ছেলেমেয়ের মা থাকত—তাকে মারলেও বরং নিজেকে ভোলানো গেলেও যেতে পারত যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

বৌ অবশ্য আছে ধনদাসের—ছেলেমেয়ের মাও সে বটে। কিন্তু ধনদাসের অত্যাচারে সে বেচারাই হয় তো ভগবানের কাছে দিবারাত্রি নিজের মৃত্যু কামনা করছে!

ধনদাসও হয় তো চায় পুরানো সেকেলে রোগজীর্ণ গিন্নিটা এবার তার গত হোক—আরেকটি বেশ টুকটুকে বৌ সে ঘরে আনতে পারুক।

সে তার বৌ মেরে তাকে কাঁদিয়ে জ্বালিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় জানলে, ধনদাস নিজেই হয় তো তাকে সব রকমে সাহায্য করবে, তার যাতে কোন শাস্তি না হয় সে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেবে—বড়রকম পুরস্কারও দেবে!

এত জটিল মানুষের জীবন! এই জীবনের মর্ম অনুভব করা—জীবন-সত্য ধরতে পারা—তবে লেখক হওয়া?

এবং লেখক হয়েও জীবন-সত্য আবিষ্কার করে-করে চলা—আরও সহজভাবে জীবনকে জেনে, আরও সোজা ভাষায় জানাটুকু দশজনকে জানিয়ে দেবার একটানা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া!

মার জন্য আন্তি বেশী কাঁদে নি।

কালাচাঁদও খুব বেশী মুষড়ে যায় নি। মাসখানেকের বাধ্যতামূলক ছুটিটা ঘরে বসে কাটাবার সাধ তার ছিল না। এদিক ওদিক আলগা কাজ খুঁজছিল।

জহর আর মহেশের সঙ্গে কথা বলে মানব তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ সাময়িক কাজ জুটিয়ে দেয়। একলাইন কম্পোজ করতে হবে না। জহর ও মহেশের নতুন প্রেসটা চালু করার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি সব সে ঠিকঠাক করে দেবে। উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা, পরিদর্শক হিসাবে সে কাজ করবে!

কালাচাঁদ গোমড়া মুখে বলে, একেবারে নিয়ে নিলে হত না? এসব খুঁটিনাটিও দেখতাম, কম্পোজও চালিয়ে যেতাম?

মানব বলে, ওখানে কাজটা যখন বজায় আছে, ছাড়বে কেন? চাদ্দিকে কত যে বেকার কালাচাঁদ! এ প্রেসে যারা খাটবে তারা মজুরি কম পাবে, পরে লাভের ভাগ পাবে। দু'চার বছর ওভাবে চালানো কি পোষাবে তোমার?

কালাচাঁদ বলে, বৌটাকে খুন করল। ওর প্রেসে গিয়েই খাটব আবার!

তখন আন্তির মার মরণের জন্য ধনদাসের দায়িত্ব নিয়ে দু'জনের কথা হয়। মানব তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে যে পুতুলকে প্রকারান্তরে খুন করেছে বলা গেলেও আন্তির মাকে খুন করার প্রধান দায়টা খাটুয়েদের জন্য চলতি অব্যবস্থায়, ধনদাসের একার দায় নয়।

কালাচাঁদ রেগে আগুন হয়ে বলে, কি বলছেন মানুবাবু ? আপনিও শেষে ও ব্যাটার দিকে টানছেন ? দেহ পাত করে কত বছর খেটে এলাম, ব্যাঙ্কে ও ব্যাটার টাকা পচে যাচ্ছে। ছ'মাসে শোধ করে দেব বলে একশোটা টাকা ধার চাইলাম—যদ্দিন না টাকা শোধ হয় গোলাম হয়ে খাটার খত লিখে দেব বললাম—তবু টাকা দিলে না !

কালাচাঁদ একটা বিড়ি ধরায়।

ঃ টাকাটা পেলে বাঁচাতে পারতাম আন্তির মাকে। টাকাটা না দিয়ে উমাবাবুর বৌয়ের মত আমার বৌকেও ও ব্যাটা খুন করেছে। সোজা কথা আপনি আজকাল জড়িয়ে ফেলছেন মানুবাবু, ব্যাপারটা কি ?

মানব তার কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বলে, ব্যাপার খুব সোজা। পুতুলদিরা, আন্তির মায়েরা খুন হবেই—সে জন্য আমরা দিশেহারা হব না। আমরা বুঝব ব্যাপারটা কি,কার দায় কতখানি,বুঝে ব্যবস্থা করব।

কালাচাঁদ বলে, বটে নাকি !

মানব বলে, নিশ্চয়। হৃদয় নিয়ে অনেক হাজার বছর মেতে থেকেছি। এবার আর হৃদয় নয়—নেশা নয়! এবার শুধু হিসাব।

একেবারে বিনা চিকিৎসায় না হলেও আন্তির মাও ভাল চিকিৎসার অভাবেই মারা গেছে। তবে পুতুলের মরণের মত সোজাসুজি আন্তির মার মরণের দায়টা একা ধনদাসের উপর চাপানো যায় না।

অন্য অবস্থায় উমাকান্ত একটা নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে এলে ধনদাস খুসী হয়ে দরদস্তুর করে আরও কিছু বেশী দাম দিতে রাজী হয়ে প্রথম সংস্করণের রাইটটাই কিনে নিত সন্দেহ নেই। এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার সময় শ'দেড়েক টাকা নগদ দিতেও আপত্তি করত না।

পুতুল মরণাপন্ন জেনেই, উমাকান্তকে নিরুপায় জেনেই, সে সামান্য টাকায় একেবারে বইটার কপিরাইট কিনে নেবার দাঁও মারতে চেয়েছিল। পুতুলের মরণের জন্য সে-ই তাই প্রধান দায়িক।

কিন্তু চলতি নিয়ম আর নীতি অনুসারে তার কাছে কোন পাওনা ছিল না কালাচাঁদের। যেরকম চিকিৎসা আর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা হলে আত্তির মা হয়তো বেঁচে যেত, আত্তির মায়েদের জন্য সেরকম চিকিৎসা আর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। ধনদাসের উদারতার প্রশ্ন তোলাও মূর্খামি। একজনের উদারতায় লাখ লাখ আত্তির মায়েদের রোগ সারাবার উপায় হয় না!

কালাচাঁদ নীরবে মানবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনে যায়। আর কোন মন্তব্য করে না বা প্রতিবাদ জানায় না।

আত্তির মার মরণ কালাচাঁদের জীবনে একটা বিপর্যয় এনে দেবে জানাই ছিল। সেই সঙ্গে একঘেয়ে কাজ থেকে কিছুদিনের বিরাম!

কালাচাঁদ একটা অদ্ভুত রকম তাজা গল্প লিখে ফেলে—নাম দেয় 'হরফ'।

ধনদাসকে ঘৃণা করে লেখা গল্প—পড়লেই বোঝা যায়। সেই সঙ্গে চাঁছাছোলা ব্যঙ্গ মেশানো থাকায় আঘাতটা হয়েছে তীব্র।

মানব বলে, তোমার এই লেখাটা আমি নামকরা বড় কাগজে ছাপাতে পারব না কালাচাঁদ। এ রকম লেখা ওদের কাছে বিষের মত। ছোট নতুন কাগজে ছাপিয়ে দেব—পয়সা কড়ি কিন্তু পাবে না কিছু।

কালাচাঁদ হাত বাড়িয়ে বলে, থাক্ গে তবে, লেখা ছাপিয়ে দিয়ে কাজ নেই। হাড় কালি করে খাটব, মজুরি পাব না, ও ব্যাপারে আমি নেই মানুবাবু!

: আমার আর খালেকের লেখা ছাপিয়ে মহেশবাবুর চাকরি গেল দেখলে না?

: চাকরি তো অমন কত শত লোকের যাচ্ছে, কত শত লোক চাকরি পাচ্ছে না। তার সাথে মোর লেখা ছাপানোর সম্পর্ক কি? যে কাগজে

ছাপিয়ে দেবেন লেখাটা, সে কাগজটা বিনি পয়সায় বিলি হবে নাকি? বিজ্ঞাপনের জন্য পয়সা নেওয়া হবে না? শুধু মোর লেখার খাটুনির মজুরি হবে না!

প্রায় কথকতার ভাষায় লেখা অদ্ভুত রকম সতেজ আর মর্মস্পর্শী গল্পটা পড়েই, প্রায় উত্তেজিত হয়ে মানব যেভাবে হোক যে কোন মাসিকে হোক গল্পটা ছাপিয়ে দেবে বলে ছিল।

ভেবেছিল প্রথম গল্প ছাপা হবে, কালাচাঁদ নিশ্চয় ধন্য হয়ে যাবে! কিন্তু বিনা মজুরিতে প্রথম লেখা ছাপতে দিতে কোনমতেই রাজী নয় কালাচাঁদ।

মানব তাকে লেখা ছাপানোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলে, সামান্য কটা টাকার জন্যে কেন বোকামি করছ কালাচাঁদ? নতুন লেখক কাউকে লেখার জন্য টাকা দেয় না, তোমার কি করে টাকা চাইব বলো?

: খেটেছি—মজুরি চাই।

: তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা। এই লেখাটা ছাপিয়ে একটা হৈ-চৈ সৃষ্টি করে আমি তোমায় তাড়াতাড়ি তুলে দিতে চাই। আমি নিজে একটা ভূমিকা লিখে তোমার লেখাটা ছাপাব। একজন অল্পশিক্ষিত শ্রমিক যে নিজের চেষ্টায় এমন জোরালো গল্প লিখতে পেরেছে এটা তুলে ধরব, তোমার গল্পের আসল গুণ কি, ধরিয়ে দেব। তারপর সকলকে লেখাটা পড়াব, সাহিত্য বৈঠকে লেখাটা নিয়ে আলোচনা করব। নাম হলে যেচে তোমার লেখা নেবে, টাকাও দেবে। নামের জন্য লেখকেরা প্রথমে কত ত্যাগ স্বীকার করে, তুমি সামান্য কটা টাকার মায়া ছাড়তে পারছ না?

একগুঁয়ে কালাচাঁদ তবু সতেজে মাথা নাড়ে, মাপ করবেন মানুবাবু। বিনা মজুরিতে খাটুনি বেচব না। আপনাদের বিচার বিবেচনা মাথায় ঢোকে

না মোটে। পয়সা দিয়ে কাগজ কিনবেন, পয়সা দিয়ে ছাপাবেন, সম্পাদককে পয়সা দেবেন, এজেণ্টদের কমিশন দেবেন, নাম-করা লেখককে পয়সা দেবেন, লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে পয়সা দিয়ে লেখা ভিক্ষে চাইবেন—নতুন লেখকের লেখা ছাপবেন বিনা পয়সায়?

কালাচাঁদ জ্বালাভরা হাসি হাসে।

: চটবেন না মানুবাবু, এত খেটে লিখে বিনা পয়সায় লেখা দিয়ে নাম করে মোর কাজ নেই। সবাই খাটুনির মজুরি পাবে, নতুন লেখক পাবে না? এ উদ্ভট নিয়ম চলবে কেন গো মানুবাবু? এপ্রেন্টিসও কিছু পায়—নতুন লেখক খাতিরে লিখবে কেন?

: নতুন লেখক খেটেও মজুরি পায় না—এ অবস্থা পাল্টাবার জন্য যে কাগজ লড়ছে—সে কাগজকে জোরালো লিখবে।

কালাচাঁদ হেসে বলে, সে তো আলাদা কথা হল মানুবাবু! খাটুয়েদের লড়ায়ে কাগজেও বিনা মজুরিতে কেউ লেখে কি? খেটে লিখেছি, মজুরি পাওনা হবেই,—তবে কিনা নগদ না পেয়ে ওটা জমা হল ফাণ্ডে। ওমনি কোন কাগজে ছাপবেন কি লেখাটা, যে কাগজে কোন লেখার নগদ মজুরি দেয় না?

মানব খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলে, এদিকটা তো খেয়াল করি নি কালাচাঁদ!

কালাচাঁদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, নিয়ম অনিয়ম খেয়াল করতে ভুলে যান বলেই তো মোদের এই দুর্দ্দশা। খেয়াল হয় নি বলে আপশোষ করলেন, ফুরিয়ে গেল। খেয়াল না হওয়ার জন্য কানমলার কেউ তো নেই!

মানব বলে, তোমায় আজ বড় গরম দেখছি কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ মাথা নাড়ে।

: গরম মোটেই নই মানুবাবু। আপনাদের কত জ্ঞান, কত বিদ্যা, কত

পড়াশোনা। ঘোষের ওভারটাইমের ঝগড়া নিয়ে জেল খেটে এলেন। তবু আপনার সোজা কথাটা খেয়াল নেই যে খাটালে মজুরি দিতে হয়!

: লেখাটা আমার কাছে থাক। দেখি কি করা যায়।

মহেশকেই গল্পটা পড়তে দেয় মানব। প্রেস চালু হবার পর মহেশের সম্পাদনায় একটা মাসিকও বার করা হবে।

মহেশ গল্পটা লুফে নেয়।

বলে, শুধু মজুরি দিয়ে ছাপব! এই গল্পের নামে কাগজের নাম হবে। লাগসই একটা নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পড়তে পড়তে মনে হয় সে যেন লেখার জন্য লেখেনি, লেখক হবার জন্য লেখেনি, তার মত সকল মানুষের প্রাণের তারে সুর মিলিয়ে লেখায় একটি মর্মান্তিক অভিশাপ-বর্ষণ ঝরেছে, ধনদাসের মত জগতে যত মানুষ আছে তাদের উপর।

লেখাটা ছাপাবার আগে মানবকে দিয়ে কালাচাঁদকে মহেশ তার নতুন সম্পাদকীয় দপ্তরে সন্ধ্যার পর চা খাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিল।

মানব আর কালাচাঁদ আসে প্রায় একসঙ্গে—দু'চার মিনিট আগে পরে।

কালাচাঁদকে রীতিমত সমাদর করে বসিয়ে মহেশ বলে, কম্পোজিটার হিসাবে নয়—তোমায় চা খেতে ডেকেছি লেখক হিসাবে। কাজেই চেয়ারে জাঁকিয়ে বোসো—ভুলে যাও যে তুমি কম্পোজিটার। তোমার লেখার নামে কাগজের নাম হবে ঠিক করেছি, তোমার লেখাটা প্রথম ছাপাব ঠিক করেছি।

চেয়ারে কালাচাঁদ জাঁকিয়েই বসে, কিন্তু শান্ত নম্র সুরে বলে, আমি কম্পোজিটার এটা ভুলতে হবে কেন মহেশবাবু?

: তুমি লেখক হিসাবে এসেছ বলে!

: কম্পোজিটার বুঝি লেখক হয় না? বারণ আছে?

মহেশ লজ্জা পায়—খুসীও হয়। বলে, তুমি ঠিক বলেছ, আমারি ভুল হয়েছে, ও কথা বলে তোমায় তুলতে গিয়ে নামিয়ে দিয়েছি।

ততক্ষণে মানব এসে গেছে।

মহেশ তখন বলে, একটা গুরুতর কথা বলতে তোমায় ডেকেছি কালাচাঁদ! তোমার লেখাটা অন্য কাগজে ছাপা হলে এমনিতে ধনদাসের চোখেও পড়বে না—ব্যাটা প্রেস করেছে কাগজ বার করে, কিন্তু সাহিত্যের দিকে তাকায় না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটু হেসে কালাচাঁদ বলে, তাকালে কি ব্যাটা নিজের সর্বনাশ টেনে আনত? আপনাকে বরখাস্ত করত?

মহেশ বলে, আমার কাগজ বলে ধনদাস নিজেই কিন্তু কাগজটা পড়বে কিম্বা অন্যেরা এ লেখাটা দেখাবে ধনদাসকে। লেখাটা পড়ে ধনদাস যদি তোমায় তাড়িয়ে দেয়?

কালাচাঁদ ফুঁসে ওঠে, ইস্! তাড়িয়ে দেবে! একটা লেখা ছাপার জন্য তাড়িয়ে দেবে! প্রেস বন্ধ হয়ে যাবে না সঙ্গে সঙ্গে?

মানব বলে, লেখাটা আপনাকে দেওয়ার আগে একটা বৈঠক করিয়েছিল প্রেসের লোকেদের নিয়ে। আমিও হাজির ছিলাম। কালাচাঁদ লেখাটা পড়ল—তারপর আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লেখা ছাপালে যদি কালাচাঁদের কাজ যায় তবে কি উপায় হবে?

মহেশ হেসে বলে, আঁটঘাট বেঁধেই তবে সব করেছ।

মানব বলে আঁটঘাট না বেঁধে কি কাজ হয়? সব কাজে আঁটঘাট বাঁধতে হয়। এই যে প্রেস করলেন, কাগজ বার করবেন—এসব কি আঁটঘাট না বেঁধে হচ্ছে?

জহর প্রশ্ন করে, বৈঠকে কি ঠিক হল বলুন না?

মানবকে মুখ খুলতে হয় না! কালাচাঁদ বলে, সবাই বলল, এ লেখা ছাপালে যদি আমায় তাড়ায়, সবাই কাজে গিয়ে জায়গায় বসে শুরু থেকে শেষ তক হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। এক লাইন হরফ সাজাবে না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে।

মহেশ বলে, তোমার লেখার নামে আমাদের পত্রিকার নাম দিলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

জহর বলে, নামটা আমাদের সকলের পছন্দ হয়েছে।

মানব তামাসা করে খেদের সুরে বলে, ইস্! আমার যদি একবার খেয়াল হত! এই নাম দিয়ে কাগজ বার করে আমিই লাখ টাকা কামিয়ে নিতে পারতাম!

কালাচাঁদ বলে, মানুবাবু, ফাঁকতালে যারা লাখ টাকা কামাতে চায়, তাদের হাতের লেখা দেখেও হরফ সাজিয়েছি অনেক বছর। প্রত্যেকটি অক্ষর গাঁথি, কমা-সেমিকোলনের হিসেব রাখি—কে কেন লেখে টের পেতে কি বাকী থাকে মানুবাবু?

মহেশ গম্ভীর হয়ে বলে, ধনদাস কিন্তু তোমাকে তাড়াবেই। প্রেসে সবাই তোমার জন্য হাত গুটিয়ে থাকলে একটা আপোষ করবে—তোমাকে আবার কাজে ফিরিয়ে নেবে। কিছুদিনের মধ্যে তোমায় চোর কিম্বা খুনী বানিয়ে শেষ করে দেবে।

: দেবে? দিলেই হল? সবাই চুপচাপ মেনে নেবে বজ্জাতিটা? কী যে ভাবেন, কি রকম যে হিসাব করেন আপনারা—

গোড়াতেই কালাচাঁদের 'হরফ' গল্প বুকে নিয়ে নতুন বাংলা বছরের বৈশাখের মাঝামাঝি হরফ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

নতুন প্রেস, নতুন কাগজ, নতুন ব্যবস্থা বলে কাগজ বার করতে পয়লা দোসরার বদলে মাসের মাঝামাঝি হয়ে যায় নি, মহেশের নীতি অনুসারেই এই সময় কাগজটা বার করা হয়েছে।

লোকে মাইনে পায় ইংরাজী মাসের গোড়াতে—বাংলা মাসের কোন হিসাব ধরাই হয় না।

মাসকাবারি মাইনে পেয়ে যারা কাগজ কিনবে তাদের হিসাব না করে বাংলা দেশে কাগজ বার করারও নাকি কোন মানে হয় না!

মানব প্রতিবাদের সুরে বলেছিল, কেন? বাংলা পনের ষোল তারিখে ইংরাজী পয়লা হয়। এমন কাগজ বার করবেন যা পনের ষোল দিনেই বাসি হয়ে যাবে, লোকে কিনবে না?

: এদেশে তাই হয়। মাসিকপত্র হল ভাজা মাছের মত। যত ভাল করেই ভাজ, জুড়িয়ে গেলে কেউ কিনবে না।

: কথাটা মানলাম না কিন্তু প্রতিবাদ ফিরিয়ে নিলাম। যে বিষয়ে জানি না, যে বিষয়ে ভাবি নি, সে বিষয়ে কথা বলা বোকামি।

কোন খবরই অজানা ছিল না ধনদাসের। হরফ যে বেরোচ্ছে, সে খবর সে ভাল ভাবেই জানত।

নিজের কাগজ পড়া শুরু করতে তার হপ্তাখানেক সময় লাগে, 'হরফ' বাজারে বার হওয়ামাত্র একখানা কাগজ আনিয়ে অন্য সব কাজ ফেলে পাতা ওল্টাতে শুরু করে।

কভারটা পরীক্ষা করতে তার বিশেষ কৌতূহল জাগে না—কভারে একলাইন বিজ্ঞাপন নেই।

কভারের পর বিজ্ঞাপনের তিনটি পাতা সযত্নে উল্টিয়ে দেখে সে প্রথম পাতায় ঠেকে যায়।

প্রথম পাতার ভণিতা নেই, মুখপত্র নেই, নিবেদন নেই, 'হরফ'-এর জন্মের কোন কৈফিয়ৎ নেই—শুধু আছে কালাচাঁদ নামে একজনের লেখা হরফ নামে একটা গল্প! নতুন মাসিক বার করার এ কোন নতুন কায়দা?

গল্পটাতেই অনেকক্ষণ আটকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ গল্পটা ঘেঁটে পাতা

উল্টে মাসিকপত্রে গল্পের পর সম্পাদকীয় ছাপার নতুনত্ব চাক্ষুষ করে তার মনে প্রশ্ন জাগে যে, গল্পটা কি কাগজের নাম নিয়ে বিশেষ ভাবে লেখা ?

গল্পটা পড়তে শুরু করে আর থামতে পারে না, পড়া শেষ করে বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে ধনদাসের !

মহেশের সম্পাদকীয়ের আগে তাকে খোঁচা দিয়ে লেখা কালাচাঁদ এই ছদ্মনামের লেখকের গল্প ছাপিয়ে নতুন কাগজ বার করেছে মহেশেরা তার কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ! বরখাস্ত হবার রাগে মহেশ তার সঙ্গে শত্রুতা চালিয়ে যাওয়া, কাগজের একটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে !

দুপুর পর্যন্ত ধনদাস গুম হয়ে ভাবে। তারপর উমাকান্তকে ঘরে না ডাকিয়ে নিজেই তার কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলে, কাগজ চালানো বড় দায় উমাবাবু !

: দায় বৈ-কি ! দশজন যারা যেমন ভাবছে তাদের মনের মত করে না চালালে কাগজ চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উমাকান্তের কাছে এ রকম জবাবই ধনদাস আশা করেছিল। নিজের বিচলিত ভাব যথাসাধ্য গোপন রেখে সে জিজ্ঞাসা করে, 'হরফ' দেখেছেন নাকি ?

: দেখেছি বৈ-কি !

আগাগোড়া উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে পড়া মাসিকটা উমাকান্ত তার সামনে এগিয়ে দেয়।

: পাল্লা দিতে পারবেন ?

: কেন পারব না ? পাল্লা দেওয়া কঠিন কিছুই নয়, আমাকে পাল্লা দেবার সুযোগ দিলেই পাল্লা দিতে পারব !

ধনদাস প্রথম লেখাটা বার করে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এ লেখাটা কার জানেন—ভদ্দরলোককে চেনেন ? কাগজের নামে লেখা গল্প—একেবারে প্রথমে ছেপে দেওয়া হয়েছে !

উমাকান্ত বলে, কাগজের নামে লেখা গল্প নয়—গল্পের নামেই কাগজের নাম হয়েছে। লেখক খুব গরীব, এই লাইনেই আছেন।

বলতে বলতে উমাকান্ত ধনদাসের মুখের ভাব লক্ষ্য করে। ধনদাসের অবশ্য একবার মনেও পড়বে না তার ছাপাখানাতেই একজন কালাচাঁদ কাজ করে, বলে দিলেও হয় তো বিশ্বাস করবে না যে তার প্রেসের কম্পোজিটর ওই কালাচাঁদই গল্পটির লেখক!

ধনদাস জিজ্ঞাসা করে, কোথায় থাকেন? আসল নামটা কি? কোন্ কাগজে কাজ করেন?

উমাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যায়,—তার মনে পড়ে যায় যে 'হরফ' গল্পে ধনদাসের চরিত্রের একটা দিক আছে এবং তাকে মর্মান্তিক ব্যঙ্গের আঘাত করা হয়েছে।

সে বলে, অত কে খবর রাখে বলুন? কোন সাহিত্য সভাটভায় আলাপ হয়েছিল— ওই পর্যন্তই পরিচয়। নতুন লেখক—কোথায় থাকে কি করে জিজ্ঞাসাও করি নি।

ধনদাস বলে, অ!

১২

অপর্ণার উপদেশ ও ব্যাখ্যা নিদারুণ আতঙ্ক জাগালেও চন্দ্রা ভেবেছিল যে এখনো যখন সর্বনাশ হয় নি এবং জহর নিজে থেকেই তাকে নিতে এসেছে এবার নিশ্চয় সামলে নেওয়া যাবে।

ব্যাপার যখন বুঝে গিয়েছে ভুল তো আর সে করবে না, সুতরাং ভয়েরও আর কারণ নেই।

কিন্তু দেখা যায় দু'পক্ষ দীর্ঘদিন ধরে বিষয় একটা ভুল করে এলে তার জের অত সহজে মিটে যায় না, হঠাৎ সমস্ত বোঝাপড়া হয়ে গিয়ে সব গোলমাল চুকে যায় না।

বিশেষতঃ ভুল বোঝার ধাক্কায় একজন যখন রাত্রে ঘুমের জন্য মদ খাবার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়।

সে আসবার পর থেকে জহর অবশ্য অনেক সংযত হয়েই ও জিনিষটা খেতে আরম্ভ করে কিন্তু পদার্থটা খানিক পেটে যাবার পর কি রকম অদ্ভুতভাবেই যে বদলে যায় মানুষটা!

কোনদিন তার জন্য দরদ জাগে অস্বাভাবিক, কোনদিন হৃদয়হীনতার অন্ত থাকে না।

কোনদিন অতিরিক্ত দরদ বা নিষ্ঠুরতার, একটা নিয়ে আরম্ভ হয়ে অন্যটায় গিয়ে পৌঁছায়।

চন্দ্রা মিনতি করে বলে, কেন গিলছ, বাদ দাও না? ওটা বাদ দিলে যখনি ডাকবে, দেখবে আরও কত খুশীতে গদ গদ হয়ে বুকে যাব।

: যখন তখন বুকে ডেকেছি তোমায় কখনো?

: ডাকোনি বলেই তো ঝন্‌ঝাট হল। ডাকতে চাও—ভদ্রতার খাতিরে ডাকবে না। পুরুষ মানুষ—জোর করে ডেকে দেখতে হয় না? ভাগ্যে বিগড়ে যাও নি তুমি!

জহর ভাবে, ন্যাকামি! বাপের চাকরি গেছে। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাপ উঠবার চেষ্টা করছে—তাই এই ন্যাকামি?

জহর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার চাউনি দেখে এমন অস্বস্তি বোধ হয় চন্দ্রার!

তারপর জহর বলে, কাগজ আর প্রেসটা যদি না চলে তুমিও মরবে আমিও মরব।

: জানি না? একশোবার জানি। কিন্তু হঠাৎ প্রেস আর কাগজের কথা তুললে কেন?

জহর চুপ করে থাকে। চন্দ্রা যেন একটু রেগে যায়।

: ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো তোমার পক্ষেই আছি! এসো না দুজনে মিলেমিশে চেষ্টা করে নেশাটা কাটান দিই? আমায় যা বলবে আমি তাই করব।

ধীরে ধীরে জহর একটা সিগারেট ধরায়।

: সম্পাদক বাবার চাকরি গেল। বড়ই মুস্কিল হল খাওয়া পরার। বাড়ী বাঁধা রেখে ধার করে প্রেস আর কাগজের ব্যবস্থা করতেই, ভালবাসা যেন উথলে উঠল তোমার বুকে!

চন্দ্রা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে—বিচার বিবেচনা করে স্থির করে নেয় রাগ করবে কিনা।

: উথলে উঠবে না? এতকাল তো ছিলে ভীরু কাপুরুষ, আমার একটা বিশ্রী ভুলধারণার তোষামোদ করতে। তুমি কি ভাবছিলে আমি আগেই টের পেয়েছি। ভাগ্যে মুখ ফুটে বললে, নইলে কথাটা খোলসা করতে সাহস পেতাম না।

কতবড় অপমানের কথা বলেছে জহর, তবু চন্দ্রার মুখে হাসি ফোটে।

: বাপের বিপদে স্বামী উপকার করলে মেয়ে খুসী হবে না স্বামীর ওপর? ওতে কোন দোষ আছে নাকি! ওটাই তো সংসারের সাধারণ নিয়ম। তবে সত্যি সত্যি ভালবাসাটা কিন্তু সেজন্য উথলে ওঠে নি। ভালবাসা আগেই ছিল, ভুল করে বোকার মত চেপে রেখেছিলাম। অপর্ণাদি আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে। অপর্ণাদিও আমার মত ভুল করে ডুবতে বসেছিল।

জহর চেয়ে থাকে।

চন্দ্রা বলে, চায়ের দোকানে বসে মাখনদা'র কাছে কি কাঁদুনি

গেয়েছিলে মনে নেই বুঝি ? অপর্ণাদির পরামর্শে মান্নুদা তোমার সঙ্গে কথা বলেছিল। আমায় কেন নাও না, রাত্রে এলে কেন থাকো না, আমি কি তার মানে জানতাম ? আমায় জিজ্ঞেস করে অপর্ণাদিও বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে মান্নুদা যখন এসে সব বলল— তখন অপর্ণাদি ব্যাপার বুঝল, আমাকেও বুঝিয়ে দিল।

: বটে !

: তবে কি ? দোষ তোমার ছিল না—সব দোষ আমার। আমি ভাবতাম, যদ্দুর পারা যায় দেহটা ছাঁটাই করে মনের প্রেমকে বড় করলে তোমার কাছে আমার দাম বাড়বে। নইলে আমি ছোট হয়ে যাব তোমার চোখে।

একটু আগে হেসেছিল, এবার চোখে জল এসে যায়।

: নিজে ভেতরে ছট্‌ফট্‌ করছি, ভাবছি যে চুলোয় যাক মানসিক ছাঁকা ভালবাসা—তবু কিভাবে তোমায় ঠেকিয়েছি, মার্জিত রুচির ঢং আর ভাণ করে তোমার ভালবাসার গলা টিপে ধরেছি !

চন্দ্রা এবার কেঁদে ফেলে। অবাধ কান্না !

: এসব মিথ্যে কথা নয়। প্রমাণ তো দিয়েছি আগেই। বিপদের সময় বাবার পাশে দাঁড়িয়েছ বলে ? ছাই বুঝেছ তুমি ! কেন, সেদিন যে গেলে, রাত্রে না থাকলে স্যুইসাইড করব বলে তোমায় যে আমি জোর করে রাখলাম—তখন কি বাবার চাকরি গিয়েছিল ? সেদিন প্রমাণ দিই নি ?

কিন্তু জহর কি আর তখন এসব মানবার মুডে আছে ! সে একটু নরমও হয় না, নীরস গলায় বলে, ভালবাসার আবার প্রমাণ দিতে হয় নাকি ? কথাটা বলেই প্রমাণ দিলে, তোমার শুধু হিসাব কষা ভালবাসা। যাক্ গে, কেঁদো না, এ ভাবে কাঁদলে মনে হবে তোমার বুঝি হিষ্টিরিয়া হয়েছে !

জহর সেদিন বেশী মদ খায়। চন্দ্রার অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে।

চন্দ্রা মিনতি করে বলে, কিছু একটু খাও। খালিপেটে ওগুলি গিলে কিছু না খেয়ে ঘুমোলে পরদিন কিরকম শরীর খারাপ হয় মনে নেই ?

জহর তাকে এক ধমকে থামিয়ে দেয়।

মাঝরাত্রে চন্দ্রার ঘুম কিন্তু ভাঙে জহরের নিবিড় আলিঙ্গনে ও পাগলের মত আদর করার চোটে।

গভীর অনুতাপের সুরে জহর বলে, তোমায় আজ অনেক যা-তা কথা বলেছি, না ? লক্ষ্মীটি ওসব কথা ধরো না, রাগ কোরো না। মাথাটা কিরকম গরম হয়ে বিগড়ে গিয়েছিল।

: অত মদ খেলে বিগড়ে যাবে না মাথা ?

: কাল থেকে আর খাব না।

: একটু কিছু খেয়ে নেবে ? সেই দুপুরে অল্প চাট্টি ভাত খেয়েছিলে, তারপর কিছুই পেটে পড়ে নি—ওই জিনিষটা ছাড়া।

: এত রাতে খাব ?

: সামান্য কিছু খাও।

চন্দ্রা গরম করে খাবার এনে দেয়। খেয়ে উঠে জহরের ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে সে চন্দ্রার সঙ্গে জল্পনা কল্পনা চালিয়ে যায়—কি করে মদ খাওয়ার অভ্যাসটা একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব।

জল্পনা কল্পনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, পরদিন থেকে জহর যে আর মদ খাবে না বলেছিল একথাটা সে রাখতে পারবে না।

জামাই-এর সর্বস্ব, তার নিজের সর্বস্ব, অনেকের সহানুভূতি, সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা মূলধন।

জহর চাকরি করছে, তার দরকার নেই। কিন্তু মহেশের মাসে মাসে যেমন হোক একটা বেতন চাই।

নতুন প্রেস, কাগজটাও নতুন।

এত টাকা ঢেলে প্রেসটা চালু করে অনেক চেষ্টাতেও চল্‌তি খরচের টাকাটা মাসে মাসে তোলা যায় না। প্রায় বিজ্ঞাপনহীন কাগজটায় মাসে মাসে লোকসান দিতে হয়।

এটা জানাই ছিল। হিসাব করাই ছিল। নানা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে কাজ বাড়াতে হবে, বিজ্ঞাপন আনাতে হবে—তারপর হয় তো দেখা যাবে লাভের মুখ। বেশ কিছুদিন লোকসান দিয়ে চালাতেই হবে ছাপাখানা এবং মাসিকটা।

হিসাব করা থাকলেও চিন্তাভাবনার অন্ত থাকে না।

মহেশ ও জহর দু'জনেই মানবের কাছে একবিষয়ে কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সে জোর করে বলেছিল বলেই এবং অনেকটা তারই খাতিরে, কালাচাঁদের বাধ্যতামূলক বেকারত্বের একমাস সময়, প্রেসটা গড়ে তোলার খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখার বিশেষ কাজটা তাকে দেওয়া হয়েছিল।

কত অপব্যয় যে কালাচাঁদ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কোন একটা মোটা খরচ বাঁচানো নয়—অনেক রকম অনেকগুলি টুকরো খরচ। এতকাল একটা প্রেসের কাজ চালিয়ে এসেছে কিন্তু মহেশও হয় তো খেয়াল করত না অনেক টুকিটাকি অপব্যয়ের মোট কষলে কেমন একটা মোটা অঙ্ক দাঁড়িয়ে যায়।

মহেশ বলেছিল, লেগেই যাক না কালাচাঁদ?

মানব বলেছিল, না। নীতিটা ঠিক রাখতে হবে। এখানে নেওয়া হয়েছে শুধু বেকারদের—যদ্দিন প্রেস আর কাগজটা না দাঁড়িয়ে যায় ওরা কম পয়সায় বেশী খাটবে। এক মাস বেকার ছিল, খেটে গেল—ওকে এ লড়ায়ে টেনে লাভ কি? বৌ-টা মারা গেল, বড় একটা মেয়ে আছে—মেয়েটার বিয়ে এবার দিতেই হবে। যেখানে খেটেছে সেখানেই খেটে যাক যতদিন পারে।

মহেশ ও জহর দুজনেই মানবকে হরফ কাগজের সহকারী সম্পাদকের চাকরি নিতে বলেছিল।

বেতন কম কিন্তু প্রেস আর কাগজের ভবিষ্যতের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকবে তার চাকরি আর বেতন বাড়া।

প্রেস আর কাগজটার আয় যেমন বাড়বে তারই এক নির্দিষ্ট অনুপাতে তার বেতন বাড়বে। মুখের কথায় নয়, লিখিত চুক্তিপত্রে তাকে চাকরিতে বহাল করা হবে। হরফ বেঁচে থাকলে তার চাকরিও বজায় থাকবে। কোন বিশেষ অপরাধ করলে প্রকাশ্য আদালতে বিচার হবার পর আদালতের নির্দেশ নিয়ে তবেই তাকে বরখাস্ত করা চলবে।

মানব কিন্তু চাকরি নিতে রাজী হয় নি। বলেছিল, বাঁধা টাইমে বাঁধা নিয়মে খাটতে পারব না। ধাতে সইবে না। তার চেয়ে এক কাজ করুন—আমায় ছুটকো মজুর হিসেবে রাখুন। আমার নিজের লেখা যা ছাপা হবে কলম হিসেবে মজুরি দেবেন—প্রুফ যা দেখে দেব ফর্মা হিসেবে মজুরি দেবেন।

জহর রাজী হয়েছিল কিন্তু মহেশ আপত্তি করে বলেছিল, গাদা গাদা লেখা আসবে, সেগুলো যে পড়তে হবে তোমায়! কয়েকটা লেখা ঘষে মেজে ঠিক করেও দিতে হবে। এর মজুরি কষা হবে কি হিসেবে?

মানব হেসে বলেছিল, হিসেব খুব সোজা। বিনা পয়সায় হরফে কারো লেখা তো যাবে না—কবিতাও যেমন হোক কিছু দাম পাবে। ঘষামাজা করে যার লেখা ছাপতে হবে তার সঙ্গে আমার থাকবে একটা বখরা। কতটা ঘষামাজা দরকার হিসেব করে বখরা ঠিক হবে—লেখক রাজী না হলে সে লেখা যাবে না।

বাঁধা বেতনে বাঁধা টাইমের চাকরি নেয় নি—কিন্তু এই নিয়মে ক্রমে ক্রমে বাঁধা বেতনের সহ-সম্পাদকের চেয়ে ঢের বেশী খাটছে মানব।

লেখা পড়তে হয় অজস্র। কয়েকটা লেখা বেছে সংশোধন করে দিতে হয়। নামকরা লেখকের যে লেখা ছাপা হবেই, সে লেখারও অনেক বানান ভুল ব্যাকরণ ভুল, তাকে শুদ্ধ করে নিতে হয়।

নিজেকে নানারকম লেখা লিখেও দিতে হয় নানা বিষয়ে।

চুক্তি মাফিক চাকরি নিলে মানবকে সাড়ে দশটায় হরফের আপিসে পৌঁছে পাঁচটায় বেরিয়ে যাওয়া চলত।

যেমন খাটুনি তেমন মজুরির নিয়মে নিজেকে বহাল করে তাকে সকালে চা খাবার খেয়ে যেতে হচ্ছে হরফের আপিসে—বস্তির ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাচ্ছে!

মহেশ বলে, সত্যি তুমি চালাক ছেলে। যে চাকরি নিলে ষাট সত্তর টাকা মাইনে পেতে, সে চাকরি না নিয়ে মাসে ঢের বেশী কামাচ্ছ।

মানব হেসে বলে, আপনারও এ বিভ্রম হল? লাভ করছি ভাবলেন? চাকরি নিলে ক'ঘণ্টা কি ভাবে খাটতাম আর এখন কি ভাবে খাটছি হিসেব কষলেন না? খাটুনির তুলনায় কিছুই তো পাচ্ছি না!

: একলা মানুষ, টাকা দিয়ে কি করবে মানব?

: একলা মানুষ কি দোকলা মানুষ সে ভাবনা আপনার কেন? টাকা নিয়ে ফুর্তি করব, টাকা উড়িয়ে দেব! খেটেই তো রোজগার করছি টাকা! দয়ার দান তো নিচ্ছি না!

মহেশ একটু হেসে বলে, আমি লক্ষ্য করেছি কয়েকটা বিষয়ে সাধারণভাবে—এমন কি তামাসা করে তোমায় কিছু বললেও, তোমার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে।

মানব লজ্জা পেয়ে বলে, না না, মেজাজ গরম হয় নি, তবে আপনিও যখন বলেন লেখকের টাকার কি দরকার—প্রাণে তখন লাগে।

সাত টাকা ভাড়ার একখানা ঘরে থাকে। নিজের মনে লেখে।

কারো তোয়াক্কা রাখে না। তবু কেন তাকে বাঁধা পড়ে যেতে হল হরফের স্বার্থে? সব দায় যেন তার! সম্পাদক মহেশের নির্বাচিত লেখা বাতিল করার দায় পর্যন্ত তার ঘাড়ে চেপেছে!

তার অগোচরেই কম্পোজ হয়ে গিয়েছিল লেখাটা। প্রুফ দেখে সে ছাপাবার অর্ডার দেবে।

লেখাটা পড়ে মহেশের টেবিলের সামনে সাজানো একটা চেয়ারে বসে সে বলে, ভীমরতি ধরে থাকলে হাসপাতালে যেতে পারতেন, হরফের কেন সর্বনাশ করছেন?

মহেশ রাগ করে না, হেসেই বলে, আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে তুমি বুঝি হরফের সম্পাদক হতে চাও?

: আজ্ঞে না। সম্পাদক হবার মোটেই সখ নেই। কিন্তু এ লেখাটা কি ছাপা চলে? এ লেখাটা ছাপালে বলতেই হবে হরফের লেখা বাছাই করার কোন নিয়ম নীতি নেই, বিচার বিবেচনা নেই, হরফ একটা সস্তা বাজে কাগজ।

: বটে! দেখি তো কোন লেখাটা?

ছাপা লেখাটায় চোখ বুলিয়ে মহেশ প্রুফের কাগজ কটা কয়েক ফালা করে ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়। বলে, সত্যিই বলেছ, হরফে এ লেখা ছাপা যায় না।

: জহর রেগে যাবে না?

: রেগে গেলে উপায় কি? কাগজের মালিক আর আমার জামাই বলে কি এ লেখা ছাপা যায়? জহরের লেখা আবার কি দেখব ভেবে আমিই অবশ্য না পড়ে লেখাটা ছাপতে দিয়েছিলাম— জহর এমন বাজে লিখবে ভাবতেও পারি নি। এখন বুঝতে পারছি মদের ঝোঁকে লিখেছিল, নিজে আরেকবার না পড়েই দিয়ে গেছে।

জহর এসে হাতে লেখা কপিটা তাকে ফেরত দিয়ে মহেশ বলে, লেখা শেষ করে আরেকবার পড়ে দেখেছিলে? পড়ে দেখো!

মনে মনে জহর রাগে কিনা টের পাওয়া যায় না, মানব তবু ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার জন্য হেসে বলে, আপনার নিজের কাগজ—এখান থেকে লেখা ফেরত গেলে আপনার কিন্তু কোন অপমান হয় না। বেশীরকম কড়া হয়েছে বলে আমার একটা লেখাও, মহেশবাবু ফেরত দিয়েছেন।

শুধু লেখা ছাপিয়ে নয় লেখাটার নামে কাগজের নামকরণ করে কালাচাঁদকে এমনি উছলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম সংখ্যা কাগজ বার হবার পর সে আরেকটা গল্প এনে দেয়।

দ্বিতীয় সংখ্যায় উমাকান্তেরও একটা লেখা বার হবে।

হরেক সব লেখার উপরে স্পষ্টভাবে লেখার পরিচয় ছাপিয়ে দেওয়া হয় যে সেটা গল্প অথবা প্রবন্ধ অথবা কবিতা—কালাচাঁদের লেখাটার কোন পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে না!

এটা কোন লেখায় পর্যায়ে পড়ে ভেবে চিন্তে পরামর্শ করে ঠিক করতে পারে নি মহেশ, মানব, আর জহর।

খানিকটা যেন গল্প, খানিকটা আত্ম-জীবনী খানিকটা ব্যঙ্গ রচনা, খানিকটা প্রবন্ধ, খানিকটা আগুনের শিখার মত লেলিহান ঘৃণা ও জ্বালার উচ্ছ্বাস!

বেশ বড় লেখা—কারুকার্যহীন, সাদামাটা খানিকটা সেকেলে ধাঁচের গদ্যে কোন রকম কায়দা খাটাবার চেষ্টা না করে সোজাসুজি গল্পটা বলে যাওয়া—পড়ে কিন্তু প্রাণটা বিশেষভাবে নাড়া খায়।

এ গল্পেও সে ধনদাসকে একচোট নিয়েছে।

লেখাটার আরম্ভ হল:

একজন নামকরা লেখক ছিলেন, তাহার নাম ছিল দুর্গানাথ।

কেবল লেখার কাজ করিতেন বলিয়া দুর্গানাথের দারিদ্র্যের সীমা ছিল না।

সুন্দরী পত্নীকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন—বাসিবেন না? অমন রূপবতী গুণবতী স্ত্রীকে ভাল না বাসিয়া কোন স্বামী পারেন! গরীব বলিয়া কোন সাধ পূর্ণ করিতে না পারিলেও মাঝে মাঝে একটু ঝগড়াঝাঁটি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন এবং কর্মক্লান্ত স্বামীর শরীর ও মনকে তাজা রাখিতে হাসিমুখে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

স্বামীর সেবা করার সঙ্গে তিনটি সন্তানকে জীবনপাত করিয়া লালনপালন করিতেন……

লেখক দুর্গানাথ স্ত্রীকে আদর করিয়া 'খেলনা' বলিয়া ডাকিতেন—বলিতেন, তুমি সত্যি দামী খেলনা। এমন গুরুতর কাজ করি, এমন সব ভাবনায় মেতে থাকি, তুমি একটু খেলা দিয়ে না সামলালে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতাম।

খেলনা হাসিত, বলিত, নিজের স্বার্থ না দেখলে চলে? তুমিই আমার স্বার্থ—কাজেই তোমাকে দেখতে হয়।

দুর্গানাথ হাসিয়া উঠিয়া বলিতেন, ও, তুমি তবে নিজের স্বার্থে সব কর, তুমি এমন স্বার্থপর!

ঘরের কাজ করিতে করিতে মুখ তুলিয়া হাসি মুখে খেলনা বলিতেন, স্বার্থ না দেখে কি করে পরার্থ দেখব? তুমিই আমার একমাত্র পরার্থ—তোমায় দেখা স্বার্থ দেখায় তফাত কিসের?

এমনি ভাবে শুদ্ধ ও চলতি ভাষা খানিকটা জড়িয়ে দুর্গানাথ ও

খেলনার ঘরোয়া জীবনের একটি সরস মধুর চিত্র দিয়ে কালাচাঁদ আমদানী করেছে ধনেশকে :

কিছুদিন একসাথে পড়িয়াছিলেন বলিয়া ধনেশ নামে একজনের সঙ্গে দুর্গানাথের ভাব ছিল। ধনেশ একটি ছাপাখানার অংশীদার ও ম্যানেজার ছিলেন।

পুরাতন বন্ধু যে কিরূপ অর্থপিশাচ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছাপাখানার লোকেদের সহিত কিরূপ দুর্ব্যবহার করিতেন দুর্গানাথ তাহা জানিতেন না। ধনেশের অনুরোধে প্রকাশককে বলিয়া দুর্গানাথ তাহার বইগুলি ওই ছাপাখানায় ছাপিতে দিতেন এবং প্রুফ দেখিবার জন্য প্রায়ই প্রেসে গিয়া বন্ধুর সহিত গল্প করিতেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে ধনেশ ভিজা বিড়ালটির মত ভাল মানুষ সাজিয়া থাকিত।

ধনদাসের চেহারা এবং তার প্রকৃতির কিছু বর্ণনা আছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কিন্তু ধনদাসের সরু গলা থেকে কটা চোখ পর্যন্ত চেহারার এবং লুকিয়ে কর্মীদের কথাবার্তা শোনা বাইরের লোকের সামনে দু'একটা সিগারেট ও অন্য সময় বিড়ি টানা পর্যন্ত চালচলনের এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট কালাচাঁদ বেছে নিয়েছে যে ধনদাসকে যারা জানে বর্ণনাটা পড়তে পড়তে তাদের মানস চোখে ধনদাসই রূপ গ্রহণ করবে।

:

তারপর কালাচাঁদ দরিদ্র কিন্তু সুখী দুর্গানাথের জীবনে বিপদ এনেছে —খেলনার কঠিন অসুখ। তার চিকিৎসার জন্য প্রকাশকদের কাছে ধন্না দিয়ে কিছু পাওনা টাকা এবং নতুন একটা বই-এর জন্য কিছু আগাম টাকা যোগাড় করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্গানাথ ধনেশের প্রেসে যায়। বাড়ি ফেরার জন্য প্রাণ আকুল, কিন্তু দায় না সারলেও উপায় নেই। প্রুফ দেখে

ছেড়ে দিলে বইটা তাড়াতাড়ি বাজারে বেরোবে এবং তারও টাকা পাওনা হবে।

একটা সুযোগ সৃষ্টি করিয়ে ধনেশকে দিয়ে দুর্গানাথের ওই টাকাটা কালাচাঁদ চুরি করিয়েছে!

চমৎকার জমেছে গল্পের ক্লাইম্যাক্সটা। ধনদাসের উপর ঘৃণায় সর্বাঙ্গ যেন রি রি করতে থাকে। সুযোগ পেয়ে লোভ সামলাতে না পেরে বন্ধুর মৃতপ্রায় রুগ্না স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য এত কষ্টে সংগ্রহ করা টাকাটা চুরি করে ধনেশের মধ্যে লোভ ও পাপ করার ভয়ের স্থূল বিরোধ বর্ণনা করে, টাকা খোয়া গেছে জেনে হতভম্ব দুর্গানাথের মুখে "খেলনাকে তবে মরতে হবেই" উক্তি শুনে—"টাকা ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে একটু তামাসা করছিলাম" বলে অনায়াসে নোটগুলি ফিরিয়ে দেওয়া যায় খেয়াল করে, ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা জাগলেও পাপীর মনের ভয় আর লোভ, কি ভাবে ইচ্ছাটা কার্যে পরিণত করিতে ছিল না, তার সহজ সরল বর্ণনা দিয়ে কালাচাঁদ লিখেছে—

বুকটা ধড়ফড় করিতে থাকে, প্রাণটা আঁকুপাঁকু করিতে থাকে, বন্ধুর গ্রাস করা টাকাটা উগড়াইয়া দিবার জন্য ধনেশের অন্তরে ছটফটানি জাগে। কিন্তু গ্রাস করা টাকা পয়সা উগড়াইয়া দেওয়া তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ। নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে কেমন করিয়া যাইবে! চোর ডাকাত খুনীদের কি আর সাধুপুরুষ মহাপুরুষ হইবার সাধ জাগে না? কিন্তু অনুরূপ সাধ জাগিলে কি হইবে, স্বভাব তাহাদের চুরি করায়, ডাকাতি করায়, খুন করায়।

পরিহাস করিয়াছে বলিয়া চুরি করা টাকাটা ফেরত দিতে পারে জানিয়াও এবং ফেরত দিতে চাহিয়াও মহেশ বলে, ভাই,

তোমরা লেখকরা বড়ই কাছাখোলা লোক। কলকাতার পথে-ঘাটে হরদম পকেট থেকে টাকা মারা যাচ্ছে জানো না?

বিহ্বল দুর্গানাথ বলে, বাস থেকে নেমে একবার হাত দিয়ে দেখেছিলাম ব্যাগটা ঠিক আছে।

ধনেশের বুকটা কাঁপিয়া ওঠে। দুর্গানাথের সামান্য টাকাটা চুরি করিয়া কি বোকামিই করিয়াছে। এই কথাটাই হয় তো দুর্গানাথের মনে তোলপাড় করিবে যে বাস হইতে নামিয়া পকেটে হাত দিয়া দেখিয়াছিল পকেটে টাকা ঠিক আছে—তার প্রেসে ঢুকিবার পর শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে নোটগুলি।

হয় তো আর তার প্রেসে আসিবে না দুর্গানাথ। হয় তো আর সে তাকে কোন কাজ দিবে না।

হয় তো সকলের কাছে তাহার নিন্দা করিয়া বেড়াইবে।

এরূপ চিন্তা দুর্গানাথের মনের কোনেও উঁকি মারে নাই। কিন্তু পাপীর মন সর্বদাই ভীত হইয়া থাকে যে, তাহার পাপকর্ম জানিবার বুঝিবার জন্য জগৎ-সংসারে সকলেই ওৎ পাতিয়া আছে।

ধনেশ হাসিয়া বলে, লেখক মানুষ, তোমাদের ব্যাপার আলাদা। বাসে উঠবার আগে, না বাস থেকে নেমে পকেটে টাকা ঠিক আছে জেনেছিলে ভাই?

দুর্গানাথ মাথায় ঝাঁকি দিয়া বলে, কী জানি আমার মাথা ঘুরছে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধনেশ বলে, আমারও এমন অবস্থা

দাঁড়িয়েছে যে তোমাকে সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। গোটা কুড়ি ধার দিচ্ছি, যখন পারবে শোধ দিও।

বন্ধুর স্ত্রীর চিকিৎসা করার টাকা চুরি করিয়া ধনেশের মাথাও এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল।

দুর্গানাথের যে টাকা চুরি করিয়াছিল তাহা হইতেই দুইটি দশ টাকার নোট সে দুর্গানাথকে দেয়।

সব নোটই একরকম। দুর্গনাথ বুঝিতে পারে না যে, রক্ত জল করা পরিশ্রমের চুরি যাওয়া মজুরির নোটগুলি হইতেই সে দুটি দশ টাকার নোট বন্ধুর কাছে ঋণ হিসাবে ফেরত পাইয়াছে।

মানব বলে, না, সত্যি লেখক হয়ে উঠেছে কালাচাঁদ! খেলনার জন্ত দুশ্চিন্তা, বাড়ী ফেরার জন্ত ব্যাকুলতা, প্রুফ দেখার সময় অন্তমনস্কতা—এ সব বর্ণনা না দিলে চুরিটা একটু বেখাপ্পা হয়ে যেত।

ধনদাস উমাকান্তকে মহেশের কাগজটার সঙ্গে পাল্লা দেবার কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে হরফের সঙ্গে রস-সাহিত্যের প্রায় কোন প্রতিযোগিতা নেই—দুটি একেবারে দু'স্তরের দু'রকম পাঠকের জন্ত আলাদা রকম মাসিকপত্র। কিন্তু সে কথা ধনদাসকে বলে কোন লাভ নেই জেনে উমাকান্ত অনর্থক বাক্য ব্যয় করে নি। ধনদাসের কাছে মহেশের কাগজ বার করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল তার কাগজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, তার কাগজকে হটিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া!

মহেশের বদলে অন্ত কেউ সম্পাদক হয়ে মাসিকটা বার করলে দু'একবছর চলবার পরেও হয়তো ধনদাসের চোখে পড়ত না, চোখে পড়লেও পাতা উল্টে দেখার সখ হয়তো জাগত না কোনোদিন।

তার কাগজ থেকে বিতাড়িত মহেশকে কেন্দ্র করে বার হয়েছে বলেই 'হরফ' সম্পর্কে তার এত কৌতূহল। দ্বিতীয় সংখ্যা 'হরফ' বার হবার সময় হলে প্রতিদিন সে ষ্টলে খোঁজ নেয়, প্রকাশিত হওয়ামাত্র এক সংখ্যা কিনে নেয় এবং নিজের কাগজটার চেয়েও বেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বেশী সময় খরচ করে সেটা মন দিয়ে পড়ে।

এ সংখ্যাতেও কালাচাঁদের 'হরফ' নামে আরেকটি লেখা ছাপা হয়েছে দেখে সর্বাগ্রে সে ওই লেখাটি পড়ে নেয়।

ধনদাসের বুকটা আবার ধড়াস করে ওঠে। প্রথম সংখ্যা 'হরফ' কাগজে কালাচাঁদের প্রথম লেখা 'হরফ' পড়ে যেমন ধড়াস করে উঠেছিল।

এবার আরও স্পষ্ট—আরও সাংঘাতিক আক্রমণ!

দুর্গানাথ অর্থাৎ উমাকান্তের স্ত্রী খেলনা অর্থাৎ পুতুলের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য অতি কষ্টে সংগ্রহ করা টাকা ধনেশ অর্থাৎ সে চুরি করে বন্ধুর স্ত্রীকে খুন করেছে।

কারও কি বুঝতে বাকী থাকবে কোন ব্যাপার নিয়ে কাকে এ গল্পে ঠোকা হয়েছে?

কে এই গল্পের লেখক? স্বয়ং উমাকান্ত কি? কাউকে ফরমাস করে টাকা দিয়ে ওটা লিখিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে লেখককে নিয়ে ধনদাস মাথা ঘামাবে না। কিন্তু উমাকান্ত নিজেই যদি ওটা ছদ্মনামে লিখে থাকে, তার মাসিকের মুদ্রাকর হবার সম্মান পেয়েও তাকে এভাবে আঘাত করে যে লেখা ছাপাতে পারে, তাকে শুধু তাড়াবে না—ঘা মেরে ওকে সে কাঁদিয়ে ছাড়বে—চুরমার করে দেবে! ভাল করে বুঝিয়ে দেবে যে পিপড়ের পাখা গজালে ফলটা কি হয়।

সেজন্য এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। উমাকান্তের মত একটা মানুষকে জব্দ করার উপায়ের তার অভাব হবে না। আগে জানতে হবে সত্যই উমাকান্ত লেখাটার জন্য দায়ী কিনা।

একটু বিরক্তির ভাবও দেখাবে না। এবং সদয় ব্যবহারে উমাকান্তকে নির্ভয় নিশ্চিন্ত করে রাখবে।

আসল ব্যাপারটা নিয়ে একটু মাথা ঘামানো দরকার।

মহেশকে বরখাস্ত করায় এবং উমাকান্তের বইটার কপিরাইট দেড়শো টাকায় কিনে ফেলায় তার যে ভারি বদনাম হয়েছে এটা ভাল করেই ধনদাস টের পেয়েছে।

কিন্তু আজও সে বুঝে উঠতে পারে না তার অপরাধটা কি, কি মারাত্মক দোষটা সে করেছিল!

মহেশ ঠিকমত সার্ভিস দিতে পারছে না, রস-সাহিত্য ঠিকমত চালাতে পারছে না, তবু মাসে মাসে মাইনে দিয়ে ওকে রেখে তাকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে?

মহেশ যে ঠিকমত চালাতে পারছিল না কাগজটা, উমাকান্তই তো তার জীবন্ত প্রমাণ! এক যুগেরও বেশী সময় ধরে সম্পাদক হয়ে থেকে মহেশ যা পারেনি, কত অল্প সময়ে উমাকান্ত সেটা সম্ভব করেছে—বর্ষার লতার মত ফণফণিয়ে বেড়ে গেছে রস-সাহিত্যের বিক্রী, বিজ্ঞাপন আর লাভ। উমাকান্তকে পুরস্কার না দিয়ে সে পারে নি।

মহেশকে তাড়ানো তবু কেন দোষনীয়? একজন অকর্মাকে লোকসান দিয়ে দিয়ে পোষাই কি তার কর্ম—তার ধর্ম—তার কর্তব্য?

উমাকান্তের বেলাতেও সে কি অপরাধ করেছিল?

বলামাত্র দু'শো টাকা দিতে তো সে রাজী হয়েছিল হাতে লেখা দিস্তা কয়েক কাগজের জন্য! ওই টাকায় তো অনায়াসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত পুতুলের!

নিজেকে মস্ত বড় মনে করে অহঙ্কারে উমাকান্ত যদি না গ্রহণ করে থাকে তার উদারতা, ব্যবসাদারের মতই যদি যাচাই করে আসতে গিয়ে থাকে বাজারটা, কোথাও সুবিধা করতে না পেরে যদি আবার তার

কাছেই ফিরে এসে থাকে, তার অসদ্ব্যবহারে চটে গিয়ে সে যদি দুশো টাকার বদলে দেড়শো টাকায় কিনে নেয় তার বই-এর কপিরাইট—তাতে উমাকান্তের বৌকে মেরে ফেলার দায়টা তার ঘড়ে চাপে কোন্ যুক্তিতে? অন্য যে সব প্রকাশকদের কাছে উমাকান্ত চেষ্টা করতে গিয়েছিল, তারাও সমানভাবে দায়ী নয় কেন?

দুশো টাকা দিতে চেয়েছিল, নগদ নোট গুনে দিতে চেয়েছিল, চটপট ওই টাকাটা নিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করালে বৌটা তার নিশ্চয় বেঁচে যেত।

এ কি রকম পাগলামি যে বৌ মরে মরুক তবু আমি সস্তায় কপিরাইট বেচব না?

বিপদে পড়ে মানুষ কাবুলিওয়ালার স্মরণ নেয়—নগদ শোধ দিতে পারবে না শুধু সুদ গুনে গুনে জীবন কাটানো কবুল করে ফেলে।

বইটা চলবে কি চলবে না, ছাপিয়ে লাভ হবে কি লোকসান যাবে, কিছুই ঠিক নেই। এ অবস্থায় দুশো টাকা নগদ দিয়ে কপিরাইট কেনা অপরাধ হবে কেন তার?

কেন তার বদনাম হবে? কেন 'হরফ' এমন লেখা বার করার সুযোগ পাবে যা পড়েই উমাকান্তের কপিরাইট বিক্রীর ব্যাপার যারা জানে তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে কাকে আঘাত করা হয়েছে?

আরও কম টাকাতেও সে কপিরাইট কিনেছে, অবশ্য উমাকান্তের মত ওই লেখকদের নাম ছিল না।

মানবের একেবারেই নাম ছিল না, তার প্রথম বই-এর কপিরাইট কিনেছিল একান্ন টাকায়! বইটি খুব বিক্রী হয়েছে ইতিমধ্যে পাঁচটা সংস্করণ হয়েছে এবং ওই একখানা বই থেকে মানাবেরও নাম ছড়িয়েছে লেখক হিসেবে।

তার কাছে ধনদাস আরেকখানা বই চেয়ে চিঠি লিখেছিল কিন্তু তার

তিন চারখানা চিঠির জবাবও সে দেয় নি। রস-সাহিত্যে লিখেও দশ পনের টাকা দক্ষিণা পায়। অন্য কাগজেও লেখে, অন্য প্রকাশক বইও প্রকাশ করেছে কয়েকখানা।

এমনি নেমকহারাম হয় বটে মানুষ! প্রথম বই সাহস করে ছাপিয়ে বাজারে ছড়িয়ে নাম করে দিল—এখন তার চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয় না!

ভেবে চিন্তে ধনদাস একদিন সকালে মানবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। হাত তুলে নমস্কার করে অমায়িক হাসির সঙ্গে বলে, কেমন আছেন মানববাবু? আপনারা তো আর যাবেন না, নিজেই একবার দেখা করতে এলাম।

অল্পক্ষণ সাধারণ আলাপের পরেই ধনদাস বলে, আমাকে আর বই দেবেন না?

মানব জ্বালাভরা হাসির সঙ্গে বলে, আপনাকে বই? পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট কিনে পাঁচটা এডিসন করেছেন—আপনাকে আবার বই?

ধনদাস ঝাঁকিয়ে বসে বলে, অপরাধ করেছিলাম বলতে চান?

মানব জ্বালার সঙ্গেই বলে, অপরাধ নয়? লেখককে বাগে পেয়ে ঠকানো কি পুণ্য কাজ?

ধনদাস বলে, তখন আপনার একখানাও বই বার হয় নি এটা ভুলে যাবেন না দয়া করে। প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছিলেন সেটাও মনে রাখবেন। আমি সাহস করে কপাল ঠুকে বইটা ছেপেছিলাম বলেই আজ নাম করেছেন—লিখে টাকা কামাচ্ছেন।

মানব ব্যঙ্গের সুরে বলে, কপালটা ঠুকে দিয়েছিলেন আমার। ক'টা টাকার জন্ম বিপদে না পড়লে কপিরাইট বেচতাম ভেবেছেন? আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কতই দয়া করেছিলেন! বই আমার ছাপা হত, নামও হতই—দু'দিন আগে আর পরে। বই ভাল হলে ছাপা কি আটকে থাকে?

ভাল পাবলিশারও অনেক আছেন যারা ভাল বই-এর কদর বোঝেন, লেখককেও ঠকান না। সবাই আপনার মত ডাকাত নয়!

একটু থেমে মানব বলে, দু'এক দিনের মধ্যে টাকাটা না চাইলে, বিপাকে পড়েছি টের না পেলে, আপনিই কি পঞ্চাশ টাকায় কপিরাইট চাইতে সাহস পেতেন? রিস্কের কথাই বা বলছেন কোন মুখে? ম্যানস্ক্রিপ্‌ট দুদিন আপনার কাছে ছিল—বইটা যাচাই করেন নি বলতে চান? ভাল বই জেনেই লেখকের গলা কাটার সুযোগ নিয়েছিলেন। নতুন লেখক তো কি হয়েছে? সব লেখকই একদিন নতুন থাকেন!

ধনদাস বলে, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ—

মানব বলে, এর নাম কি ব্যবসা? কায়দায় পেয়ে লেখকের ন্যায্য পাওনা মেরে দেওয়া? সাধারণভাবে যদি যেতাম, ম্যানস্ক্রিপ্ট পড়ার সময় দিতাম—নিজে কিছু বুঝুন না বুঝুন, কোন লেখককে দিয়ে পড়িয়ে তার মত নিয়ে অন্য রকম চুক্তিতে ছাপতেন। নতুন লেখক বলে, রিস্ক আছে বলে, প্রথম এডিসনে রয়ালটির সাধারণ রেটের চেয়ে অবশ্য কিছু কম পেতাম। সেটা হত ব্যবসা।

মহেশ গোমড়া মুখে বলে, কে জানে মশায়—আপনাদের ন্যায়নীতি যুক্তিতর্ক মাথায় ঢোকে না। হলই বা বই—ব্যাপার তো সেই বেচাকেনার? বেচার গরজ বেশী হলে সস্তায় মাল ছাড়তেই হয়—সেটাই তো নিয়ম। দরকার হলে লোকসান দিয়েও ছাড়তে হয়। সবটা লোকসান যাবে—যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই তখন লাভ। যে বই একদম কাটছে না সে বই আমরা মোটা কমিশন দিয়ে কাটিয়ে দিই—আদ্দেক দাম পেলে তাই সই, সিকি পেলে তাই সই। তাও না পেলে ওজনদরে ছেড়ে দিই।

মহেশ সখেদে মাথা নাড়ে, না মশায়, আপনাদের যুক্তি একদম মাথায় ঢোকে না। কই, আমাদের তো কেউ রেয়াত করে না!

তার আন্তরিকতা সম্পর্কে এতক্ষণে সচেতন হয়ে মানব প্রথমে বিস্মিত তারপর স্তম্ভিত হয়ে যায়। ধনদাসের আন্তরিকতা?

আন্তরিকতা বৈ কি!

মারাত্মক রকমের আন্তরিকতা। ধনদাস মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে দুনিয়ায় লেনদেন বেচাকেনার নীতিই এই—যেখানে সুবিধা পাবে, যখন যাকে বাগে পাবে!

সবাই ওৎ পেতে আছে, তাকে বাগে পেলেই তার ঘাড় ভাঙবে—সুতরাং তারও পরিপূর্ণ অধিকার আছে যাকে যখন যেভাবে বাগে পাবে তারই ঘাড় ভাঙার!

মানব ভেবে পায় না কি করে আসল কথাটা তাকে বোঝাবে, বিশ্বাস করতে পারে না যে জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দিলেও সে বুঝবে।

সে বেচাকেনার শুধু লাভ লোকসানের চলতি হিসাবটা জানে বোঝে। সাহিত্য বল আর সংস্কৃতি বল আর সভ্যতা বল, ওসব কোন কিছুর ধার সে ধারে না।

মানব খুব নরম সুরে বলে, কথাটা কি জানেন, লেখকেরা ব্যবসায়ী নন, তারা সমাজের সেবক। লেখকরা প্রকাশকের সঙ্গে ব্যবসা করেন না, লেখকের সঙ্গে পার্টনারশিপে লেখকের বই নিয়ে প্রকাশকেরা ব্যবসা করেন। প্রকাশকের সঙ্গে ছাপাখানা, কাগজওলা এদের ব্যবসার সম্পর্ক—লেখকের সঙ্গে সে সম্পর্ক নয়। তাছাড়া, লেখকেরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। সেইজন্য তারা আপনাদের কাছে সহযোগিতা, সহানুভূতি, ন্যায্য ব্যবহার, আশা করেন।

ধনদাস খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে বলে, অন্যায্য ব্যবহারটা কি করেছি বুঝিয়ে বলুন না? বেশ, আপনার কথাই মানছি, আমি না ছাপলেও আপনার বইটা ছাপা হত! ধরুন আরও দু'তিন বছর ঘোরা-ফিরা করতেন—তারপর নাম হত। একটু দাঁও মেরে থাকলেও আমি

বইটা ছাপিয়ে দিতে চটপট আপনার নাম হয়ে গেল। ওই দু'তিন বছরে পাঁচ ছ'টা বই লিখে ভাল টাকা পেলেন। বইটা নিয়ে আমি লাভ করেছি—আমি বইটা নিয়েছিলাম বলে আপনিও তো লাভ করেছেন!

মানব এবার বিরক্ত হয়ে বলে, আপনার খালি লাভের হিসাব। লেখক কি শুধু লাভের জন্য লেখেন? টাকার জন্য লেখেন?

ধনদাস বিরক্ত হয়ে বলে, লেখার জন্য লেখকরা তবে টাকা চান কেন? যত বেশী পারেন টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন কেন?

মানব এবার সশব্দে হেসে উঠে বলে, লেখককেও বাঁচতে হবে বলে!

কতকাল আর ধনদাসের কাছে গোপন থাকা সম্ভব যে, হরফের শ্রীহীন উপাধিহীন লেখক কালাচাঁদ তারই প্রেসের কম্পোজিটর?

লেখকদের ছদ্মনামে লেখার বাসনার খবরটা ধনদাসের অজানা ছিল না। সে ধরে নিয়েছিল যে হরফের শ্রীহীন উপাধিহীন কালাচাঁদ কোন নামকরা লেখকের ছদ্মনাম—মহেশ হওয়াও আশ্চর্য নয়, মানব বা খালেক হওয়াও আশ্চর্য নয়। উমাকান্তও হতে পারে।

নানাভাবে ধনদাস জানবার চেষ্টা করছিল হরফের লেখক কালাচাঁদের আসল নামটা কি!

লেখাটা নিয়ে যেরকম হৈ চৈ তাতে অধিকাংশ লেখকেরই ইতিমধ্যে জেনে যাবার কথা—আসল মানুষটা কে। কিন্তু আশ্চর্য এই, যাকে জিজ্ঞাসা করে সে-ই বলে জানে না! লেখকদের মধ্যে এমন একতা! এমনভাবে সবাই জোট বেঁধেছে! তার কাছে কালাচাঁদের আসল পরিচয় ফাঁস করা হবে না!

সুহৃদ চৌধুরী অত্যন্ত বাজে লেখে কিন্তু ধনদাসের সে স্তাবকের মত অনুগত। প্রতি সংখ্যা রস-সাহিত্যে তার লেখা ছাপা হয় এবং সেই লেখার

জন্য সে সত্যিকারের লেখকের ভাল লেখার সমান মজুরি পায়। সুহৃদ যা লিখতো নিরুপায় মহেশ তাই ছাপিয়ে দিত।

তার লেখা না ছাপিয়ে উপায় নেই জেনে উমাকান্ত একটু কৌশল খাটিয়ে তার লেখা কন্‌ট্রোলের ব্যবস্থা করেছে। সুহৃদকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে রস-সাহিত্যের রকমফের হচ্ছে, নানারকম নতুন লেখা দিতে হচ্ছে, খুব ছোট ছোট লেখা না দিলে হয় তো সুহৃদের লেখা সব সংখ্যায় ছাপা যাবে না।

: ছোট লেখা লিখুন না, যত ছোট পারেন! ছোট লেখাতেই আপনার কলম ভাল খোলে। লেখা ছোট হলেও দক্ষিণা ঠিক থাকবে—সেজন্য ভাববেন না।

কৃতজ্ঞ সুহৃদ ছোট ছোট লেখা দেয়, উমাকান্ত সেটা এমন যায়গায় গুঁজে দেয় যে রস-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা বাজে লেখাটা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।

ধনদাস একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতটুকু করে লিখছ সুহৃদ? ফাঁকে ফোকড়ে তোমার লেখা ছাপা হচ্ছে কেন?

সুহৃদ বলেছিল, আমার ছোট লেখাই ভাল জমে। উমাবাবু যায়গামতই ছাপছেন।

একদিন ধনদাস একটু রাগের ভাব দেখিয়ে সুহৃদকে বলে, এতদিন ধরে বলছি, হরফের ওই কালাচাঁদ লেখকটা কে, খবর জানতে পারলে না? তুমি কেমন লেখক হে?

সুহৃদ সবিনয়ে বলে, কি করব বলুন? অসম্ভব কি সম্ভব করতে পারি? কারো সাধ্য নেই ওই লেখকের আসল পরিচয় বার করে। ব্যাপারটা বুঝছেন না? মহেশবাবু কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, হাতের লেখা চেনা যাবে বলেও হয়তো কাপি করিয়ে প্রেসে দিচ্ছেন।

অকাট্য মনে করলেও যুক্তিটা পছন্দ হয় না ধনদাসের। কেন পছন্দ হয় না সে অবশ্য বুঝতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে এরকম লুকোচুরি জুয়াচুরির ব্যাপার চলে না, লেখকদের মধ্যে যতই মতবিরোধ ঈর্ষা আর বিদ্বেষ থাক, লুকিয়ে থেকে কোন ব্যক্তিকে ঘা দিয়ে ব্যক্তিগত গায়ের ঝাল ঝাড়ার নীতি সাহিত্যে অচল। জীবনের নীতিকে তুলে ধরাই সাহিত্যের মূল নীতি।

সাহিত্য বিজ্ঞানকেও কণ্ট্রোল করে। হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সাহিত্যের মুখ চেয়ে থাকে!

ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সাহিত্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণ বাতিল নয়, সাহিত্যে সে আক্রমণ খিস্তিও হতে পারে কিন্তু বেনামীতে চলবে না।

লেখকদের নিজের নাম থাকলে সে কাগজ গরম গরম ব্যপারে পড়তে না পড়তে বিকিয়ে যাবে। কারণ, সবাই বুঝতে চাইবে রক্তমাংসের মানুষটার বা মানুষগুলির এমন গায়ের জ্বালার কারণ কি।

আত্মগোপন করে ছদ্মনামে লেখাগুলি ছাপালে কাগজটা বিশ পঁচিশ কপি বিক্রী হবে কিনা সন্দেহ।

সবাই ভাববে, কে জানে কোন চোর ছ্যাঁচড় চোরাবাজারি বজ্জাতের মাথায় খিস্তি ছেপে গরীবের পকেট মারার মতলব জেগেছে!

কালাচাঁদও ছদ্মনামে লেখাটা ছাপালে অনেকেই একটু বিস্মিত এবং বিচলিত হয়ে ভাবত এটা কার লেখা, কিরকম লেখা!

গুণী মহলের কাছ থেকে খবর দাবী করত।

কারণ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে তাদের স্বীকৃতি না পেয়ে কেউ গুণী হয় না—হতেই পারে না।

বিচলিত গুণী মহল, যেমন একজন কম্পোজিটার স্বনামে লেখাটা প্রকাশ করেছে জেনে, এমন লেখা সে কেন লিখেছে জেনে দশজনকে খবরটা

জানিয়ে দিয়েছে, কালাচাঁদের নাম পরিচয় গোপন রাখলে সে খবরটাও দশজনকে জানিয়ে দিত।

লেখকের পরিচয় এবং লেখার মানে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ায় হু হু করে বিক্রী হয়ে গেছে হরফের কপিগুলি। অজানা লেখক আড়াল থেকে খামখেয়ালী খিস্তি করছে জানলে গুণীমহল বিচলিত হত না—ওই মহলে সাড়া না জাগায় খবরটাও ছড়িয়ে পড়ত না দশজনের মধ্যে।

এ খবরও সকলেই জানে যে কালাচাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে কি হবে না তাই নিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল হরফের আপিসে।

মহেশ আর জহর ছিল গোপনতার পক্ষে, মানব ছিল বিরোধী। রাগরাগি তর্কবিতর্কের পর মানব প্রায় স্কুলমাষ্টারের মত গম্ভীর হয়ে ছাত্রদের পড়া শেখানোর মত তাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল মূলনীতিটা—এই সোজা কথাটা কেন বুঝতে চাইছেন না আপনারা? লেখককে বাদ দিয়ে লেখার কোন মানে হয় না। এ জগতে আজ পর্যন্ত কোন লেখক নিজেকে আড়ালে লুকিয়ে রেখে খ্যাতিলাভ করতে পারেনি। সেটা অসম্ভব। রক্তমাংসের জানা চেনা মানুষকেই মানুষ খাতির করে, খ্যাতি দেয়। দশজনের জন্য লেখা। জানতে চাইবে কে এই মহাজন—কেমন ধারা এ মানুষটা, যে এতকাল পরে আমার মনের কথা লিখল?

ছদ্মনামে লিখে থাকলেও নিজের নাম ধাম বংশ পরিচয় এবং নিজের রীতিনীতি রুচি প্রকৃতি স্বচ্ছলতা দারিদ্রতা সব কিছু নিয়ে অন্তত সাহিত্যের জগতে সকলের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে লেখককে—তবেই সকলে দাম দেবে তার লেখার।

কালাচাঁদ কি একজন বড় লেখকের ছদ্মনাম? এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হতে না হতে প্রচারিত হয়ে গেল যে কালচাঁদ লেখকের আসল নাম—অন্যায় অত্যাচারের দানবীয় প্রতীককে আঘাত হেনে লেখা হলেও লেখক

আত্মগোপন করে লুকিয়ে আঘাত হানেন নি। নিজের নামেই তিনি লিখেছেন লেখাটা।

একদিন অল্পবয়সী একটি প্রাণোজ্জ্বল তরুণ একেবারে ধনদাসের দপ্তরে গিয়ে হাজির হয়ে চাপা আগ্রহ আর উত্তেজনায় কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি এ প্রেসের মালিক? আপনারই প্রেসের কম্পোজিটর কালাচাঁদবাবু অদ্ভুতরকম নতুন ধরনের গল্প লিখছেন হরফে?

ধনদাস চমকায় না, ভড়কায় না, খাতছাড়া হয়ে যায় না। অদ্ভুত উদ্ভট এবং বীভৎস ঘটনার সঙ্গে তার প্রায় নিত্যকার পরিচয়।

সে ধীরভাবে বলে, বসুন না, বসে বলুন না কি চাইছেন!

ছেলেটি সংযত হয়ে বসে, ধীরে ধীরে বলে, আমার নাম অমূল্য বসাক, আমিও একজন নতুন লেখক—

ধনদাস বলে, তাই নাকি! রস-সাহিত্যে লেখেন না কেন?

অমূল্য একটু বিব্রত হয়ে বলে, রস-সাহিত্য? রস-সাহিত্যের নাম তো শুনিনি!

ধনদাস হেসে বলে, নামও শোনেন নি রস-সাহিত্যের? রস-সাহিত্য বলে একটা মাসিক আছে না জেনেই লেখক হয়েছেন?

অমূল্যও হেসে বলে, বাংলা মাসিকের কথা আর বলবেন না আনাচ-কানাচ ঝোপঝাড় থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় মাসিক বেরোয়। কে অত হিসাব রাখে বলুন?

ধনদাস সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা। কতকাল প্রেস চালাচ্ছি—আমার কি আর জানতে বাকী আছে! আর কিছু করার নেই—চালাও একটা মাসিক! যাক্ গে—কালাচাঁদের কথা কি বলছিলেন?

: ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। একজন কম্পোজিটর এরকম চমৎকার গল্প লেখেন—ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ধনদাস কালাচাঁদকে ডেকে পাঠায়।

সে এলে হাই তুলে বলে, এই ভদ্দরলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন কালাচাঁদ! ইনিও তোমার মতই নতুন লেখক। তবে কিনা তুমি বিশ বছর ধরে রস-সাহিত্যের পাতা কম্পোজ করছ— উনি কাগজটার নামও শোনেন নি!

অমূল্য চেয়ার ছেড়ে উঠে কালাচাঁদের হাত চেপে ধরে বলে, আপনিই লিখেছেন হরফের গল্প দু'টো? আপনাকে একদিন আমাদের সংঘে যেতে হবে—আমরা আপনাকে মালা দেব আর আপনার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।

নিজের চোখ আর কাণকে ধনদাস কোনদিন অবিশ্বাস করে নি। আজ সন্দেহ জাগে—চোখ কান তার ঠিক আছে তো!

কালাচাঁদদের তাড়াতে নোটিশ লাগে না—সোজা বলে দেওয়া যে কাল থেকে আর খাটতে এসো না!

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের কাজ মন্থর হয়ে আসার সঙ্গে একটা গুঞ্জনধ্বনি ওঠে—কিছুক্ষণের মধ্যে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে সেটা পরিণত হয় কলরবে। হৈ চৈ চেঁচামেচি নয়—স্বাভাবিক গলাতেই অনেকের একসঙ্গে কথা বলার আওয়াজ।

সবাই হাত গুটিয়ে নিজের যায়গায় বসে আছে।

উমাকান্ত উঠে গিয়ে কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করে, কারণটা কি বললেন?

কালাচাঁদ বলে, কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন বাবু, কি দোষ করলাম? জবাব দিলেন, তুমি বড় পাজী লোক, তোমায় রাখব না।

উমাকান্ত ভেবে-চিন্তে ধনদাসের কামরায় গিয়ে বলে, একটা কথা বলব ভাবছিলাম—কিন্তু বললেই তো আপনি চটে যাবেন।

কালাচাঁদকে বরখাস্তের হুকুম দেবার পরেই সমস্ত প্রেস মুখরিত হয়ে ওঠায় ধনদাস প্রমাদ গনছিল।

ধনদাস মিষ্টি সুরে বলে, না না, চটব না। আপনার কথা শুনে কোনদিন চটেছি উমাবাবু? আমি জানি আপনি আমার পক্ষে টেনে কথা বলবেন, আমার ভুলচুক দেখিয়ে দেবেন।

উমাকান্ত বলে, কালাচাঁদকে এরকম হঠাৎ তাড়ানো উচিত হবে না। মহেশবাবুকে ছাড়িয়ে দিয়ে আপনার বড় বদনাম হয়েছে।

ধনদাস কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে উমাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি কি কালাচাঁদকে তাড়াতে চাই? সবাইকে তাড়ালে কাজ চালাবো কাদের নিয়ে! তবে কিনা, আমার এখানে কাজ করবে, লেখা ছাপাবে হরফে! কেন, আমার একটা কাগজ বেরোয় না? সে কাগজে লিখতে দোষ আছে কিছু?

উমাকান্ত কথা বলে না। একটা সস্তা চুরুট ধরিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে ধোঁয়া টেনে ধনদাস বলে, কে এটা সহ্য করবে বলুন? আমার কাছে খেটে পয়সা লুটবে, লিখবে শত্রুর কাগজে!

: শত্রুর কাগজ?

: না তো কি? মহেশবাবু এতদিন আমার কাগজের সম্পাদক ছিলেন, ছেড়ে গিয়ে নতুন কাগজ বার করলেন। তার মানে কি আমার কাগজের সঙ্গে শত্রুতা করতে নামা নয়?

বলতে বলতে বিষম কাসি আসে ধনদাসের। চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে কাসির ধমক সামলায়।

: যাক গে, যাক গে। কালাচাঁদকে রইয়ে সইয়ে তাড়াতে বলছেন? তাই হোক। আরও দু'একমাস কাজ করুক। হরফের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না কথা দিলে যেমন কাজ করছে তেমনি করে যাবে।

উমাকান্তের ওকালতির ফলে কালাচাঁদের কাজটা টিঁকে যায়। খবরটা শুনে কিন্তু তার মুখে কোনরকম ভাবপরিবর্তন দেখা যায় না।

সম্প্রতি যে একটা অদ্ভুত কাঠিন্যের ছাপ সর্বদাই তার মুখে দেখা যাচ্ছিল সেটা তেমনি বজায় থাকে।

সে শুধু বলে, তাড়ালে তাড়াতেন! প্রাণপাত করে কাজ শিখেছি, খেটে খাই—মোদের কি কাজের অভাব ঘটে মানুবাবু?

ধনদাস ঘুনাক্ষরেও প্রকাশ করে নি যে কালাচাঁদের লেখার তাৎপর্য সে টের পেয়েছে। সে জানে তাকে ব্যঙ্গ করে আঘাত দিয়ে গল্প লিখেছে বলে একটু বিচলিত হওয়াও বোকামি হবে, রাগরাগি করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

শত্রুর কাগজে লেখার জন্য তেড়েমেড়ে যাকে দূর করার হুকুম দিয়েছিল কয়েকদিন পরে তারই সঙ্গে ধনদাসকে সদয়ভাবে উদারভাবে কথা বলতে দেখে উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে যায়।

পুরো প্রায় পাঁচমিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধনদাস কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলে। কিছুই যেন তার জানা ছিল না এমনিভাবে তার বৌয়ের রোগ ও মৃত্যুর খবর জিজ্ঞাসা করে, সহানুভূতি জানায়—ছেলেমেয়ে কটি, কে এখন তার সংসার চালাচ্ছে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

ভাবতে ভাবতে সুহৃদের এ রহস্যের সমাধান হঠাৎ পেয়ে যায় উমাকান্ত—রস-সাহিত্যের শেষ ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতে শেষ পাতার নীচে মোটা একটা সরাসরি টানা লাইনের তলে সম্পাদক হিসাবে ছাপা তার নামের পরেই মুদ্রাকর হিসাবে কালাচাঁদের নামটা দেখতে পেয়ে।

তাই বটে। সম্পাদক মহেশের নামের সঙ্গে মুদ্রাকর কালাচাঁদের নামটা ছাপা হয়ে আসছিল কাগজটার প্রথম সংখ্যা থেকে। সুহৃদের বদলে এবার কালাচাঁদের নাম ছাপা হয়েছে। মুদ্রাকর বলে নাম ছাপা হওয়া কতবড় সম্মান—সামান্য একজন কম্পোজিটার, রস-সাহিত্যের মুদ্রাকর!

কালাচাঁদের পক্ষ নিয়ে তার ওকালতির যুক্তি সত্যই ভড়কে দিয়েছে ধনদাসকে।

মহেশকে তাড়িয়ে সৎ ও গুণীলোকের মহলে তার যে বদনাম রটেছে উমাকান্তের মুখ থেকে না শুনলে ধনদাস হয় তো কোনদিন খেয়ালও করত না, একটা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা চালালে যে এরকম সুনাম দুর্নামের হিসাব রাখতে হয় এটাও কস্মিনকালে তার মাথায় আসত না।

খেয়াল করে টনক নড়েছে। এতকালের সম্পাদককে তাড়িয়ে জুটেছে বদনাম। এতকালের মুদ্রাকরকেও তাড়িয়েছে জানাজানি হলে বদনাম আরও বেড়ে যাবে নিশ্চয়!

তার কাগজের মুদ্রাকর কালাচাঁদ যে তাকেই খোঁচা দিয়ে হরফে লেখা ছাপায় এটাও অনেকে কল্পনা করতে পারবে না—ভাববে ওগুলি বানানো গল্প। এদিক থেকেও কালাচাঁদকে রেখে লাভ আছে।

হিসাব নিকাশ তাই পাল্টে দিয়েছে ধনদাস। কালাচাঁদ তার ছাপাখানায় কাজ করে তার শত্রুর কাগজে লিখুক—সে আর তাকিয়েও দেখবে না। কালাচাঁদকে তাড়ানোর ইচ্ছা তার নেই—মুদ্রাকর হিসাবে ওর নামটাই সে রস-সাহিত্যের শেষ পাতায় ছাপিয়ে যেতে চায়!

বোনের তিনটি ছেলেমেয়ের দায় নিয়ে মুকুল নাকি পুতুলদির অভাবটা সামলে নেবে! বড় হয়ে কেমন হয়েছে অন্ততঃ একবার চোখে দেখে আসা উচিত। কিন্তু হরফের কাজের উপরে বড় একটা লেখা নিয়ে মশগুল হয়ে মানব উচিত কাজটা ক্রমাগতই পিছিয়ে দিতে থাকে।

কয়েকদিন পরে হরফের জন্য উমাকান্তের কাছে একটা লেখা আনতে গিয়ে মানব মুকুলকে দেখে আসে। লেখার জন্য লোক পাঠালেই চলত—মুকুলকে দেখার জন্য মানব নিজেই যায়।

উমাকান্ত একমনে কলম পিষছিল। পুতুলের গয়না বাঁধা রেখে তার সেই নতুন কেনা কলমটা!

পুতুলের সঙ্গে শেষ কলহের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কলমটা তার তুলে রাখার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু আরেকটা কলম না কিনলে সেটা তো আর সম্ভব নয়!

লিখতে লিখতে পুরানো হয়ে ক্ষয়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবার পর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তুলে রাখতে হবে। উপায় কি?

মানবকে সে বলে, তোমার লেখাটাতে একটু চোখ বুলিয়ে দেব—ভেতরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প কর গিয়ে।

মুকুলের মাকে বিধবার বেশে সে এই প্রথম দেখল কিন্তু পুতুলের মত দেখতে মুকুলের দিকেই সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

মুকুল বলে, এতদিনে বুঝি সময় হল দেখা করতে আসার?

মানব আরও অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করে যে পুতুলের মতই মুকুলেরও মুক্তার মত দাঁতগুলি ঝক ঝক করছে।

মুকুলের মা মানবকে আদর করে বসিয়ে বলে, বই লিখে খুব নাম করেছ শুনেছি। তোমার চেয়ে ঢের বেশী বই লিখে কতজনে তোমার মত নাম করতে পারে নি। প্রতি চিঠিতে তোমার পুতুলদি তোমার কথা লিখত।

মুকুলের মা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মানব বার বার মুকুলের দিকে তাকাচ্ছিল হঠাৎ নিজের মনে সে খাপছাড়া মন্তব্য করে বসে—কিন্তু যমজও তো নয়!

লিখে নাম করলেও তার চেহারা যে খুব খারাপ হয়ে গেছে—মার এই কথার মাঝখানে তার মন্তব্য শুনে মুকুল একটু হেসে বলে, কিসের যমজ নয়?

মানব বলে, অবিকল পুতুলদির মত দেখতে, কথা থেকে হাসিটা পর্যন্ত। পুতুলদির চেয়ে তুমি পাঁচ ছ' বছরের ছোট। ওই তফাতটাই শুধু ধরা যায়—বয়সে কাঁচা।

মুকুলের মা বলে, যমজ না হলে কি বোনে বোনে মিল থাকে না? মিলটাই তোমরা দেখছ—তফাতও অনেক আছে। কয়েকবার যাওয়া আসা কর, নজরে পড়বে। প্রথম দেখে উমাও বলেছিল, অবিকল বিয়ের সময়কার পুতুল। এখন আর বলে না।

সুধাকে উমাকান্ত শক্ত হতে বলেছিল, সুধা কি ভাবে শক্ত হয়েছে কি করেছে সে-ই জানে! ধনদাস আর উমাকান্তকে টানাটানি করে না।

সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ধনদাসকে অসন্তুষ্ট মনে হয় নি। লাল লাল শাড়ী পরে পরিবেশন করে তাকে খাইয়ে সভ্য জগতের ভদ্র বেশ ধরে নির্জন ঘরে তার সঙ্গে গল্প করতে এলে, সুধাকে সে গল্পচ্ছলেই সাংঘাতিক বিদ্রোহের উপদেশ দিয়ে এসেছিল—সেদিন ভাবতেও পারে নি ফলাফল কি হবে। একেবারেই কোন ফল হবে কিনা!

দু'চারদিন একটু গম্ভীর ও চিন্তিত মনে হয়েছিল ধনদাসকে।

কিন্তু রাগের ভাব প্রকাশ পাওয়ার বদলে একটু যেন শ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশ পেয়েছিল তার কথা ও ব্যবহারে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেও ফেলেছিল—আপনারা লেখকেরা আশ্চর্য মানুষ। এদিকে এমন উদাসীন ভাবুক মনে হয়, ঠিক যেন স্বপ্নরাজ্যে বাস করেন, অথচ আসল কথাটা চট করে ধরতে পারেন। আমরা হাজার মাথা ঘামিয়েও কূল কিনারা পাই না।

সুধার কি গতি হল জানবার জন্য মাঝে মাঝে উমাকান্তের

জোয়ালো কৌতূহল জাগে কিন্তু মুখ ফুটে তার সম্পর্কে ধনদাসকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পায় না।

এমনি চুপচাপ আছে কিন্তু সে যেচে সুধার কথা তুললে হয়তো একেবারে বিয়ের প্রস্তাব করে বসবে!

প্রায় দু'মাস কেটে গেছে কিন্তু আবার নিমন্ত্রণ পাওয়ার আশঙ্কা উমাকান্তের একেবারে ঘুচে যায় নি। ধনদাস যে কোন একটা ব্যবস্থা করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে নি এটাই তার অদ্ভুত মনে হয়।

তবে কি কোন জঘন্য উপায়ে বিপদ কাটিয়ে সমস্যার সমাধান করে ধনদাস নিশ্চিন্ত হয়েছে?

হঠাৎ একদিন কিন্তু আবার উমাকান্ত নিমন্ত্রণ পায়। একেবারে সুধার বিয়েতে ভোজ খাবার নিমন্ত্রণ!

ধনদাস বলে, ছেলেটি যে আমার খুব বেশী পছন্দ হয়েছে তা নয়— তবে কি-না জানাশোনার মধ্যে। দেখা যাক মেয়েটার অদৃষ্টে কি আছে!

উমাকান্ত পরম স্বস্তি বোধ করে। একটা কথা ভেবে সে খুসীও হয়। ধনদাস বলেছে ছেলেটি জানাশোনা—তা'হলে এ নিশ্চয় সুধার চেনা সেই যোয়ান ছেলেটি!

ওইদিন আরেকটা বিয়ের ভোজেও তার নিমন্ত্রণ ছিল—নিজে না লিখলেও লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহিত্যরসিক একজন বড় সরকারী চাকুরের বাড়িতে।

সুধার বিয়ের ভোজ খেতে যাওয়াই উমাকান্ত ঠিক করে—অন্য নিমন্ত্রণে শুধু হাজিরা দিতে যাবে।

ছেলেটিকে দেখবার আগ্রহে একটু সকাল সকাল ধনদাসের বাড়ী গিয়ে উমাকান্ত বিয়ের আসরে বসে আছে, একটি ছেলে এসে জানায় যে তাকে একবার অন্দরে যেতে হবে।

তাকে অন্দরে ডেকেছে? উমাকান্ত একটু আশ্চর্য হয়েই ভিতরে

যায়। সেদিন দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইয়ে যে ঘরে তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছিল ছেলেটি সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসায়। খানিক পরেই কনের সাজে সুধা এসে হাঁটু পেতে বসে, তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

উমাকান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, সুধা, পাত্র তোমার সেই যোয়ান মানুষটিই তো?

সুধা মৃদুস্বরে বলে, হ্যাঁ। আপনিই আমায় বাঁচিয়ে দিলেন, আপনার ঋণ জীবনে ভুলব না।

: আমার ঋণ? আমি তো কিছুই করি নি!

: আপনিই সব দিক রক্ষা করেছেন। আপনি যদি সেদিন আমায় না বোঝাতেন, শক্ত হবার বুদ্ধি না দিতেন—কে জানে আমার কি দশা হত! হয়তো স্যুইসাইড করা ছাড়া উপায় থাকত না।

আজও সেদিনের মত স্যুইসাইড কথাটা সে স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

উমাকান্ত প্রশ্ন করে, কি ভাবে শক্ত হয়েছিলে? কি করেছিলে?

সুধার কাছ থেকে কি মারাত্মক জবাব পাবে জানা থাকলে এমন অনায়াসে সহজভাবে প্রশ্নটা উচ্চারণ করতে উমাকান্ত ভরসা পেত না! সুধা খানিক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, নাঃ, আপনার কাছে লুকোব না, আপনাকে লজ্জা করব না। কথাটা আগেও ভেবেছিলাম কিন্তু সাহস পাই নি। কে জানে রাঙাদাদু কি কাণ্ড করবেন, আমাদের হয়ত মেরেই ফেলবেন।

ধনদাসের বিশ্রীরকম ফর্সা রঙের কথা উমাকান্তের মনে পড়ে যায়। সুধার রাঙাদাদু যে কে—জিজ্ঞাসা করা দরকার হয় না।

সুধা বলে, আপনার কথা শুনে মনটা শক্ত করলাম, ওই যোয়ানটাকে রাঙাদাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম—আমার অবস্থা বলবে, তাড়াতাড়ি আমাদের বিয়ে ঠিক করতে বলবে।

উমাকান্ত শুধু বলে, ও !

সুধা বলে, একেবারে উল্টো রকম বুঝে মিছে মিছি ভেবে মরছিলাম—রাঙাদাদু ক্ষেপে যাবে! রাঙাদাদু বেঁচে গেছে। আপনি না বললে কোনদিন মনটা শক্ত করতে পারতাম না।

অন্য বিয়ে বাড়ীতে মানবেরও নিমন্ত্রণ ছিল। ধনদাসের বাড়ী থেকে উমাকান্ত যখন সেখানে পৌছায়, মানব সবে ফেলে ছড়িয়ে খেয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ বসে মানব আর উমাকান্ত, একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার বাসার দিকে চলে। তার বাড়ীর কাছাকাছি মোড় থেকে মানব বাস ধরবে।

উমাকান্তের কাছে সুধার ব্যাপার শুনে মানব বলে, কতকাল ধরে গল্প উপন্যাসে কত ভাবেই যে এই জটিলতা হাজির করা হয়েছে! শুরু সেই পুরানে কিম্বা তারও আগে। মহাভারতের কুন্তীদেবীকেই ধরুন। দেবতা মানুষ হয়ে এলেন, উপায় নেই, কুমারী কুন্তীর কর্ণকে জন্ম দিতে হল। মোট কথাটা সব ক্ষেত্রে এক—মেয়েরা অসহায়, নিরুপায়। কাহিনী যেমন হোক, মূল সূত্রটা হল ওই। ক্ষমতাবান পুরুষ, নিরুপায় মেয়ে, অসামাজিক ভাবে তার মা হবার বিপদ বা সমস্যা।

উমাকান্ত বলে, সুধা কিন্তু মা হবে ওর স্বামীর সন্তানের।

মানব বলে, জানাই ছিল। ধনদাসের ক্ষমতা আছে কোন মেয়েকে মা করবার ?

তুমি বড় ভালগার মানব।

জগতের কত বৈজ্ঞানিককে ভালগার বললে খেয়াল করেছ—উমাদা' ? সুধার ব্যাপার থেকে আপনি যদি প্লট বানিয়ে গল্প উপন্যাস লেখেন—লোকে বলবে রাম রাম, উমাবাবু শেষে সেই পচা পুরোনো একঘেয়ে গল্প লিখলেন ?—উমাবাবুর হয়ে এসেছে! আমি লিখলে কিন্তু লোকে প্রশংসা করবে—বলবে, পুরানো পচা ব্যাপারটাকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে বটে !

: কি রকম ?

মানব একটা ঢেঁকুর তোলে। বলে, খাওয়াটা বেশী হয়ে গেল মনে হচ্ছে। ম্যালেরিয়ায় কাবু করে দিয়েছে শরীরটা, খেতে পারি না।

: একটা বড়ি খেয়ে যাও, ঠিক হয়ে যাবে।

বাড়ীর দরজায় পৌছে কড়া নাড়তে হয় না, মুকুল দরজা খুলে দেয়।

মুকুল আর মাকে রেখে পুতুলের দাদা অন্য সকলকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেছে। উমাকান্তের বাড়ী ফেরার পথে সে যে চোখ পেতে রেখেছিল বিবাহিতা সতী সাধ্বী স্ত্রীর মত—এটা উমাকান্তের সাথী মানবকে জানতে দিতে তার যেন আপত্তি নেই, লজ্জা নেই !

উমাকান্ত বলে, আমরা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে এ ঘরে বসে কথাবার্তা চালাব—ওসব কথা তোমার শোনা উচিত হবে না।

ফোঁস করে ওঠার জন্যই মুখ তুলেছিল মুকুল কিন্তু মানবের চোখের ইসারা নজরে পড়ায় সে ফুলে ওঠার বদলে মুখ বাঁকিয়ে বলে, আমার কি গরজ পড়েছে তোমাদের গুরুতর কথা শোনার ! ভোজ খেয়ে রাত দুপুরে বাড়ী ফিরলেন, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে না ?

গট্ গট্ করে ও ঘরে চলে গিয়ে এঁটো বাসনপত্রে ইচ্ছা করে হোঁচট খেয়ে ঝন্ ঝন্ আওয়াজ তুলে যেন একেবারে ভেঙে ফেলতে চায়, এমনি জোরের সঙ্গে ওদিকের দরজা জানালা বন্ধ করে সে আলো নিভিয়ে দেয়।

মানব উমাকান্তের কানে কানে বলে, ঠিক পুতুলদির মত না ?

: অবিকল !

: শুয়ে পড়ে নি। পুতুলদির মত দরজার আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। একটু লজ্জা দেব উমাদা' ?

: থাক না ! যা বলছিলে বলো।

কিন্তু মানব কি তা পারে ? সে গলা চড়িয়ে বলে, অয়ি দরজার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়ানো মুকুলদি—এক গেলাস জল দেবে ?

কোন সাড়াশব্দ আসে না। মানব নিজে ওঘরে গিয়ে আলো জ্বালায়। মুকুল ঘরে নেই। দরজার আড়ালেও নেই, মশারির তলে বিছানাতেও নেই।

মুকুলের মা গোটাকয়েক আলু বেগুন কাঁচকলা সিদ্ধ, আর ছটাকখানেক দুধ দিয়ে সবে একথালা পচাটে আতপ চালের ভাত গিলতে বসেছিল। মুখের কাছে নেওয়া গ্রাসটা নামিয়ে সে যেন একটু রাগত ভাবেই বলে, মুকুল কল ঘরে গেছে। ওর পেট ভাল না, সারাদিন কিছু খায় নি। তুমি বাবা এবার আমাদের পাটনা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর। এখানকার জলহাওয়া মেয়েটার সইছে না।

ভিজে কাপড়ে মুকুল এসে দাঁড়ায়, রেগে বলে, এত বাজে কথা কেন বল মা? বিশ্রী স্বভাব তোমার আবোল তাবোল কথা বলার। পাটনাতেই বরং রোজ মাথা ধরত, এখানে এসে মাথাটাথা ধরে না, বেশ ভালই তো আছি!

উমাকান্তের লেখার ঘরে ফিরে গিয়ে মানব বলে, নাঃ, সব ব্যাপার ঠিক পুতুলদির মত নয়। আমারই ভুল হয়েছিল।

উমাকান্ত বলে, পুতুলদির মত নয় মানে? তোমার পুতুলদিও ঠিক এরকম করত। আমায় খোঁচা দিয়ে কেউ কিছু বললে সইতে পারত না—বাপ মা আত্মীয় বন্ধু যে-ই বলুক। নিজে আমায় নিন্দা করত কিন্তু অন্যে আমার নামে কিছু বললে রাগে ফেটে পড়ত।

একটু রোগা ছিল মুকুল—ক'মাসে শরীরটা ফিরেছে। পুতুলের সঙ্গে চেহারার ওই তফাতটুকুই বোধ হয় ছিল, সেটাও ঘুচে গেছে।

বিদায় নেবার সময় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মানব বলে, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্টের মত, আরেক নতুন অবতার হতে পারবেন না—হয়ে দরকারও নেই। নিজেকে রক্তমাংসের লড়ায়ে মানুষ বলে ভাবুন না? দেখছেন তো

পুতুলদিকে খুন করেও ব্যাটারা আপনাকে উদাসী সন্ন্যাসী করতে পারে না। মুকুলদি এসে পুতুলদির স্থান পূর্ণ করে।

: হে মহামানব, রাতদুপুরে উপদেশ ঝেড়ো না।

১৩

বছরখানেক অপর্ণার কোন পাত্তা ছিল না। সুদূর দিল্লীতে একটা চাকরি বাগিয়ে চন্দ্রাদের স্কুলের মাষ্টারি ছেড়ে দিয়ে আচমকা সে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

আপনজনের কাছেও চিঠিপত্র সে লিখেছে খুব কম। ছোট বড় কয়েকটা কাগজে তার লেখা কিন্তু বেরিয়েছে অনেক। পড়েই বোঝা যায় লেখার ধরণ সে একেবারে পাল্টে দিয়েছে।

বেশীর ভাগ লেখাই বাংলার মেয়েদের সামাজিক অবস্থা আর ঘর-সংসারের ব্যাপার নিয়ে—যৌন-বিষয়ে যে কটা প্রবন্ধ লিখেছে তার মধ্যে সহজ বৈজ্ঞানিক সরলতার বদলে, রম্যতা ও সরসতা আনার দিকে ঝোঁক পড়েছে বেশী।

মহেশের সম্পাদনায় নূতন কাগজ বার হয়েছে খবর শুনেই মহেশকে একটি পত্রাঘাত করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে একটি লেখা পাঠিয়ে দেয়। লেখাটির নাম 'সব মেয়ে পরাধীন'।

মানব লেখাটা চেপে দেয়।

অপর্ণাকে মিষ্টি করে একখানা চিঠি লেখে। সোজাসুজি মিথ্যা কথা লিখে দেয় যে তার লেখাটি দু'একজন সাহিত্যিক বন্ধুকে পড়তে দেওয়ার ফলে এক উদ্ভট অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, লেখাটি নিয়ে লেখক লেখিকা মহলে প্রচণ্ড একটা তর্কবিতর্কের সাড়া পড়ে গিয়েছে—চারিদিকে বিষম উত্তেজনা!

অপর্ণার লেখাটা পড়েই মানব তার মানসিক অবস্থা টের পেয়েছিল।

এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা লেখায় দোষ হয় না। বানানো গল্প শুনিয়ে অসুস্থ শিশুর মন ভোলানোর মত এ ক্ষেত্রেও লেখাটা ফেরত দেবার আঘাত হানার বদলে, বানানো কথা লিখে অপর্ণাকে খুসী করা অত্যন্ত উচিত কাজ। মহেশের কাগজ থেকে লেখা ফেরত যাবার অপমানটুকুই হয় তো চূড়ান্ত বিকারের মারাত্মক অবস্থায় ঠেলে দেবে অপর্ণাকে। কিছুই বলা যায় না। মিথ্যা হলেও মিষ্টি কথায় মন ভুলিয়ে কয়েক মাস কাটিয়ে দেওয়া যাবে। সেই অবসরে খোঁজখবর নিয়ে জানাও হয় তো সম্ভব হবে যে অপর্ণার কি হয়েছে।

হরফের কাজে দিন কেটে যায়। সন্ধ্যার আগে সময় হয় না। অপর্ণার স্বামী প্রিয়নাথের বাড়ীতে পৌছতে রাত আটটা বেজে যায়।

বড় চাকুরে নয়, কিন্তু উপরি আয় প্রচুর। তাকে কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজে কিছু পাবার জন্য এত লোক তার বাড়ীতে যাতায়াত করে যে বড় বড় পদস্থ মানুষদের মত সে ছাপানো স্লিপের ব্যবস্থা চালু করেছে—নাম লিখে চাকরকে দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়।

মানবের স্লিপ পেয়েই প্রিয়নাথ স্বয়ং নেমে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ভেতরে নিয়ে যায়।

অপর্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল কিন্তু তার স্বামীর বাড়ীতে মানবের এই প্রথম পদার্পণ—ভুল করে যে স্বামীর সঙ্গে কয়েক বছরের জন্য বিচ্ছেদ ঘটেছিল অপর্ণার—এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভুল সংশোধন করে বছর দুই যে স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে হঠাৎ অপর্ণা দিল্লীতে উধাও হয়ে গেছে।

সেকেলে দোতলা বাড়ী। মানুষ যেন গিজ গিজ করছে বাড়ীতে। দোতালায় উঠতে উঠতেই মানব টের পায় যে বাড়ীতে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করা মানুষের ভিড়। প্রিয়নাথের ঘরে খাট আছে, সিন্দুক

আছে, ভারি আলমারী থেকে শ্বেতপাথরের একটা ছোটখাট ডাইনিং টেবিলও আছে।

ওই টেবিলে সাজানো হচ্ছিল তার রাত্রির আহার—সাজাচ্ছিল একটি বিশ বাইশ বছরের বিধবা মেয়ে।

হৃষ্টপুষ্ট রম্যকান্তি প্রিয়নাথ বলে, খিদের সময় খেতে না পেলে শরীর বিগড়ে যায় ভাই। বড় ব্যাপারে এসেছেন নিশ্চয়, নইলে কি আর এই বাজে মুখ্যু লোকের ঘরে আপনার মত নামকরা লেখকের পায়ের ধূলো পড়ে! একসঙ্গে বসে যাই আসুন। খেতে খেতে কথাবার্তা চালিয়ে যাব।

মানব একটু দ্বিধার সঙ্গে বলে, হঠাৎ খাওয়ার সময় এলাম, খেলে টান পড়বে তো—আবার মেয়েদের রাঁধতে হবে। বাড়ীতে সব তৈরী আছে, ফিরে গিয়েই খাব'খন।

প্রিয়নাথ সশব্দে হেসে ওঠে!

: খাবারে টান পড়বে? চার গণ্ডা বড় মানুষ আর সাড়ে চার গণ্ডা ছেলেপুলের খ্যাঁট দুবেলা এ বাড়ীতে তৈরী হয়। আপনি একটা মানুষ খেলেই টান পড়বে? পাশে রুটি-মাংসের দোকান নেই?

মানব হেসে বলে, তবে বসি। বাড়ীতে কখনো আসিনি বটে কিন্তু আপনি তো আর অজানা অচেনা মানুষ নন!

: আমার খাওয়া দেখে কিছু মনে করবেন না কিন্তু। আপনারা খাওয়ার সুখ ছেড়ে লেখার সুখে মজেছেন। দুটো ভাল সন্দেশ খেলে আপনাদের চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

এক টেবিলে সামনা সামনি বসে গোড়ার দিকে প্রিয়নাথের তুলনায় নিজের খাওয়া মিলিয়ে সত্যই মানব লজ্জা বোধ করে। লজ্জা তার কেটে যায় প্রিয়নাথের খাওয়ার বহর দেখে। প্রচুর তেল-ঘি দিয়ে রাঁধা

কতরকমের ব্যঞ্জন, কত রকমের আমিষ আর কত রকমের মিষ্টান্নই যে, সে প্রায় রসে গিয়ে জমে গিয়ে পেটে বোঝাই দেয়!

প্রথম দিকে থালায় যা পৌঁচেছিল তাই ভেঙে খেয়েই মানবের পেট ভরে গিয়েছিল। আর কিছু খাওয়া মানেই আত্মনির্যাতন।

তার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই নতুন নতুন খাদ্য তার পাতে দেওয়া হয়—সে খুঁটে খুঁটে শুধু চেখে দ্যাখে। প্রিয়নাথ গো-গ্রাসে চালিয়ে যায় তার রাত্রির আহার।

হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়ি-মোটা প্রিয়নাথকে দেখে, তার খাওয়ার রকম দেখে একটা চাকরি বাগিয়েই অপর্ণার দিল্লী উধাও হওয়া এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের নামে আবোল তাবোল রম্য-রচনা লিখে যাওয়ার ব্যাপার কিছুই আর বুঝতে বাকী ছিল না মানবের।

আঁচিয়েই সে বলে, এবার আমি যাই ?

প্রিয়নাথ ব্যস্ত হয়ে বলে, পাঁচ মিনিট বসুন না—আসল কথা কি বলতে এসেছিলেন বলে যান!

মানব বলে, আসল কথা গুরুতর কিছু নয়। অনেক দিন অপর্ণাদির খোঁজ খবর পাই না, তাই জানতে এসেছিলাম ব্যাপার কি। অপর্ণাদি হঠাৎ দিল্লী পালিয়ে গেলেন কেন ?

প্রিয়নাথও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমার ভয়ে।

: আপনাদের না সমস্ত ভুল বোঝার মীমাংসা হয়েছিল ? সমস্ত অমিল দূর হয়ে নাকি মিল হয়েছিল ?

: কচুপোড়া হয়েছিল! অত বেশী রকম মিল না হলেই বরং ভাল ছিল। নিজের ভাবেই গদগদ, এমন ভাব করলেন যেন উনিই মস্ত ভুল করেছিলেন, সব ঝনুঝাটের দায় ওনার। তাই নিয়ে কাগজে আর্টিকেল পর্যন্ত লিখে ফেললেন। আমি ভাবলাম তাই বুঝি বা হবে—সাদাসিধে মুখ্যু মানুষ, আমি কি অত মনস্তত্ত্ব বুঝি ? ওনারি মত অনুসারে চলতে

চেষ্টা করছিলাম—ও বাবা, তার কি রেজাল্ট! তলে তলে চেষ্টা করে দিল্লীর চাকরিটা বাগিয়েই তল্পিতল্পা গুছিয়ে বিদায় নিলেন, যাবার সময় বলে গেলেন—তুমি একটা পশু, তোমার সঙ্গে ভদ্র মেয়ের ঘর করা পোষায় না।

প্রিয়নাথ হো-হো করে হাসে।

: হাকিমের কেমন বিচার দেখুন। নিজে রায় দিলেন, আমি বেচারা প্রাণপণে চেষ্টা করলাম সেই রায় মানতে—আর যাতে না ভুল হয়, আর যাতে না অমিল ঘটে। হাকিমের হুকুম মানতে গিয়ে হাকিমের কাছেই আমি হলাম পশু!

মুখখানা গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে প্রিয়নাথ বলে, আরে ভাই, কত পুরুষ ধরে শিক্ষা পেয়ে এসেছি সংযম সেরা ধর্ম—রক্তে মিশে গেছে। উনি একেবারে কাগজে অর্টিকল লিখে ঘোষণা করলেন, ওসব ভুল ধারণা। আমিও ভাবলাম, তাই বুঝি হবে, উনি বুঝি আমার কাছে একটু অসংযম চান। সেটাই হয়ে গেল বোকামি—মেয়েদের কথা কি ব্যাটাছেলের কাণে তুলতে আছে? মেয়েলোকেরা মুখে একরকম কাজে একরকম।

প্রিয়নাথের আহারের দৃশ্য স্মরণ করে মানব মনে মনে ভাবে, এ মানুষটাও সংযমের গুণ গায়!

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েকদিন মনটা বিষণ্ণ হয়ে থাকে মানবের, মেজাজটাও বিগড়ে যায়।

বেণা বনে মুক্তা ছড়ানোর একি উদ্ভট সাধ অপর্ণাদিদির?

যে ক্ষেত্রে আপোষ ছাড়া গতি নেই, ছোট বড় অনেক অমিল যে ক্ষেত্রে একেবারে স্বকীয়তায় নিহিত এবং অপরিহার্য—সে ক্ষেত্রে পরম প্রেমের চরম মিল ঘটানোর অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করার কোন মানে হয়?

আগেই তার জানা উচিত ছিল এটা। পাঠশালার পড়ুয়ার মতই জীবন যেন নিত্য নতুন পাঠ শেখাচ্ছে তাকে।

যতই বিকার আর বীভৎস বিভ্রান্তি থাক—চিরদিনের মত আজও রক্তমাংসের দেহসর্বস্ব মানবতা শুদ্ধ ও পবিত্র। এই বিশ্বাস এই চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হবার জন্যই সে ঘরে ফিরে স্নান করে দেহটাকে শুদ্ধ ও শীতল করে নেয়, কিন্তু এক লাইন লিখতে পারে না।

মাসখানেক আগে শুরু করা একটা গল্প শেষ করার জোরালো সঙ্কল্প নিয়ে ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কলম হাতে নিয়ে বসে সে শুধু চিন্তা করে যায় চেনা মানুষদের কথা—তার গল্পে ফাঁদা 'চাষীর বৌটি' যেন কিছুতেই রক্তমাংসের জীব হয়ে কল্পনার রূপ নিতে চায় না!

কেন এত অনিয়ম? কোন্ নিয়মে তার জানা চেনা জগতে এত অনিয়ম ঘটে চলেছে, কি ভাবে কোন্‌পথে তার প্রতিকার সম্ভব?

নিজের ঘরের রান্না বেলাবেলি শেষ করে, মানব ঘরে ফিরলে, আত্তি তার রান্না শুরু করে।

তাকে চিন্তামগ্ন দেখে আত্তি মুখ বুজে থাকে। ভাত নামিয়ে তরকারি দেওয়া মাছের ঝোল রেঁধে সে প্রথম মুখ খোলে—ডিম সেদ্ধ করব একটা? না মামলেট ভাজব?

: নাঃ, খিদে নেই।

আত্তি উঠে এসে বলে, কি হয়েছে শুনি? ক'দিন ধরে কাগজে একটা আঁচড় কাটছ না, কলমটি হাতে ধরে চুপচাপ শুধু ভেবেই চলেছ?

মানব একটু হেসে বলে যোয়ান বয়েস, একলাটি আছি, কাজে মন বসছে না তো কি করব!

আত্তি হাসে না।—কই একলাটি আছ? দোকলাই তো আছ দেখতে পাচ্ছি। না, আমি মানুষ নই?

: একটা যোয়ান মানুষের সঙ্গে এভাবে কথা বলিস্, একদিন বিপদে পড়ে যাবি আত্তি!

: আত্তি অত বিপদকে ডরায় না!

যেমন আচম্কা নতুন চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে গিয়েছিল তেমনি আচম্কাই সে যে আবার চাকরি খুইয়ে দেশে ফিরে আসবে কেউ ভাবতে পারে নি।

একথাও কেউ ভাবতে পারে নি যে প্রিয়নাথের বাড়ীতে না উঠে সে মহেশের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেবে।

এই সহরেই তার ভাই-এর বাসা আছে। ভাই-এর বৌয়ের খুব অসুখ—আজ মরে কাল মরে অবস্থা।

দিল্লী থেকে এসে সরাসরি ওখানে উঠলে লোকে অনায়াসে মনে করতে পারত যে গণ্ডগোল কিছুই হয় নি—ভাই-এর বিপদের সময় বোন সরাসরি ভাই-এর কাছে গেছে।

কোন খবর না দিয়ে মালপত্র নিয়ে একেবারে মহেশের বাড়ীতে এসে ডেরা বাঁধা!

বলে কয়েই অবশ্য উঠেছে। কিন্তু বলা কওয়ার কি ধরণ!

মালপত্র সমেত ট্যাক্সি বাড়ীর সামনে থামিয়ে নিজে নেমে ভেতরে এসে বলে, কয়েকদিন থাকব ভেবে এলাম। আপনাদের অবস্থাও সুবিধের নয় জানি—দু'একদিনের বেশী বিনা খরচায় রাখতে চাইলে কিন্তু কেটে পড়ব। ছাঁটাই হয়েই এসেছি কিন্তু হাতে কিছু জমেছে—খরচপত্র নিতে হবে।

মন্দ্রা রেগে বলে, গেট আউট—এক্ষুনি আপনি গেট আউট অপর্ণাদি। আপনি জানেন না যদ্দিন ইচ্ছা এ বাড়ীতে থাকতে পারেন, আমরা খুসীই হব? বাড়ীতে ঢুকেই এভাবে কথা কইছেন!

কি ভাগ্য যে মানব সে সময় হাজির ছিল! মহেশের কোমরে চোট লাগার ব্যাথাটা বাতের বেদনায় পরিণত হয়েছে, মাঝে মাঝে দু'একদিন সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না এবং হরফের কাজের জন্য মানবকে তার বাড়ীতে এসে অনেকক্ষণ কাটাতে হয়।

মানব না থাকলে মন্দ্রাই হয় তো অপর্ণাকে অপমান করে রাগিয়ে হোটেলে চালান করে দিত।

মানব প্রায় ধমকের সুরে বলে, সব ব্যাপারে ছেলেমানুষের ছ্যাবলামি করা উচিত নয় মন্দ্রা। উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন! সে-সব দিনকাল কি আর আছে? এরকম সেকেলে ছেলেমানুষী করার জন্যই আজকাল আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ ঘটছে দেখতে পাও না?

অপর্ণা যেন প্রাণ ফিরে পায়। খুসী হয়ে বলে, শুনুন তো মেয়ের কথা! আমি তিন চার মাস থাকব বলে এসেছি, মহেশবাবুর এত কালের চাকরিটা গেছে জানি, খরচ নেবেন কিনা স্পষ্টাস্পষ্টি কথা না কয়ে আমি উঠতে পারি ওনার বাড়ীতে? খরচ নেবার কথা বলে আমি যেন ওদের অপমান করেছি!

মন্দ্রা কেঁদে ফেলতেই অপর্ণা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে,—কাঁদিস্ নে। তিন মাস কেন, হয়তো ছমাস এক বছরও থেকে যেতে পারি তোদের বাড়ীতে। সারাজীবনটাও থেকে যেতে পারি।

পথের বেশ ছেড়ে একেবারে নেমে এসে মলয়ার নিরামিষ সস্তা ঘিয়ে ভাজা গরম গরম লুচি বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে খেতে অপর্ণা নিজে থেকেই তার ব্যাপার বলে, পারমানেণ্ট পোষ্ট, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! একবার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলে কাজ থেকে তাড়ানো কঠিন ব্যাপার। বড় বড় কয়েকজনের কথার ভাবে বুঝলাম, আমার মত শিক্ষিতা নামকরা লেখিকা পাওয়াই যায় না—ঠিকমত কাজ করে গেলে হয় তো একদিন আমার হাজার টাকা মাইনে হবে, ডিপার্টমেণ্টটা আমিই চালাব। কয়েকটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে পট করে খেদিয়ে দিলে!

মানব বেগুন ভাজা বাতিল করে কয়েক চামচ ডাল দিয়ে মোটে দু'খানা লুচি খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে ছিল।

অপর্ণার বলার ভঙ্গিতে সে সশব্দে হেসে ওঠে।

কাজের অভাব ঠেকা দেবার জন্যই রস-সাহিত্য ছাপা। কেমন যেন এলোমেলো উল্টো পাল্টা ভাব এসেছে এমাসের রস-সাহিত্যের হরফ সাজিয়ে ছাপানোর ব্যাপারে। প্রেসের এখন সব চেয়ে খারাপ সময়—একটা ছাপার কাজ পেলে প্রেস যেন বর্তে যায়। রস-সাহিত্যের কাজটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কি যেন একটা ব্যাপার চলেছে তলায় তলায়।

সমস্ত হরফ সাজিয়েদের কেমন যেন চকম সকম।

উমাকান্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না, প্রেসের কাজ দেখা আর সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়ে চেয়ারে বসে তার অস্বস্তির সীমা থাকে না।

যথানিয়মে প্রথমে শুধু লাইন আর ফাঁক ঠিক রেখে সাজানো হরফের লম্বা লম্বা গেলি প্রুফ তৈরি হয়। ওই প্রুফ সংশোধন করা শেষ হলে তৈরি হয় পাতায় পাতায় ভাগ করা মেক আপ—নাম পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি যোগ হয়। মেক আপ প্রুফ সংশোধন শেষ হলে তবেই সাজানো সীসার হরফগুলি মেসিনে ওঠে।

কাগজের একপৃষ্ঠায় ছাপা আরম্ভ হতেই একটা শিট চলে যায় উমাকান্তের কাছে। সে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে যদি কোন মারাত্মক ভুল চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকে, যদি কোন যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিন বন্ধ করে সেটা সংশোধন করে ফেলা হবে।

শিটগুলির অন্য পৃষ্ঠা ছাপাবার বেলাতেও একই নিয়ম। মেসিনে চড়া রস-সাহিত্যের ছাপা পাতার নমুনা পরীক্ষা করে উমাকান্ত ছাখে যে সব ঠিকই আছে।

তবু তার মন খুঁত খুঁত করে। তবু তার সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

শুধু রস-সাহিত্যের ফর্মাগুলি মেশিনে ওঠা আর ছাপা হওয়ার ব্যাপারে কেমন যেন একটা অভিনবত্ব এসে গিয়েছে।

ফাঁকে ফাঁকে রস-সাহিত্য ছাপিয়ে নেবার নিয়মের গোলমালটাকে কেন্দ্র করেই যেন প্রেসের সমস্ত কাজের নিয়ম শৃঙ্খলায় একটা অদ্ভুতরকম এলোমেলো ভবে দেখা দিয়েছে।

উমাকান্ত উদ্বেগের সঙ্গে বলে, ব্যাপার কি কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ ধীর ভাবে বলে, গোলমাল তো কিছুই হচ্ছে না বাবু!

: শঙ্করবাবুর অঙ্কের বই-এর ফর্মাটা মেসিনে না তুলে মাসিকের ফর্মা ছাপছ কেন?

: শঙ্করবাবুর ফর্মাটা ছাপা যাবে না, অনেক ভুল রয়ে গেছে।

উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, সে কি! উনি নিজে এসে প্রুফ দেখে প্রিণ্ট অর্ডার দিয়ে গেলেন না?

কালাচাঁদ ডাকতেই প্রুফটা নিয়ে এসে ভুবন বলে, প্রিণ্ট অর্ডার তো দিয়ে গেলেন। কিন্তু এত ভুল নিয়ে ছাপলে উনিই আবার গোলমাল করবেন—প্রেসের বদনাম হবে। বলেন তো যেমন আছে ছেপে দিতে পারি।

উমাকান্ত একমুহূর্তের জন্য ভোলে না যে তাদের প্রতিটি কথা ধনদাস কাণ পেতে শুনছে। প্রেসের সুনামের জন্য ভুবন ও কালাচাঁদের দরদ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়—প্রেসের বদনাম হলে, কাজ না পেলে তাদেরই খেটে খাওয়ার পথ বন্ধ হবে!

তবু সমস্ত ব্যাপারটা তার অস্বাভাবিক মনে হয়।

ভুবন প্রুফের কয়েকটা ভুল দেখিয়ে দিলে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এই ভুলগুলি শঙ্করবাবুর চোখ এড়িয়ে গেল?

অথচ এটা যে তারই দেখা প্রুফ তাতেও কোন সন্দেহ নেই। প্রুফের মাথায় ইংরাজীতে "সযত্নে সংশোধন করে ছাপ" লিখে তলায় শঙ্কর নাম স্বাক্ষর করেছে।

উমাকান্ত অগত্যা বলে, তাইতো দেখছি। নাঃ, ওঁকে একবার না দেখিয়ে এটা ছাপা যায় না।

প্রুফটা আগাগোড়া পড়ে উমাকান্ত প্রায় হতভম্ব হয়ে যায়। শিক্ষক মানুষ, পণ্ডিত ব্যক্তি, এই নাকি তার নিজের লেখা সংশোধন করার নমুনা? এই সহজ সাধারণ ভুলগুলি তার নজর এড়িয়ে গেল?

স্কুলের ছুটির পর টিউসনি করতে যাবার পথে শঙ্কর প্রেসে আসে।

উমাকান্তের কথা শুনে এবং প্রুফে ভুলের নমুনা দেখে সেও খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলে, তা আর আশ্চর্য কি। দিনরাত যে খাটুনি চলছে, পাগল যে হয়ে যাই নি তাই ঢের!

আবার সযত্নে প্রুফটা সংশোধন করে শঙ্কর চলে যাবার পর সংশোধনগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন উমাকান্তের চমক ভাঙে। সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না।

একবার খেয়াল করার পর পরীক্ষা করে দেখে ব্যাপার বুঝতে আর দেরী হয় না। যে ভুলগুলির জন্য ফর্মাটা মেসিনে আঁটা যায় নি, তার প্রত্যেকটি শঙ্করের দেখা প্রুফে প্রেসের সৃষ্টি করা ভুল!

সোজা ব্যাপার।

সুবিধামত স্থানে আলগা হরফের ছাপ দিয়ে শুদ্ধ শব্দকে অশুদ্ধ করা হয়েছে,—'এখন' কে 'ত্রিখনা' করতে দরকার শুধু গোড়ায় আর শেষে ই-কার ও আকারের ছাপ লাগিয়ে দেওয়া। প্যারার শেষে ছোট লাইনের দাঁড়িটা একটা হরফে পরিণত করে একটি বাড়তি ও অনাবশ্যক শব্দের ছাপ দেওয়াও কঠিন নয়।

কিন্তু মানে কি এ ব্যাপারের? কি উদ্দেশ্য, মেসিনে আঁটা বন্ধ রাখার অজুহাত সৃষ্টি করতে, সংশোধিত প্রুফে ভুল সৃষ্টি করার? সকলে মিলে পরামর্শ করে না করলে তো এ কাজ সম্ভব নয়!

ওদিকে ঘটাং ঘটাং শব্দে চলেছে মুদ্রাযন্ত্র, এদিকে মানুষগুলি নিঃশব্দে সাজিয়ে বা সংশোধন করে চলেছে হরফ।

উমাকান্তের মনে হয় কি একটা রহস্য যেন তাকে ঘিরে আছে। সমস্ত কাজের হিসাব তার জানা, তবু তার মনে হয় তার অগোচরে অতিরিক্ত একটা কাজ চালিয়ে, বেশীরকম ব্যস্ত আর মনোযোগী হয়ে উঠেছে প্রেসের মানুষগুলি।

চারিদিকে একটু চোখ বুলিয়ে আসার উদ্দেশ্যে উমাকান্ত ওঠে, একে ওকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে, মেসিন ঘরে গিয়ে রস-সাহিত্যের একখানা ছাপা শিট তুলে নিয়ে চেয়ারে ফিরে আসে।

খেয়ালের বশে নয়, কিছু ভেবেও নয়। গতবার রস-সাহিত্যের দু'টি ফর্মা ছাপতে ছাপতে শেষের দিকে কালির গোলমালে ছাপা ভাল হয় নি।

ওই দোষটা ঘটছে কিনা দেখবার জন্যই সে ছাপা শিটটা হাতে তুলে নিয়েছিল, লেখার দিকে এক নজর তাকিয়েই নিঃশব্দে নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছে। শঙ্করের এই ভুল সৃষ্টি করার চেয়ে সাংঘাতিক আরেকটা ভৌতিক ব্যাপারের নমুনা দেখবার জন্য।

একনজর তাকিয়েই সে টের পেয়েছে যে এটা তার সংশোধিত এবং অনুমোদিত রস-সাহিত্যের ফর্মা নয়!

চেয়ারে ফিরে এসে সে আগাগোড়া ফর্মাটা পড়ে। নাম করা লেখকদের একটা উপন্যাসের অংশ, একটা ছোট গল্প এবং নাম করা কবিদের তিনটে কবিতা যাওয়ার কথা এই ফর্মায়।

একটা লেখাও নেই।

রস-সাহিত্যের নাম, মাস, বছর ও পৃষ্ঠা-সংখ্যাটাই শুধু বজায় আছে, অন্য লেখা ছাপা হয়েছে অজানা লেখকের! এবং যা ছাপা হয়েছে সেগুলি ভয়ঙ্কর।

উমাকান্ত ভাবে এবং আরেকবার ফর্মাটা পড়ে।

সে টের পায় যে সমস্ত প্রেসটা প্রায় শ্বাসরোধ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে আরেকবার মেসিন ঘরে যায়।

ঘটাং ঘটাং শব্দে মেসিন চলছে ঠিকই—কিন্তু কাগজ আর যোগান দেওয়া হচ্ছে না যন্ত্রটায়। ধনদাসের কানে আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে যে যন্ত্র ঠিকই চলছে।

ছাপা বন্ধ হয়েছে তার জন্য। তার সম্পাদিত রস-সাহিত্যের পাঠিয়ে দেওয়া ফর্মা সে নিয়ে গেছে, পড়ে দেখে এখন সে কি বলে কি করে!

উমাকান্ত দ্বিধা করে না, শান্ত কণ্ঠে উঠে বলে, মিছিমিছি চালাচ্ছ কেন মেসিনটা? ছাপিয়ে যাও না?

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে কাগজ দেওয়া শুরু হয়। ছাপা কাগজ বেরিয়ে এসে জমতে থাকে।

শুধু অন্যরকম পরিবর্তন নয়, কালাচাঁদের মধ্যে যে একটা শান্ত নির্ভয় মরিয়া ভাব এসেছে, তারও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আভি অনুযোগ দিয়ে বলে, বাবার ব্যাপারটা কি? লেখক করতে চেয়ে বাবাকে পাগল করে দিতে চাইছ নাকি মানুবাবু?

মানব বলে, ওর ভাব-সাব আমারও যেন কেমন কেমন লাগছে আভি। রাত্রিতে আমার এখানে এসে পড়ছে না, সকালে নিজের ল্যাম্প জেলে লিখছে না। কেমন একটা গুম গুম ভাব।

: বিড়ির দোকানের মণ্টার সাথে মোকে লটকে দেবার ফিকিরে ছিল। গাঁজা চরস খেয়ে ব্যাটার যক্ষ্মা কাশি হবে। সোজা বললাম, বেরিয়ে যাব। গালে চড় যা একটা কষিয়ে দিলে মানুবাবু—

চড়ের দাগ পড়েছে গালে। একটু ফুলেছে গালটা।

হাসিটা অদ্ভুত দেখায় আত্তির। বাপের এমন চড় খেয়েও সে যে হাসতে পারে সেটাও অদ্ভুত ব্যাপার বৈ-কি!

: যার তার সাথে লটকে দেবার কথা কিন্তু বলছে না আর।

মানব বলে, ভাবিস কেন, বাজে লোকের কাছে দিতে চাইলে আমিই তোকে বিয়ে করে ফেলব। কিছু রোজগার করছি, তোকে খাইয়ে পরিয়ে পুষতে পারব।

মাথা প্রায় মেঝের কাছে নত করে স্থির গলায় আত্তি আবার বলে, প্রাণ থেকে যদি চেয়েই থাক মোকে, দু'মাস এক বছর নিয়ে নাও। সাধ মিটিয়ে ছেড়ে দিও।

মানব বলে, তোর একটা গালে কালসিটে পড়েছে, তোর বাপের চেয়ে বড় চাপড়ে এ গালটায় কালসিটে ফুটিয়ে দিই?

: দাও। তুমিও তো বাবার মতই অবুঝ!

কুঞ্জর মার ভাইঝি পদ্মার বয়স চোদ্দ হলেও হতে পারে। কাজ সেরে ঘরে ফিরে কালাচাঁদ আত্তির সেঁকা রুটি খেয়ে মানবের ঘরে আধঘণ্টা পড়া চালিয়ে কুঞ্জর মার কুঁড়েয় যায়।

একখানা ঘর কুঞ্জর মার। দাওয়ায় একটু বসেই কালাচাঁদ প্রকাশ্য ভাবে ঘরে যায়। সারারাত ওই ঘরেই থাকে। কুঞ্জর মা রোয়াকে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ মশার কামড়ে ছটফট করেও অচেতন হয়ে ঘুমায়।

মশার কামড় অবশ্য ঘরেই বেশী। তিন বাড়ী ঝি খেটে এসে কুঞ্জর মা চিরদিনই দাওয়ায় শোয়।

প্রাণটা জ্বলে যায় মানবের, মেয়েরা কেন এত সস্তা এদেশে? প্রাণের জ্বালা বাড়তে বাড়তে একসময় লেখা শুরু করে দেয় 'চাষী বৌয়ের' গল্পটা।

আত্তি এসে বলে, খাবে?

সে মুখ না তুলেই বলে, না।

রাত গভীর হয়ে আসে। পাড়া নিঝুম হয়ে গেছে বহুক্ষণ। মাঝে মাঝে চীৎকার খনখনিয়ে উঠছে খেঁকি কুকুরগুলির। আত্তি আবার একটু ভয়ে ভয়ে বলে, এবার খাও? এবার শুয়ে পড়? সকাল থেকে খাটছ তো! কাগজ থেকে মুখ না তুলেই মানব বলে, একটু দাঁড়া।

লেখা পৃষ্ঠায় একবার চোখ বুলিয়ে, ডগা থেকে তলা পর্যন্ত কলমের আঁচড় টেনে সবটা বাতিল করে দিয়ে মুখ তুলে মানব বলে, এবার টের পেয়েছি। খেটে খুটে বেশ কিছু পয়সা কামাচ্ছি বলেই তো এত দরদ?

আত্তি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলে, দোষটা কি হয়েছে তাতে? মেয়েরা কি রোজগেরে? নিজেদের ভাত কাপড় কি তারা কামায়? যে-পুরুষ রোজগার করে, তাকে দরদ করেই মেয়েরা ভাত কাপড় কামায়।

: শুধু দরদ?

: বাবারে বাবা—এমন ছেলেমানুষ কি জগতে গজায়? বলেই তো দিয়েছি শুধু দরদে সাধ না মেটে, দু'একঘা মারলেও সয়ে যাব। সবাই সইছে না? মোর বেলা কি অন্য নিয়ম হবে! তবে কিনা, কথাটা কি—

আত্তি মাথা নীচু করে একটু হেসে বলে, সখ মিটলে ছেড়ে দিও, তিতো করে দিও না। ছাড়তে হবে বলে সম্পোকটা বিচ্ছিরি করে তুলো না।

: আমায় এমন ছোটলোক ভাবতে পারিস্ আত্তি?

: ভদ্দর ঘরের ছেলে কিনা তাই জন্যেই ভয়। ঝোঁকের মাথায় ছোটলোকের মধ্যি এসে দিন কাটাচ্ছ। মোরা ছোটলোকেরাও নিয়ম কানুন মেনে চলি তো একরকমের? তোমাদের ঝোঁকের জন্য তাই তোমাদের ভয় পাই। এত রাতে খেতে বলতে দরদ দেখাতে এয়েছি ছোটলোক মেয়েলোক—কিছু না বুঝেই কি এয়েছি?

সকাল বেলা কালাচাঁদ তার তিন নম্বর গল্পটি মানবের হাতে তুলে দেয়। এ গল্পের নামও 'হরফ।'

মানব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কখন লিখলে? ভোর রাত্রে আলো তো জলতে দেখি না তোমার?

কালাচাঁদ মাথা নেড়ে বলে, ভোর রাত্রে উঠি না আর—ভোরেই উঠি। অত নিয়ম করে মোদের লেখা পোষায় না মানুবাবু। ফাঁক ফোকড়ে লেখাই মোদের সুবিধে। রবির দোকানে চা খেতে গিয়ে বসলাম, আধঘণ্টা লিখে ফেললাম—

আন্তির মা মারা যাবার পর কালাচাঁদের মধ্যে যে অদ্ভুতরকম পরিবর্তন ঘটছে টের পাওয়া যাচ্ছিল, এখন অনেক বেশী স্পষ্ট হয়েছে।

মরিয়া ভাব এসেছে সত্যই কিন্তু তার চেয়েও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা কঠোর নির্বিকার ভাব। ঠিক শোক বা বৈরাগ্য নয়, সব ব্যাপারেই তার একটা কঠিন সঙ্কল্পগত উদাসীনতা—সে যেন ইচ্ছা করে চেষ্টা করে সব কিছু অগ্রাহ্য করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। শুধু কথাবার্তা বলার ধরণ আর চালচলন থেকেই ধরা পড়ে না, তার মুখেও একটা কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ পড়েছে।

বলে, ফুটপাতে ভিড়ের মধ্যে বসে আমি লিখতে পারি।

এমন সহজ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে কথাটা বলে যে, মানব সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

মানব বলে তুমি এমন লেখক হয়ে উঠেছ কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ সগর্বে বলে, আপনারাই তালিম দিয়ে তৈরী করেছেন।

আরও কয়েকটা কথার পর মানব তাকে জিজ্ঞাসা করে. আন্তির বিষয় কি ভাবছ কালাচাঁদ?

: কিছুই ভাবছি না মানুবাবু! আমার ভাবার দরকার নেই।

: বাপ হয়ে একথা বলতে পারলে? একটা হিল্লে তো করে দিতে হবে—না এভাবে তোমার ভাত রেঁধে জীবন কাটিয়ে দেবে?

কালাচাঁদ শান্তভাবে বলে, যা করার নিজেই করে নেবে। বড় বেশী

সেয়ানা হয়ে গেছে, স্বাধীন হয়ে গেছে। যা করতে যাব তাতেই মন্দ হবে—তার চেয়ে মোর কিছু না ভাবা, না করা ভাল।

: তুমি না একদিন আমাকে ওর সঙ্গে বেশী কথাবার্তা কইতে বারণ করেছিলে?

: সেদিন কি আর আছে মানুবাবু? টের পেয়েছি সেয়ানা মেয়ে, নিজের ভাল মোর চেয়ে ঢের বেশী বুঝবে। যেমন তেমন একটা বিয়ে দিয়েই বা কি হবে বলুন? একটা রোগে ধরবে আর মায়ের মত বিনা চিকিচ্ছেয় পটল তুলবে। বিয়ে বসতে চায় বিয়ে দেব—না বসতে চায় দেব না। এমনি কারও সাথে থাকতে চায় থাকবে—বারণ করব না। ছোট থাকলে কথা ছিল, এখন ওর ভাল, ওর চাইতে কেউ ভাল বুঝবে না—ওর বাপও না!

কী দাঁড়িয়েছে সেই কালাচাঁদের চিন্তা করা কথা বলার ধরণ!

পদ্মর সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের ছাপ মানবেরও চোখে পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নিজেদের মধ্যে কাণাকাণি করা বা টিটকারী দেওয়া দূরে থাক—তেমনভাবে হাসাহাসিও কেউ করছে না। এ যেন সাধারণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

: খুব খারাপ লাগছে আত্তি?

: না না, খারাপ লাগবে কেন? মেয়েটা বোকা সোকা—কিন্তু ভাল। সৎমা হয়ে এলে কি আসবে যাবে মোর? মোকে না খেদিয়ে ওকে ঘরে আনবে না গোঁ ধরেছে কিনা, সেটাই হয়েছে মুস্কিল!

মানব কলম রাখে। আত্তির সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর সুরে বলে, চিরকাল বাপের ঘাড়ে থাকবি ভেবেছিস্ নাকি? এবার চটপট তোকে খেদাতেই হবে।

: ঘাড়ে নেবার জন্য কত জন পাগল। কিন্তু পছন্দমত একজনার ঘাড়ে চাপব তো? বাবা চাইছে বুড়ো ভোলানাথের খপ্পরে সঁপে দিতে।

: বুঝেছি। তোকে নেবে ভোলানাথ, পদ্মকে নেবে কালাচাঁদ। তা পদ্ম তো একটা বাচ্চা বিইয়ে কালাচাঁদের ঘরে আসছে—তুইও একটা বাচ্চার মা হয়ে ভোলানাথের ঘরে যা!

সর্বাঙ্গ টান হয়ে যায় আস্তির।

: বিয়ে না করে মা করার সাহস আছে নাকি ব্যাটাছেলে তোমাদের? তোমাদের শুধু আলগা আদর, গা বাঁচিয়ে চলা!

মানব নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আস্তির সম্পর্কেই একটা চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন মনে জেগেছে।

সত্যই কি তার সঙ্গে দু'একবছর বসবাস করার সাধ জেগেছে আস্তির? হিসাব নিকাশ করে সে কি দেখেছে যে, প্রাণের সাধটা কোন কিছুর খাতিরে অপূর্ণ রাখা বোকামি? চিরকাল বইবার দায় মানবের ঘাড়ে চাপানো যায় না, অনেক দিক দিয়েই সেটা অসম্ভব।

অসম্ভবের খাতিরে সম্ভবটুকু বিসর্জন দিয়ে লাভ কি?

আস্তি জানে মানব তাকে চায়—চিরজীবনের সাথী হিসাবে নয়, কোনরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে নয়, কিন্তু তাকে চায়। চিরকালের জীবনসঙ্গিনী করতে পারবে না বলেই, বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা যাবে না বলেই সেদিন সর্দিজ্বরের সময় আদা চা দিতে এলে, ঝোঁকের মাথায় তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাছ থেকে মৌখিক একটু প্রতিবাদ পর্যন্ত না পেলেও, নিজেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে তার কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চেয়েছিল!

আভাষে ইঙ্গিতে এবং ব্যবহারেই শুধু নয়, আস্তি প্রায় স্পষ্ট ভাষায় মুখ ফুটেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে: চিরজীবনের জন্য নয় গো নয়, সাধ হলে দু'এক বছরের জন্যই আমায় নাও—খুশী হলেই ছেড়ে যেও!

আস্তির হিসাব মানব বোঝে। অতি সহজ আর বাস্তব হিসাব। গতি তার একটা হবেই। কালাচাঁদ মরিয়া হয়ে যার তার হাতে তাকে

সঁপে দিলে যে গতি হবে, মানবের সঙ্গে কিছুদিন বসবাস করার পরের গতিটা তার চেয়ে মোটেই কিছু মন্দ হবে না। তাছাড়া অনেকেই ধরেই নিয়েছে যে মানবের সঙ্গে সে নষ্ট হয়েই গেছে। প্রকাশ্যে একসাথে বসবাস করলে ক্ষতিটা কি হবে? এই বাড়ীরই একটা ঘরে সাত বছর ওভাবে বসবাস করছে না, বটুক আর গঙ্গা?

পদ্মকে যথাবিধি ঘরে আনা জরুরী হয়ে পড়েছে। কালাচাঁদ কবে তাকে গায়ের জোরে কার সঙ্গে লটকে দেয় ঠিক নেই।

মানবের সঙ্গে এখন নষ্ট হলেই সবদিক দিয়ে মঙ্গল আত্তির। মানব কিন্তু আঁকড়ে আছে তার নীতিজ্ঞান। আত্তিকে নষ্ট করার ঝোঁক আছে জোরাল, কিন্তু সাহস নেই।

সে যে ভারি অন্যায় কাজ হবে! বিয়ে করতে না চাইলে, আজীবন নিজের ভোগ দখলের খাস তালুকের মত নিতে না পারলে, কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানোই যে যুবকের পক্ষে মহাপাপ!

আত্তি তাই সোজাসুজি মুখের ওপর তাকে ভীরু কাপুরুষ বলে গাল দিয়েছে।

পদ্ম মা হবে। তবু সবাই নিশ্চিন্ত যে আঁতুড়ে যাবার দু'চারদিন আগেও অন্তত কালাচাঁদ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে, সামাজিক ভাবে বৌ করে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলবে।

আত্তি তাকে প্রায় স্পষ্ট ভাষায় অভয় দিয়েছে যে মা হতেও সে পিছ্‌পা নয়, সে মা হলেও মানবের কোন দায় নেই। বিনা সর্তে সে পিরিত করতে রাজী, মা হবার ঝুঁকি নিতেও রাজী—পিরিত করার সাধ নিয়েও তাকে এড়িয়ে চলা ভীরুতা, কাপুরুষতা!

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরে মানব দ্যাখে, তার ঘরটুকুতে ঝাঁট পড়েনি, বাঁশের খাটিয়ায় তার বিছানাটা পাতা হয় নি, কুঁজোতে জল তুলে রাখা হয় নি, ছোট্ট তোলা উনানটিতে আঁচ পড়ে নি।

তার বালিশের তলা থেকে তারই পয়সা নিয়ে কয়েকটা আলু পেঁয়াজ, একজোড়া ডিম ছটাক খানেক তেল, ছোট একটা পাঁউরুটি—এসবও কেউ এনে রাখে নি।

বাতিটাতে তেল ভরা হয় নি। ঘণ্টা খানেকের বেশী জ্বলবে না। বোতলে তেল নেই।

জামা কাপড় ছেড়ে নারকেলে-দড়ি বেঁধে ঝুলানো বাঁশের আলনায় সেগুলি রেখে মানব লুঙ্গি পরে ভাবছে আগে সওদা করতে যাবে না আগে বালতিতে তোলা জলে কাক-স্নানের বিলাসিতাটা চুকিয়ে নেবে—

বালতির দিকে তাকিয়ে ছাখে এক ফোঁটা জলও নেই!

রোজের মত কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে এক বালতি জলও কেউ আজ তার জন্ম তুলে রাখে নি।

এটা আভির স্পষ্টতম বিদ্রোহাত্মক ঘোষণা: আর চলবে না টালবাহনা! এতকাল আমি তো সত্যিকারের দাসীগিরি করি নি—করব না আর কাজ! দাওনি এক পয়সা। গা বাঁচিয়ে অত খাতির আর চলবে না!

মানব বিচলিত হয় না, মনে মনে হাসেও না। শাড়ী জামা কিনে এনে সে ফেলে রাখে তার খাটিয়ায়—তার জিনিষ পত্র আনতে তাকে জিজ্ঞাসা না করে বালিশের তলা থেকে টাকা পয়সা নেওয়ার মত শাড়ী জামাও আভি তুলে নিয়ে যায়। কিনে নিয়ে আসে দু'চার সের বাড়তি চাল। চালের ঠোঙ্গাও আভি জিজ্ঞাসা না করেই তুলে নিয়ে যায়।

মানবকে তার বলাই আছে যে নিজের দরকারে দু'চার আনা দু'এক টাকা সে নেবে—তবে মাসে চার পাঁচ টাকার বেশী যাতে না হয় সেটা খেয়াল রাখবে।

আজ আভি জানিয়ে দিয়েছে, এও তো একরকম মাইনে নিয়ে ঝি গিরি

করা! ঝি-এর কাজ সে করবে না মানবের। শুধু এইটুকু দায় নিয়ে আর চলবে না। এবার তাকে আশ্রয়, খাওয়াপরা, সব কিছু দিতে হবে, নইলে চুকে যাক এই ফাঁকির সম্পর্ক!

মানব ভেবেচিন্তে একবার উমাকান্তের বাড়ীতে যায়। উদ্দেশ্য—কালাচাঁদের মরিয়া একরোখা ভাবটার অন্য কোন লক্ষণ তার নজরে পড়েছে কিনা জেনে আসা।

উমাকান্ত বলে, কালাচাঁদ? ওর ভাবসাব সাংঘাতিক! যা কাণ্ড আরম্ভ করেছে বলার নয়।

মানব গম্ভীর হয়ে বলে, তাই নাকি! কিরকম ব্যাপার?

: তোমায় বলে আবার ব্যাপার কি দাঁড়াবে কে জানে!

: আমায় ওরকম চ্যাংডা ভাবেন?

: চ্যাংড়া তোমায় কোনদিন ভাবি নি, মিছে কথা বোলো না। মুস্কিল হল কি জানো? তুমি হৃদয়টাকে মানো না—প্রাণের আবেগে কেউ কিছু কাণ্ড করে নিজের ক্ষতি করতে চাইলে প্রাণপণে সামাল দেবার চেষ্টা কর। কালাচাঁদকেও হয় তো বাঁচাবার চেষ্টা করবে!

মানব জাঁকিয়ে বসে। পুতুলকে যেভাবে ডাকতো তেমনিভাবে গলা চড়িয়ে মুকুলকে ডেকে বলে, মুকুলদি, চা দিয়ে যাও। ব্যাপার তবে সত্যি গুরুতর? তা হলে অবশ্য ব্যাপার না জেনে উঠব না।

কালাচাঁদের ভাবান্তর, নিজের মেয়ের সম্পর্কে তার বেপরোয়া উদাসীন ভাব, তার তিন নম্বর 'হরফ' গল্প লেখা—কালাচাঁদ সম্পর্কে এসব বিবরণ সে ধীরে ধীরে উমাকান্তকে শুনিয়ে যায়।

মুকুল চা এনে দিয়ে বলে, এসব কি শুনছি? বস্তির মেয়েদের সঙ্গে নাকি খুব ভাব জমেছে?

মানব বলে, বাস করব বস্তিতে—তোমার সঙ্গে ভাব করতে আসব নাকি মুকুলদি?

: আপনি আমায় মুকুলদি বলবেন না তো! আপনার চেয়ে আমি আট দশ বছরের ছোট।

: ছোট হলে কি হবে? বুড়ো বাপ দশ বছরের সৎমা ঘরে আনলে ত্রিশ বছরের ছেলে তাকে মা বলবে না? একদিন তো মুকুলদি বলতেই হবে—এখন থেকে অভ্যাস করে রাখছি।

মুকুল প্রায় ছুটে পালিয়ে যায়।

উমাকান্ত আশ্চর্য হয়ে বলে, তোমার তো সাংঘাতিক অনুমান শক্তি! কেউ যা জানে না, ঘুণাক্ষরে যা প্রকাশ করা হয় নি, তুমি দিব্যি তা অনুমান করে ফেল্লে!

মানব সস্মিতভাবে বলে, চল্লিশে পা দিলে কি হবে—আপনি এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছেন। এই সোজা ব্যাপারটা অনুমান করা কি কঠিন হয় কারো পক্ষে? শুধু মা আর মুকুলদিকে আপনার কাছে রেখে মনোহরবাবু সবাইকে নিয়ে পাটনা ফিরে গেলেন। আপনি অনুমতি না দিলে এটা সম্ভব হত?

উমাকান্ত একটু ভেবে বলে, যাক গে, তোমার কাছে গোপন করব না। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, আমিই শুধু ছ'মাস আট মাস দেরী করে অনুষ্ঠানটা করতে বলেছি। বৌ মরার এক বছরের মধ্যে আবার বিয়ে করলে লোকে নিন্দে করে।

এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে মানব বলে, কালাচাঁদের ব্যাপারটা বলুন!

উমাকান্ত তার দিকে একটু ঝুঁকে নীচু গলায় বলে, ধনদাসের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য কালাচাঁদ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে।

: ষড়যন্ত্র!

: রীতিমত ষড়যন্ত্র। প্রেসের অন্য লোকেরাও ওর সঙ্গে আছে। আমি যে টের পেয়েছি এটা সবাই জানে। চুপ করে আছি দেখে ওরাও কিছু বলছে না। ধরে নিয়েছে যে আমি জেনেও কিছু বলব না।

মানব চুপ করে শুনে যায়। এ সব ভূমিকা না করে আগে আসল ব্যাপারটা বলে নিলে কথাগুলির মানে বোঝা যে তার পক্ষে সহজ হত—উমাকান্তকে সেটা জানিয়ে কোন লাভ নেই। এটাই হল তার গল্প উপন্যাস লেখারও কায়দা! আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে আগে সে কৌতূহল সৃষ্টি করে নেয়, তারপর আসল ঘটনার বিবরণ দাখিল করে।

উমাকান্ত ধীরে ধীরে বলে যায়, এ মতলব কি করে ওর মাথায় এল, কি ভাবে প্রেসের অন্য লোকদের দলে টানল, ভেবে পাই না। কি কাণ্ড করছে জানো? এই সংখ্যার রস-সাহিত্যের জন্য যে সব লেখা বেছে দিচ্ছি সেগুলি কম্পোজ করছে ঠিকমত, প্রিণ্ট অর্ডার দিলে মেসিনে তুলে প্রথম ছাপা ফর্মাও দেখাচ্ছে ঠিকমত—কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ শিটের বেশী ওই ম্যাটারটা আর ছাপছে না। ওটা নামিয়ে মেসিনে অন্য ম্যাটার চাপিয়ে বাকী শিটগুলি ছাপছে।

মানব তাজ্জব বনে বলে, এ যে রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার!

উমাকান্ত বলে, শুধু রহস্যময়? সাংঘাতিক ব্যাপার, রোমাঞ্চকর ব্যাপার। বাছাই বাছাই দু'একটা লেখা রেখে ধনদাসের মুণ্ডপাত করা লেখা ছাপিয়ে যাচ্ছে। কে যে ওসব লিখল, কখন যে কম্পোজ করল টেরও পাই নি। এবারের রস-সাহিত্য বাজারে বেরোলে যে কি কাণ্ড হবে—

: কি ছাপছে দেখেছেন?

: দেখেছি বৈ-কি! নমুনাও এনে রাখছি। সেই জন্যই তো বলছিলাম, আমি যে ব্যাপার জানি সেটা ওরা টের পেয়ে গেছে।

: একটা নমুনা দেখাবেন?

চাবিবন্ধ ড্রয়ার খুলে উমাকান্ত পরের মাসের রস-সাহিত্যের প্রথম ফর্মাটা বার করে মানবের হাতে দেয়।

প্রথম পাতায় পাইকা হরফে খালেকের কবিতা—'দুর্জনেরে আঘাত হানো'।

মানব মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে কবিতাটা আপনার দেওয়া না ওরা যোগাড় করে এনেছে?

: ওটা আমার দেওয়া। তুমিই তো এনে দিলে আমাকে?

মানব পাতা ওল্টায়। পরের পাতায় ছাপা হয়েছে গল্প—'সন্তানের মা ইত্তিরি না কপিরাইট'?

মানব মুখ তুলে বলে, পরে পড়ব—ব্যাপারটা আগে সব শুনে নি। এ গল্পের বিষয় কি?

: আত্তির মাকে খুন করা। নামটাম সব বজায় রেখেছে। 'হরফ' গল্পের কায়দায় নয়—সোজাসুজি ধনদাসের মুণ্ডপাত করা। লেখকের নামও গোপন করে নি—কালাচাঁদ নিজের নাম দিয়েছে।

একবার তাকিয়ে দেখে মানব বলে, তাহলে ষড়যন্ত্র নয়। ফলাফলের জন্য কালাচাঁদ তৈরীই আছে।

উমাকান্ত বলে, শুধু কালাচাঁদ নয়, প্রেসের আরও দু'তিনজন নিজের নামে ধনদাসের কেচ্ছা লিখেছে। এখনও দু'ফর্মা ছাপা বাকী কিন্তু ধনদাসের কেচ্ছা গাওয়ার রীতিটা বুঝতে পেরেছি। পুতুলের ব্যাপার নিয়ে আরম্ভ হল—ওর বাপ ঠাকুদ্দার কয়েকটা কীর্তির কথা বলে ধনদাস পনের ষোল বছর ধরে কত কি কাণ্ড করেছে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

মানব অনেকক্ষণ গুম খেয়ে থেকে প্রথম ফর্মাটা আগাগোড়া পড়ে বলে, এটা উচিত হচ্ছে না। কালাচাঁদ বিষম ভুল করছে। একজন মানুষকে ঘা দিয়ে কি লাভ হবে? ধনদাস লজ্জা পেলেই সব অন্যায় অব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে?

উমাকান্ত ফুঁসে ওঠে, তুমি যদি এ ব্যাপারে নাক গলাও মানব—

: আমি কেন নাক গলাতে যাব?

: হ্যাঁ, নাক গলিও না। তোমার উচিত অশুচিতের উপদেশ পরে শুনব, পরে বুঝব। আমি যা করতে চেয়ে চাকরিটা নিয়ে করতে পারিনি, কালাচাঁদ তাই করছে। একটা ঘা তো অন্তত দেবে!

মানব জোর গলায় বলে, কথা কইলেই ভয় পান কেন? কে কোথায় কাকে ঘা দেবার প্ল্যান কষছে, তার মধ্যে নাক গলানো কি আমার পেশা? আমি শুধু বলছিলাম এরকম এলোমেলো ঘা দিয়ে কোন লাভ হয় না। জগৎটা নিয়মে চলে।

পৈত্রিক পুরানো টেবিলটাতে একটা ঘুঁষি মেরে উমাকান্ত বলে, আমরা নিয়মেই ঘা হানছি।

ঘরে ফিরে মানব কালাচাঁদকে বলে, তোমায় একটা কথা বলব বলব ভাবছিলাম—কেবলি ভুলে যাই। রস-সাহিত্যে তোমার নাম মুদ্রাকর হিসাবে ছাপা হয়, তোমার দায়িত্ব কি জান তো? আপত্তিকর কিছু ছাপা হলে তুমি দায়ী হবে। তেমন মারাত্মক কিছু ছাপা হলে তোমার জেলও হতে পারে!

কালাচাঁদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় কিন্তু নির্বিকার কণ্ঠেই বলে, নিজের দায়িত্ব জানি বৈ-কি!

জানা থাকলেও এদিকটা যে তার একেবারেই খেয়াল ছিল না কাগজ দেখে ক্ষেপে গিয়ে ধনদাস তাকে এবং আরও কয়েকজনকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে এইটুকুই সে যে শুধু ভেবেছিল, পরদিনই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আত্তি এসে জানায় দু'দিন পরেই পদ্মর সঙ্গে কালাচাঁদের বিয়ে হবে। সব ঠিক হয়ে গেছে।

এ মাসের রস-সাহিত্য বার হবে দু'তিন দিনের মধ্যে—বিয়েটা চুকিয়ে দিতে আর দেরী করা উচিত নয়। পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে কালাচাঁদকে যদি তারা জেলে ঢুকে দেয় কয়েকমাসের জন্য, একেবারে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বিয়ে হবেই জেনে সবাই চুপ করে আছে, বিয়ের দু'চার মাসের মধ্যে বাচ্চা বিয়োক পদ্ম, স্বামীর সন্তানই বিয়োবে। কিন্তু কোন কারণে বিয়ের অনুষ্ঠানটা ছাড়াই যদি পদ্মাকে মা হতে হয়—সবাই ছি ছি করবে।

পদ্মকেও করবে, কালাচাঁদকেও করবে।

এতদিন গড়িমসি করে এসে হঠাৎ বিয়েটা সেরে ফেলার জন্য কালাচাঁদের ব্যগ্রতা দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

আত্তি মানবকে বলে, বাবার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—লাগাও পরশুদিন বিয়ে!

মানব হেসে বলে, মাথা বেঠিক হয় নি, কারণ আছে। কালাচাঁদ একটা মানুষকে খুন করবে। খুন করলে ফাঁসি না হোক জেল হবে তো? বিয়েটা তাই সেরে ফেলছে।

: তামাসা কোরো না মানুবাবু। সত্যি বল না কারণটা কি?

: বলিস্ না কাউকে—প্রেসে বোধ হয় হাঙ্গামা হবে।

আত্তির মুখ ছোট হয়ে যায়।—তবেই সেরেছে! বাবা যা একগুঁয়ে রাগী মানুষ!

মানব বলে, ডরাস কেন এত? পুরুষ মানুষ লড়াই টড়াই করবে না একটু? শুধু সয়েই যাবে?

আত্তি ঝংকার দিয়ে বলে, আহা, লড়াই যেন পুরুষ মানুষের একচেটিয়া কারবার, মোরা যেন লড়তে জানি না। সে কথা বলছি না কি? বলছি যে বাবার বড় মাথা গরম, বড্ড বেশী গোঁ—কি করতে কি করে বসে!

মানব বলে, তুই ভুল বুঝেছিস্ নিজের বাপকে। কালাচাঁদ খুব হিসেবী লোক, ওর অনেক ধৈর্য।

বিনা সমারোহে বিয়ে হয়ে যায় কালাচাঁদের।

বিনা নিমন্ত্রণে অযাচিতভাবে এসে গাঁটের পয়সা খরচ করে বস্তির জন

কিছু শৌক মেয়ে-পুরুষ আর কালাচাঁদের অধিকাংশ সহকর্মীরা অবশ্য হৈ-চৈ করে যায় অনেক, কিন্তু সেটাকে কি আর বিয়ের সমারোহ বলা যায়?

মানব পদ্মকে দিল একটা অভিনব উপহার—নন্তু গোয়ালার টিপ সই দেওয়া কয়েকখানা স্লিপ।

বিয়েতে কাগজের টুকরো উপহার? সবাই বলে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন মানুবাবু?

মানব বলে, ব্যাপার খুব সোজা। নন্তু গোয়ালা ছ'মাস আধ পো করে দুধ দেবে—হিসেব করে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছি। আন্তিকে বলে দিয়েছি, দুধটুকু যাতে সমস্তটা সৎমার পেটে যায় সেদিকে নজর রাখবে।

একজন বলে, আগেই গয়লাকে ছ'মাসের টাকা বুঝিয়ে দিয়েছ? দুধ দেবে না পাউডার গোলা ফিকে জল দেবে ঠিক নেই—দু'দিন দিয়ে হয়তো তাও বন্ধ করে দেবে।

মানব হেসে বলে, আমার পয়সা হজম করতে পারবে? গয়লাকে বোঝাবারও কায়দা আছে। মানুষকে অত হাবা ভাবতে নেই। নন্তু কি জানে না আধ পো দুধে জল আর পাউডার মিশিয়ে কত লাভ করা যায়? ওইটুকু লাভের জন্য সবার কাছে হীন হবার ঝুঁকি নেবে, ওকি এতই বেহিসেবী বোকা? আর কেউ না পাক, পদ্ম ঠিক খাঁটি দুধ পাবে।

ব্লক-রীডার ভুবনও এসেছিল। খানিকক্ষণ মনে মনে হিসাব কষে সে প্রায় লাফিয়ে উঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলে, এ যে প্রায় অ্যারিষ্টোক্রেটিক উপহার হল! আমি ভাবছিলাম, রোজ আধ পো দুধে কি হয়? তার চেয়ে একটা ছ'সাত টাকা দামের শাড়ী দিলে বেশ মানাত! রোজ আধ পো দুধের ছ'মাসের দাম হিসেব করতে গিয়ে দেখি, ও বাবা, এ তো ছ'সাত টাকার ব্যাপার নয়। আধ পো' দুধের দাম দু'আনা। তিরিশ দিনে মাস ধরলে ষাট আনা—ছ'মাসে মোটমাট সাড়ে বাইশ টাকা।

মানব বলে, নন্তুকে সাড়ে বাইশ টাকা নয়, বিশ টাকা দিয়েছি।

সোজাসুজি বললাম যে ধার নিলে টাকায় মাসে মাসে দু'পয়সা সুদ কষতে হয়—ছ'মাসের দাম আগাম দিলে কিছু ছাড় পাব না ? নন্ত কি বলেছিল জানো ? আপনি তো আসল হিসেব বড়ই বোঝেন বাবু—একটা কারবার দিলে তো রাজা হয়ে যেতেন !

বস্তিবাসী উদ্বাস্তু বাঙাল মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, আপনে জবাবে কি কইলেন ?

মানব জবাব দেয়, আমি কইলাম, রাজাগো যখন মরণ দশা, রাজা হইয়া করুম কি ?

তার খাঁটি বাঙাল উচ্চারণে কথা বলায় সবাই আশ্চর্য হয়েও হেসে ওঠে।

রস-সাহিত্যের এই সংখ্যাটি বাজারে আত্মপ্রকাশ করার পরেও সাত সাত রাত্রি কালাচাঁদ পদ্মকে নিয়ে ঘর করার সুযোগ পায়।

ছাপা বাঁধাই শেষ হওয়ামাত্র রস সাহিত্যের যে কপিটা ধনদাসকে দেওয়া হয় দু'দিন পরে শুধু পাতা উল্টিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল—সব ঠিক আছে।

উমাকান্ত সত্যই পাল্লা দিতে কোমর বেঁধেছে হরফের সঙ্গে।

প্রচ্ছদপটটা কি সুন্দর করেছে এবার উমাকান্ত ! কতজন নাম করা লেখকের লেখা এবার ছাপিয়েছে। তার রস-সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দেবে হরফ—ইস !

আত্মীয় বন্ধু বা কেউ কেউ এসে জানাতে চায় এবারের রস-সাহিত্য এরকম করলেন কেন ?

হরফ পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে, কালাচাঁদের তিন নম্বর গল্প পড়তে পড়তে ধনদাস মৃদুস্বরে বলে, রস-সাহিত্য পছন্দ না হয়, অন্য মাসিক কিনে পড়ুন। হরফ কিনে পড়ুন।

ধনদাসের বুড়ো বাপ হরকান্ত বছর দশেক সংসার নিয়ে মাথা ঘামানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এক সাধুর আশ্রমেই দিন কাটায়, দু'এক মাস অন্তর দু'একদিনের জন্য এসে শুধু হালচালটা বুঝে যায়, শুধু জেনে যায় মোটামুটি সব ঠিক আছে কিনা।

বাড়ীর বাঁধা ডাক্তারের মাঝে মাঝে এসে জন্ম-রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে যাওয়ার মত!

কাঁপতে কাঁপতে হরকান্ত প্রেসে এসে ধনদাসের টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। এমনিতেই দেহ আজকাল কাঁপে, এখন কিন্তু সর্বাঙ্গ তার কাঁপছে রাগে।

: হ্যাঁরে, এ তোর কী মতিগতি হয়েছে? নিজেকে ডাকাত গুণ্ডা লুচ্ছার বলে ঘোষণা করে, বাপ পিতেমোর কেচ্ছা রটিয়ে তুই উঠতে চাস্? তোর মতলবটা কি?

ধনদাস উঠে দাঁড়িয়েছিল. সে ধীর কণ্ঠেই বলে, হরফের কথা বলছ তো? শত্রুতা করছে। আমিও দেখিয়ে দেব, শোধ নেব।

হরকান্তের রাগ আরও চড়ে যায়।—হরফ কি, হরফ? নিজের কাগজে নিজেকে গাল দিয়ে, বাপ ঠাকুর্দ্দার যোয়ান বয়সের কেচ্ছা লিখে এ কি কাণ্ড শুরু করেছিস্? তুই উচ্ছন্ন যাবি, তিলে তিলে জ্বলে জ্বলে, পুড়ে পুড়ে, তুই মরবি!

হরকান্ত হাতে করেই, এনেছিল রস-সাহিত্যের দুমড়ানো মুচড়ানো বর্ত্তমান সংখ্যাটা, ধনদাসের মুখের উপর সেটা ছুঁড়ে দিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যায়।

হতভম্ব ধনদাস কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে আনমনে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই হঠাৎ খেয়াল করে যে এতো তার রস-সাহিত্য কাগজ নয়!

এক ঘণ্টা পরে উমাকান্তকে ডেকে সে বলে, কাগজটার এ মাসের ফাইল কপিটা আমায় একটু দিন তো উমাবাবু?

আরও একঘন্টা পরে সে প্রেস থেকে বেরিয়ে মোড়ে মাধবের বুকষ্টলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তিন কপি রস-সাহিত্য অবশিষ্ট ছিল। একখানা তুলে নিয়ে সে পাতা ওল্টায়।

মাধব বলে, আপনার এমাসের কাগজ নিয়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। দশ কপি পড়তে পেল না, বারটা নাগাদ আরও পঁচিশ কপি আনলাম—মোটে তিনখানা বাকী আছে। আমাকে আরও পঁচিশ কপি দিতে হবে কিন্তু!

ধনদাস নীরবে তার রস-সাহিত্যের পাতা উল্টে যায়।

* * * *

শেষরাত্রে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যায় কালাচাঁদকে।

টাইপ চুরি করা থেকে আপত্তিকর গোপন ইস্তাহার ছাপিয়ে পয়সা রোজগার ইত্যাদি কয়েক দফা অপরাধে।

বস্তি আর ঘুমায় না। উত্তেজনা ঝিমিয়ে আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। কাজের মানুষ যায় কাজে, বেকার মানুষ যায় কাজের খোঁজে, ঘরের মানুষ লেগে যায় ঘরের কাজে।

মানব ঠায় বসেছিল কালাচাঁদের দাওয়ায়। মাথা হেঁট করে বসে মৃদু এবং মিহি সুরে পদ্ম একটানা কেঁদে চলেছিল। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আন্তি বসেছিল চুপচাপ।

ঘরের চালে সোণালী রোদ এসে পড়েছে খেয়াল করে মানব যেন চেতনা ফিরে পায়। পদ্মকে বলে, কাঁদছ কেন? প্রাণের জ্বালা জুড়োতে গেছে, ফিরে তো আসবে মানুষটা! কেঁদো না।

আন্তিকে বলে, আমি বলি কি আন্তি, মিছি মিছি কেন ঘরের ভাড়া গুণবি? দু'যায়গায় দু'বার করে রাঁধবি? আমার ওখানেই তোর আর সৎমাটার খ্যাঁট একসঙ্গেই রেঁধে নিস্। বড একটা ভাতের হাঁড়ি কিনতে হবে, না?

আন্তি বলে, আহা, তিনটে পেটের জন্ত বড় ভাতের হাঁড়ি! নিজে তো খাও একমুঠো ভাত।

মানব বলে, বড় একটা খাটিয়া কিন্তু আনতে হবে, নইলে মেঝেতে বিছানা পাততে হবে। ওইটুকু খাটিয়ায় দু'জনে শোয়া যায় না। কুঞ্জর মাকে জানিও পদ্ম, এমনি ঘরে থাকবে না, ভাড়ার একটা ভাগও তুমি দেবে। কালাচাঁদের মালপত্রও কিছু থাকবে তো ওখানে!

আন্তি প্রশ্ন করে, একেবারে ছেড়ে দেবে ঘরটা? বাবা ফিরে এলে তখন?

পদ্ম'র কান্না থেমেছিল। এবারে সে মুখ খোলে।—ঘর বুঝি আর মিলবে না?

মানব হেসে আন্তিকে বলে, ঘর না মেলে, আমাদের ঘরটা ছেড়ে দেব। তুই আর আমি একটু বেড়িয়ে আসব এদিক ওদিক—কতকাল বেরোই নি, মন কেমন করছে।

সমাপ্ত